চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা

বা

যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব।

শ্রীমাখনলাল দত্ত প্রণীত।

সনাতন ধর্ম্মোপন্যাস—পৌরাণিক পুণ্যোপাখ্যান—

কলিযুগের অদ্ভুত ইতিহাস!!!

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল তিন পর্ব্বে সমাপ্ত।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া,
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং।"

(দ্বৈপায়ন)

চৌবেড়িয়া হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা ৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।—কাপড়ে বাঁধাই ২৷৷০ টাকা মাত্র।

মুখবন্ধ।

আজকাল রাশি রাশি বাঙ্গলা পুস্তকের মধ্যে এই গ্রন্থখানি প্রচারের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; কেবল হিন্দুর দেশে হিন্দুধর্ম্মস্রোতের উজান গতি ফিরাইবার পক্ষে 'কাঠবিড়ালীর সমুদ্র বন্ধনের' ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করামাত্র। জানিনা, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি।

বস্তুতঃ পুস্তকখানি ধর্ম্ম-পুস্তক ভিন্ন আর কিছুই নহে; তবে ইহার মর্ত্ত্য-পর্ব্বটী পাঠকের চক্ষে নভেল বা নবন্যাস বলিয়াই বোধ হইবে; কিন্তু মর্ত্ত্যের মানবমণ্ডলীর ঘটনাবলী না বলিলে ধর্ম্মের কথা মীমাংসা হইবে কিরূপে? পাপ-চিত্র না দেখাইলে, ধর্ম্ম জগতে পাপের প্রতিফল দেখা যাইবে কিরূপে? সেই জন্যই শুধু মর্ত্ত্যপর্ব্বের অবতারণা।

ধর্ম্ম-কাহিনী বিবৃত করিতে ও পাপ চিত্র আঁকিতে গিয়া অনেক স্থলে ভাষার সমতা হারাইতে এবং অসংলগ্ন ভাবসমূহ সংলগ্ন করিতে হইয়াছে। লালিত্য রক্ষার্থে গদ্য ভাগের অনেক স্থলে পদ্যের ন্যায় ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে; বোধ হয় ব্যক্তিবিশেষ ইহাতে নূতনত্ব ও মাধুর্য্য দেখিবেন এবং ব্যক্তিবিশেষ ইহাকে অসম্বদ্ধ বিবেচনা করিবেন। স্থানে স্থানে অনুপ্রাসাধিক্য আছে বলিয়া লালিত্য বা অর্থের কোন ব্যতিক্রম বোধ হইবে না। পদ্যাংশের যতি, ছন্দ ও চরণমিলের কোন কোন স্থলে কদাচিত ব্যতিক্রম হইতেও পারে। চরণমিলের দুই এক স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের সহিত কদাচিত মিল না থাকিতে পারে; যেমন—

"জাননা কি জগদম্বে জগত জননী,
যে জন্য জাহ্নবী মম জটা বিহারিণী!"

এস্থলে 'জননী' ও 'বিহারিণী' শব্দে ঠিক মিল হয় না; দুই চরণের দুই "নী"য়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের স্বরের মিল হয় নাই। কিন্তু প্রধান প্রধান বঙ্গ-কবিগণের কবিতায় এরূপ মিলন ভূরি ভূরি আছে; ইহাতে তবু অল্পই দৃষ্ট হইবে; ফল কথা, কবিতার সারসম্পত্তি লালিত্যের হানি না হইলেই হইল।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি হইতে যে সকল বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে, সে সকলের সহিতও ব্যক্তিবিশেষের মতানৈক্য ঘটিতে পারে; কারণ যুগযুগান্তরের ঘাত প্রতিঘাতে শাস্ত্রসমূহ বহুবিধ বিশৃঙ্খলা ও জটীলতায় পরিপূর্ণ! তাহাতে অনেক বিষয় অনেকের অপরিজ্ঞাত থাকিতেও পারে; আবার সকল স্থলে সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য দেখা না যাইতেও পারে। তবে প্রাচীন

শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, মনুসংহিতা, দায়ভাগ, বেদান্ত-দর্শন, উপনিষদ, পঞ্চদশী প্রভৃতি শাস্ত্ররাশী এবং আধুনিক হিন্দু সৎকর্ম্মমালা ও বুদ্ধদেবচরিতাদি গ্রন্থাবলী যদি প্রকৃত হয়, তবে ইহার মতও অভ্রান্ত! কারণ এই সকলের মতানুসারেই ইহার ধর্ম্মকথাগুলি লিখিত। গ্রন্থ খানিকে প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ ধরণেই লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তবে ইদানীন্তন শিক্ষিত ও সভ্য হিন্দু এই পুস্তকের অনেকস্থলে 'গোঁড়ামী' করা হইয়াছে বলিবেন; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, 'গোঁড়ামী' না থাকিলে, কুসংস্কারান্ধ না থাকিলে এ ধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায় না। (Revised) রিভাইজড্ বা সংশোধিত হিন্দুধর্ম্মকে ধর্ম্মই বলা যায় না। কংগ্রেস ও সিভয়েজ্ (হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা) প্রভৃতির দোষগুণ বর্ণনা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে; তবে ধর্ম্মের সহিত যে টুকুমাত্র সংস্রব আছে, সেই টুকুই লওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হওয়ায়—আরও আনুষঙ্গিক অনেক কার্য্য থাকায়, তাড়াতাড়িতে প্রুফ দেখিবার দোষেও অনেকস্থলে ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে; পুস্তকে লিখিত সমস্ত "সুরধুনী" শব্দেরই হ্রস্ব উকার পড়িয়া "সুরধনী" ছাপা হইয়া গিয়াছে, "স্বর্লোক" শব্দের রেফগুলি সকল স্থলে ভালরূপ না উঠিয়া "স্বল্লোক" হইয়াছে। আর স্বর্গ পর্ব্বে ৭৯ পৃষ্ঠায় "শিব-লোকের" উপরে অষ্টম অধ্যায়ের পরিবর্ত্তে নবম অধ্যায় এবং ৯৫ পৃষ্ঠায় "সভাস্থলের" উপরে নবম অধ্যায়ের পরিবর্ত্তে দশম অধ্যায় হইবে। আরও যে যে স্থলে ছাপার ভুল হইয়া গিয়াছে, সে সকলের শুদ্ধিপত্র স্বতন্ত্র একটী সন্নিবেশিত হইল।

জগতে নির্ভুল কিছুই হইতে পারে না—ভ্রমশূন্য কেহই নাই! আরও যদি কোন স্থলে কোন বিষয়ে কোন ভুল দেখিয়া কোন সাধু সমালোচক সাধুভাবে আমাকে লিখিয়া পাঠান, তবে সঙ্গতবোধ হইলে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই ভুলও দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিব। খণ্ডাকারে প্রকাশের সময় সাধারণে যেরূপ উৎসাহ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী যেরূপ প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, আরও দেখিতে দেখিতে দ্বিসহস্রাধিক গ্রাহক যেমন আগ্রহের সহিত গ্রাহক হইয়াছিলেন, তাহাতে এই সংস্করণ যে সত্বরই নিঃশেষিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। ইতি

হেডমাষ্টার চৌবেড়িয়া স্কুল ও
পোষ্ট মাষ্টার চৌবেড়িয়া, (যশোহর)
১৩০৩ সাল ২৫শে মাঘ (শ্রীপঞ্চমী)

একমাত্র সত্বাধিকারী ও গ্রন্থকার
শ্রীমাখনলাল দত্ত।

উৎসর্গ পত্র।

এই মাটীর জগতে দু দিনের জন্য ধূলাখেলা করিতে আসিয়া আজীবন খেলায় কেবল হারিয়াই গিয়াছি! জয়ী হইতে ত কখনই পারি নাই। বিশেষতঃ জন্মাবধি 'চক্ষুলজ্জা' ও সরলতা নাম্নী দুইটা দুষ্টা সরস্বতীরূপিণী প্রবৃত্তি আমার সঙ্গের সাথী হওয়াতে কোন খেলার সাথীকেই হারাইতে পারি নাই; বরং মরুভূমে মরীচিকা দেখিয়া যেমন ঝাঁপ দিয়াছি, অমনি উত্তপ্ত বালুকায় সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

কোন বন্ধু বিষ্ণুশর্ম্মার বচন উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি উদারচরিত বলিয়াই বসুধাশুদ্ধ লোককে আত্মীয় বলিয়া মনে কর।" কেহ বা চাণক্য-নীতি উল্লেখ করিয়া বলেন "তুমি পণ্ডিত বলিয়াই সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ দেখিয়া থাক।" কিন্তু তদ্বিপরীত কুটিলস্বভাব মূর্খকে তাঁহাদের এতাদৃশ উপহাসাস্পদ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্তই ভ্রম! কারণ নিজে কুলোক না হইলে ভূলোকের সুলোক সকলকে কুলোক কথনই বলিতাম না।

এই গ্রন্থখানি যে সুলোকের সংস্রবে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহা হইতে আমি এতই কুলোক হইয়াছি যে, মনের ভয়ে মুখবন্ধের শেষে আমিই "একমাত্র সত্ত্বাধিকারী" বলিয়া আমাকে লিখিতে হইল। এই সংস্রবে আরও অন্যবিধ বিষয়ে এবার যে গভীর যাতনা আমি পাইয়াছি, তাহা কতবার হারিয়াও এ পর্য্যন্ত আর কোথায়ও পাই নাই। সেই মর্ম্মস্পর্শী অন্তর্যাতনায় আমি ত আজীবনই জ্বলিব, আমার বংশপরম্পরাকেও বোধ হয় তাহা অনুভব করিতে হইবে। আবার মুখ ফুটিয়া মনের বেদনা জানাইলেও বিপদ! তাই নীরবে সকল যাতনা সহ্য করি; আর এই অন্তর্যাতনা পীড়িত অন্তরের উচ্ছ্বসিত অশ্রুকণা সেই অন্তর্যামীকে দেখাই।

অতঃপরও আমার যে সকল শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় হিতৈষী মহাত্মাগণ এবং যে সকল সুদুর্ল্লভ অকপট সুহৃদ-সজ্জন আমার জীবনের ঘটনাবলীর দিকে সময়ে সময়ে লক্ষ্য করিয়া থাকেন ও এই দীনহীন কুলোকের আন্তরিক পরিচয় অবগত আছেন এবং খণ্ডাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় এই পুস্তকের সবিশেষ সুখ্যাতি ও সমাদর করিয়াছেন; তাঁহাদেরই পবিত্র নামে বড় সাধের ধন এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

কমল-মৃণাল ভ্রমে কালসর্প ধরিয়া যেরূপ বিপাকে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে গ্রন্থখানি যে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়া আবার দিন পাইব, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যদি বিধাতা এ দীনকে এ দিন অপেক্ষাও সুদিন দেন, তবে উক্ত হিতৈষী মহাত্মাগণের ও সহৃদয় সুহৃদ্বর্গের প্রত্যেকের নামে নামে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধ্যানুযায়ী উপহার উৎসর্গ করিব এবং এই নিদারুণ মর্ম্মযাতনার কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়া দগ্ধপ্রাণ স্নিগ্ধ করিব। এক্ষণে এই চক্ষু-জলমাখা সামান্য কানন-কুসুমই সাদরে কর-কমলে গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

বিনয়াবনত চিরস্নেহ-প্রেমাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমাখনলাল দত্ত।

'চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা' যখন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন বহু স্থানের বহুতর পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন; বিশেষতঃ শ্রীরামপুরস্থ বহুতর সম্ভ্রান্ত বিদ্বজ্জন সমীপেও ইহা সবিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। এক্ষণে সে সকল প্রকাশের স্থান সঙ্কুলান হয় না; পরে পুনঃ সংস্করণে সেই সমস্ত বিষয় এবং আধুনিকও যত পত্র আসিতেছে ও আসিবে, সে সকলই মুদ্রিত হইবে। আপাততঃ কেবল দুইখানি মাত্র প্রকাশিত হইল। ডুমকার এক্সাইজ ইনেস্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি বিশ্বাস বি, এ, দ্বিতীয় খণ্ডের সমগ্র, বিশেষতঃ উদ্বোধন-অধ্যায়টি পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, লিখিয়া আগ্রহের সহিত গ্রাহক হইয়াছিলেন এবং পরেও কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিয়াছেন——

ডুম্‌কা ডিস্‌টিলারী

প্রিয় সুরেন্দ্র বাবু! ২৯। ৪। ৯৭

*　*　*　*　*　*　*

চিত্রগুপ্তের শেষ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। মাখন বাবুর লেখাতে লালিত্য, মধুরতা ও হৃদয়াকর্ষিণী শক্তি আছে। আশা করা যায়, তিনি ভবিষ্যতে চৌবেড়িয়ার পূর্ব্বকীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন।

*　*　*　*　*　*　*

বশম্বদ

শ্রীগৌরহরি বিশ্বাস বি, এ।

ডুম্‌কা
এক্সাইজ ইনেস্পেক্টার

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু মাখনলাল দত্ত

মহাশয় কল্যাণবরেষু।

গুপ্তকথার শেষ চারি খণ্ড পাইয়াছি। পড়িয়া মন তৃপ্ত হইয়াছে; এবং অনেক সময় উহা দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছি। যাহা হউক, ইহা যে মনুষ্যের নিকট অতি আদরের জিনিস হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনার কৃত পেটেণ্ট ঔষধ সকল ও তৈলের উপকারিতার কথা নারায়ণ ভায়ার মুখে শুনিয়া পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি তাহা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এবাটীর মঙ্গল, আপনার ও নারায়ণ ভায়ার কুশল লিখিয়া সন্তোষ করিবেন। ইতি। ১৩০৪, ৫ই ভাদ্র।

নায়েব জমিদারী কাছারী শিকার পুর—সারসা পোষ্ট— জেলা যশোহর।	আশীর্ব্বাদক শ্রীঅম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী।

এই স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল তিন পর্ব্বে সমাপ্ত ধর্ম্ম ও রহস্য পূর্ণ অপূর্ব্ব নূতন ধরণের গ্রন্থখানির মূল্য আড়াই টাকা মাত্র; কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় এখানিও গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে বলিয়া এখনও আর দুই শত গ্রাহককে অর্দ্ধ মূল্য অর্থাৎ মায় ডাকমাশুল ১।০ পাঁচ সিকায় দেওয়া যাইবে। পরে আর কিছুতেই অর্দ্ধ মূল্যে পাওয়া যাইবে না। সত্বরই নিম্ন ঠিকানায় মূল্য পাঠাইয়া অথবা ভি, পিতে লইয়া গ্রন্থখানি গ্রহণ করুন ও যেখানে এক দিন যাইতেই হইবে, সেই শমন সদনের সবিশেষ পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া রাখুন।

পোষ্ট চৌবেড়িয়া, জেলা যশোহর।	শ্রীমাখনলাল দত্ত। হেড মাষ্টার, চৌবেড়িয়া স্কুল।

শুদ্ধিপত্র।

পাঠকগণ পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাস্থ নির্দ্দিষ্ট ছত্রগুলির ছাপার ভুলসমূহ লিখিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন; নতুবা কোন কোন স্থল অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে। প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরিভাগে পুস্তকের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্কের (পাতের নম্বরের) যে ছত্র আছে, তাহা বাদ দিয়া গণনা করিবেন। তাহার পর হইতে সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ছত্র এবং এমন কি, মধ্য-স্থলে যদি একটি অধ্যায় সমাপ্তির ক্ষুদ্র রেখাও থাকে, তাহাও ছত্র বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। মুখবন্ধে যে অশুদ্ধিগুলি শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিও সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৬	অমরাবতীধাম	অমরাবতীধামে
৬	১৮	বুঝিতে	বুদ্ধিতে
১২	২৫	হরষিতে	হরষেতে
২৩	১৭	দেবন্দৃষ্টি	দেব-দৃষ্টি
২৯	৭	ব্রহ্মণ	ব্রাহ্মণ
৭৯	৮	অষ্টম অধ্যায়	নবম অধ্যায়
৯৫	৬	নবম অধ্যায়	দশম অধ্যায়
১০১	১৩	সমহান্	সুমহান্
১০১	১৪	সংশোধিত	সংসাধিত
১৫০	৪	উজল	উজ্জ্বল
১৫৮	১১	মুখে	সুখে
১৮৩	১৪	ফিরাইয়ে	ফিরাই রে
১৮৪	২৪	পয়িধান	পরিধান
১৮৮	২৫	কোথয়	কোথায়
২০২	৪	ছেলেবেলামার	ছেলেবেলাকার
২০৫	২২	প্রাণ পাগলমনপাগল	প্রাণ পাগল, মন পাগল
২০৫	২৫	আর	সার
২০৬	২	করারও	করায়ত্ত
২০৭	৪	তত্ব	তত্ত্ব
২০৭	১৫	অন্যবেশ ধারিণী	অন্য বেশধারিণী !
২০৮	৩	স্থলে	চ্ছলে
২২০	২৮	সাপে	কালসাপে
২২৩	২১	চিরাভিসপ্ত	চিরাভিশপ্ত
২৩৭	১৬	রেক্তঃফণা	রেতঃকণা
২৩৭	২৩	বাএক	বালক
২৬০	৪	জানিতে	জানি হে
২৬১	২০	সাধের	অর্থের
২৬২	৫	আত্মহত্যার	আত্মহত্যায়

নিবেদন।

(১)
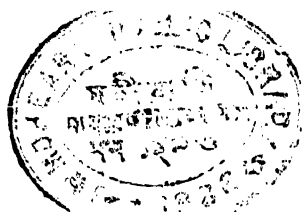
সংসারের সুখ সম্পদ, মায়া মমতা, রাজ্য ঐশ্বর্য্য, আত্মীয় স্বজন, সকল ছাড়িয়া একদিন যেখানে যাইতেই হইবে, সেখানকার কথা কাহারও বারেকের জন্য মনে হয় কি? সুখ-স্বচ্ছন্দে খাইয়া খেলিয়া, হাসিয়া নাচিয়া, দম্ভের ভরে বেড়াইতেছি—শেষের কথা কিছুই মনে হয় না; কিন্তু যখনই কোন আত্মীয় বা প্রতিবেশীর অকালমৃত্যুজনিত রোদনের রোল শুনিতে পাই, তখনই শুধু একবারমাত্র শরীর শিহরিয়া উঠে ও শেষের সে দিনের কথা স্মরণ হয়। হায়! নিত্য দেখিতেছি—নিত্য শুনিতেছি—নিত্য জানিতেছি যে, এই ভবধামে দুদিনের বসবাস দুদিনেই উঠিয়া যাইবে, তবু কেমন 'আমি' 'আমি' করিয়া—আমার সকলি বলিয়া "আমিত্বের" মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকি! যদি কেহ যমের বাড়ী, মরণ বা বিকার, বিসূচিকাদি রোগের কথা মুখে আনে, অমনি "বালাই, বালাই" বলিয়া সে কথা ঢাকিয়া ফেলি। কেন এত ভয়? কেন এত মায়া? মরণের কথা মনে হইলেই বা কেন এত মুখ শুখায়? আপনার জন সব ফেলিয়া যাইতে হইবে—আমি গেলে আমার অবর্ত্তমানে আপনার জনের কি গতি হইবে, এই ভাবিয়াই কি মৃত্যুর কথা মনে করিতে ভয় হয়? হায় অবোধ মানুষ আমরা! কে আপন, কে পর কিছুই চিনিলাম না! এই আপনার জন ফেলিয়া যাহার কাছে যাইব, সে যে কেমন আপনার জন—

তা যদি জানিতাম, তবে আর কাঞ্চন ফেলিয়া কাচকে এত ভালবাসিতাম না। আর আমি বিনা যাহাদের কি গতি হইবে ভাবিতেছি, তাহাদেরই বা কে পাঠাইয়াছে—কে পালন করিতেছে যদি জানিতাম, তবে মরিবার ভয়ে মরিতাম না। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কত পাপ করিয়াছি—মরিয়া কোন্ নরকে যাইব, এই আশঙ্কাতেও কি যমের নামে শিহরিয়া উঠি? তাহাও যদি হয়, তবে কেন এখনও দিন থাকিতে সাবধান হইয়া চলি না? শুনিয়াছি কলির জীবের পাপমুক্তি ত সহজ উপায়েই হয়! কিন্তু সে উপায়ও ত জানি না; তাই যে দারুণ ভয়! ভয় কি ভাই! এই "যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব" পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হও—সকল ভয় দূর হইবে।

অনেকেই বলিতে পারেন, চিত্রগুপ্তের গুপ্ত কথা বা যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব জগতের একজন জীবিত জীব কেমন করিয়া জানিল? কিন্তু ভাই—আমাদের কি নাই? যে সুগভীর শাস্ত্র-সমুদ্র সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোন্ রত্নের অভাব? বাছিয়া বাছিয়া কুড়াইতে পারিলে সকলই পাওয়া যায়। সেই ভবসাগরের শেষ—সেই অজানিত অপরিচিত দেশ—সেই বৈতরণীর পরপার—সেই কি জানি কেমন অন্ধকার, সকলকার কথাই শাস্ত্রমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তবে কেন বলদেখি—সেই যমপুরীর কথা না জানিতে পারিব? যদি বলেন, যমের বাড়ীর নিগূঢ়তত্ত্বই যেন শাস্ত্রে আছে, কিন্তু চিত্রগুপ্তের গুপ্ত কথা কেমন করিয়া জানা গেল? শাস্ত্রে থাকিলে সাধারণে নাই জানুক, শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ত জানেন; তবে আর সে গুপ্ত কথা কেমন করিয়া হইল?

কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, হিন্দু হইতে বৌদ্ধ—বৌদ্ধ হইতে পুনরায় হিন্দু; হিন্দু হইতে আবার মুসলমান—মুসলমান হইতে খৃষ্টিয়ান এইরূপ বারম্বার রাজ্যবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবে বিবিধ বিশৃঙ্খলায় হস্তলিখিত অনেক মহা মহা শাস্ত্রের পুঁথি-সমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; যেগুলি অনেকের নিকট ছিল, সেইগুলিই এখন দেখা যাইতেছে; কিন্তু যে দুই একখানি দুই এক জনের নিকট মাত্র কীটদষ্ট ও জীর্ণাবশিষ্টভাবে পড়িয়া আছে—যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও কদাচিত কোন জনও জানে কি না সন্দেহ, তাহাকে গুপ্ত ধন, গুপ্ত রত্ন বা গুপ্ত কথা ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? এইরূপ গলিতোন্মুখ গুপ্ত পুঁথি হইতে চিত্রগুপ্তের অনেক গুপ্ত রহস্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই গ্রন্থের নাম "চিত্রগুপ্তের গুপ্ত কথা" হইল।

আবার কেহ কেহ পুস্তকের নামটি পড়িয়াই হয় ত হাসিয়া বলিবেন, এমন ধর্ম্মগ্রন্থের নাম যেন বটতলার ফেরিওয়ালাদের পুস্তকের ন্যায় হইয়াছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ সংসারের কোন্ কথাটীই বা সম্পূর্ণ সদর্থে ব্যবহৃত হয়? মনের গুণে সকল কথাই ভাল মন্দ অর্থে ব্যবহার করা যায়। অন্তরে মন্দ বা তামসিক ভাব রাখিয়া যদি কোন বাক্য শ্রবণ বা পাঠ করা যায়, তবেই তাহা রহস্যের কথা হয়। আর যদি গাম্ভীর্য্যসহকারে মর্ম্মস্পর্শী চিন্তাশীলতার দ্বারা সেই কথা বুঝা যায়, তবে তাহাকেই আবার ভাল বলিয়া বোধ হয়। তাই বলি গ্রন্থের নামের গুরুত্ব বা লঘুত্ব পাঠকের হৃদয়ে!

আর একটী কথা—গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া যেন

সকলে সমালোচনা করেন। ইহার কোথায়ও নীরস—কোথায়ও সরস! আঁধার না থাকিলে যেমন আলোর গুণ বুঝা যাইত না—তিক্ত না থাকিলে যেমন মিষ্টের আস্বাদ পাওয়া যাইত না—দুঃখ না থাকিলে যেমন সুখের বোধ হইত না, সেইরূপ কাঠিন্য না থাকিলে কি কোমলতা পাওয়া যায়? গ্রন্থের কোন স্থান নীরস দেখিয়া পাঠ করিতে বিরক্ত হইলে কি তাহার মাধুর্য্য বুঝা যায়?

এক্ষণে "জয় হরি দয়াময়" বলিয়া গুরুভার স্কন্ধে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম; গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পাঠিকা প্রভৃতি সকলেরই যেন কৃপাদৃষ্টি থাকে; এই এক মাত্র—**নিবেদন**।

(২)

রাজা পরীক্ষিতের প্রাণ পরিত্যাগের পর কলিকালের বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। এখন সম্পূর্ণ কলির অধিকারে সমগ্র সৌর জগৎ অস্থির, কলির প্রতাপে পৃথিবী প্রকম্পিত! দেবগণ কিন্তু নিদ্রিত—অমরভূমি অমরাবতীধাম সুখের আরামে সুনিদ্রায় নিদ্রিত! এমন নিদ্রিত যে, তাঁহারা আর আছেন বলিয়াই বোধ হয় না; বিশেষতঃ এসংসারের শিক্ষিত সুসভ্য সম্প্রদায় স্বর্গবাসীর সত্ত্বা সম্বন্ধে সততই সন্দেহ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন "যখন চক্ষে কাহাকেও দেখা যায় না বা কোন কার্য্যের দ্বারাও কিছুই জানা যায় না, তখন দেবতা আবার কি? এই জগৎ সংসার স্বভাব সম্ভূত! অর্থাৎ আপনা আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে—সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই!" কেহ কেহ বলেন "কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া হয় না, একজন নিরাকার ঈশ্বর অবশ্যই আছেন;

কিন্তু ইট্ পাটকেল বা নোড়া নুড়ীগুলি লইয়া তেত্রিশকোটী না ছত্রিশকোটী দেবতার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা।” এইরূপ যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলেন; এখন একজন নিতান্ত অপগণ্ড শিশুও এই দেখাদেখি পৈতা পুড়াইয়া ভগবান্ হয়! শাস্ত্রের শ অক্ষর জানে না—ধর্ম্মের ধ অক্ষর বুঝে না; অথচ চারিবেদ চাষার গান—অষ্টাদশ পুরাণ আজগবি উপাখ্যান, রামায়ণ মহাভারত রূপকথা—শাস্ত্র সমষ্টি সমাজের ব্যথা, পুতুল পূজা কুলের কণ্টক—পুরোহিত ব্রাহ্মণ চতুর বঞ্চক প্রভৃতি বলিয়া মত প্রকাশ করে এবং নিরাকার একেশ্বর বাদী হইয়া চক্ষু মুদিয়া আজীবন অন্ধকারই দর্শন করে। না করিবেই বা কেন? দেবগণ এই খেলা খেলিবার ও এই তামাসা দেখিবার জন্যই এমন আত্মগোপন করিয়াছেন যে এখন তাঁহাদের অস্তিত্ব নির্ণয় করা সহজবুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে।

যে অগাধ বিদ্যা ও অপার বুদ্ধি বলে সভ্য হিন্দু এখন বুক ফুলাইয়া উচ্চ মেজাজে নাচিয়া বেড়াইতেছে, সে বিদ্যাবুদ্ধিতে দেবগণকে বোধগম্য করা দুঃসাধ্য! তবে তাঁহাদের মতে যাঁহারা বুড়া পাগল (ওল্ড ফুল) বা অশিক্ষিত পুরুষ, তাঁহারাই এখনকার দিব্যজ্ঞান না পাইয়া প্রাচীন প্রথামত পূর্ব্বপুরুষের পথানুযায়ী চলেন; বিশৃঙ্খলাময় ধর্ম্ম শাস্ত্রে নানারূপ গোলমাল দেখিলেও তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন; দেবগণ আছেন কি নাই—তাঁহারা সত্য কি কল্পিত? এসকল কথা একবারও না ভাবিয়া পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়াভিলাষে দেবোপাসনায় কাল কাটায়। ইহাঁদের অশিক্ষিতা রমণীগণ ও ‘অনন্ত’ ‘দুর্ব্বাষ্টমী’, ‘সাবিত্রী’

'পঞ্চমী' প্রভৃতি ব্রত বিধানে মনোনিবেশ করে এবং "অশ্বত্থ অশ্বত্থ নারায়ণ—তুমি অশ্বত্থ ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি বলিয়া অশ্বত্থ-গাছের শিরেও জল ঢালে। নির্ব্বোধ নরনারীগণ নারায়ণকে না দেখিয়াও শালগ্রাম শিলাও ষষ্ঠী পঞ্চানন্দের পূজা করে এবং দেবস্থানের নাম শুনিলেই নিতান্ত কদর্য্য স্থানেও ঘাড় হেঁট করে।

এইরূপ নির্ব্বোধ অশিক্ষিত ও অসভ্য নামে পরিচিত থাকাও ভাল, কিন্তু আজকালকার সুসভ্য সুবিদ্বান ও মুখ সর্ব্বস্ব বুদ্ধিমান হওয়াও প্রার্থনীয় নহে। বুঝি না বুঝি—দেখি না দেখি একালে নিরেট বোকা থাকিয়া দেব দ্বিজে ভক্তিমানও সন্ধ্যা আহ্নিক পরায়ণ হইয়া থাকাও অনেকাংশে শ্রেয়ঃ! বুঝিবার মত বুঝিতে না পারিলে, এখনকার অর্থ-করী বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে অনর্থক অনধিকার চর্চ্চা না করিয়া এইরূপ অবুঝের ন্যায় হইয়া থাকাই ভাল। আর যদি দেব-লীলা ভাল করিয়া বুঝিতে চাও, তবে শাস্ত্র গ্রন্থরাশির প্রতি পৃষ্ঠা ওলট পালট করিয়া দেখ—শুধু দেখিলেই হইবে না, বিশেষ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা কর—শুধু এইরূপ আসর জমকাল ভাসা ভাসা বুঝিতে হইবে না; যে কূট বুদ্ধি বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে শাস্ত্রালোচনা করিতেন, যদি সেই বুদ্ধি থাকে বা ধরিতে পার, তবেই শাস্ত্র দেখিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে এবং দেবগণের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিবে; নতুবা বুদ্ধির দোষে শাস্ত্র কথার বিকৃত অর্থ করিয়া তাহাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবে এবং এমন সনাতন ধর্ম্মে তোমার অনাস্থা জন্মিবে। প্রকৃত পক্ষে এখন এইরূপই ঘটিয়াছে।

যুগ যুগান্তর যোগ সাধনা করিয়া যোগী ঋষিগণ যে অপার অপরিমেয় রত্নাকর শাস্ত্র সিন্ধু দ্বারা ধর্ম্ম জগৎ প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, উপযুক্ত ডুবারি হইয়া সে সাগরে ডুব দিলেই জ্ঞানরত্ন লাভ হয় ; নতুবা কেবল হাবু ডুবু খাইয়াই মরিতে হয়। যে বুদ্ধি থাকিলে এইরূপ ডুবারি হওয়া যায়, সে বুদ্ধি সংসারে এখন কয় জনের আছে? স্বয়ং গ্রন্থকারেরও বোধ হয় নাই, তাই এই 'চিত্রগুপ্তের গুপ্ত কথার' প্রচার! ইহাতে তত খানি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকিলেও সর্ব্বশাস্ত্রের সামঞ্জস্য, সারমর্ম্মও প্রকৃত তত্ত্ব বেশ বুঝা যাইবে ; গোল-মেলে হিন্দুধর্ম্মকে সুনিয়মাবদ্ধ দেখা যাইবে ; দেবগণ নিদ্রিত কি জাগ্রত জানা যাইবে এবং হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ সার্থক বোধ হইবে।

বিলাতিবিষাক্তবুদ্ধিবিহীন, প্রোজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত পাটলী অর্থাৎ শাস্ত্র সমুদ্রের উপযুক্ত ডুবারিগণ কর্ত্তৃক রত্ন তুলাইয়া লইয়া এজগতের একটী কীটানুকীট এই গ্রন্থ-কার এই হার গাঁথিয়া গৌড়জনের গলে পরাইল! পাঠকের প্রতি শেষ মিনতি—এই অতি যত্নের রত্নহার যেন যোগ্য-পাত্রে পড়ে!

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ মা লিখ মা লিখ"

কালিদাস পণ্ডিতের অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী কবিবর বর-রুচির এই বাক্যই পুনরাবৃত্তি করিলাম অর্থাৎ হে ভগবান! অরসিকের কাছে রস নিবেদন করা বা রস বাক্য বলা যেন আমার ভাগ্যে লিখিও না! এ অধম গ্রন্থকারেরও একমাত্র এই—**নিবেদন!**

গণেশ বন্দনা।

জয় জয় গণপতি দেব গজানন,
বিঘ্ন বাধা বিনাশহে বিঘ্নবিনাশন !
সিদ্ধি পেতে সিদ্ধিদাতা তোমার গোচর,
যে চারু চরণ চায় বিশ্ব চরাচর,
সেই পাদপদ্ম দুটী ধরিয়া এবার,
বিরচিব ব্যূহ চক্র বৃহৎ ব্যাপার,
কলির কলুষ কালী যাহে হবে নাশ,
প্রভাহীন পৃথিবীতে বিভার বিকাশ !
বক্তা বেদব্যাসমুখে শুনি সুধা ধ্বনি,
যে করে লিখেছ দেব ধরিয়া লেখনী,
সে মহাভারত কথা সুধার সমান,
পাপ তাপ শূন্য করে শুনি পুণ্যবান !
সেই সে যুগল কর করিয়া স্মরণ,
কিম্বা ছায়ামাত্র তার ভাবি অনুক্ষণ,
চিত্রিব বিচিত্র চিত্র, চিত্রগুপ্ত কথা,
চিরদিন রবে যাহে সুধা যথা তথা।
কৃপার ভিখারী প্রভো নিকটে তোমার,
মরজীব নর হাত ধরি একবার,
চালাও লেখনী ত্বরা হইয়া সদয়,
জয় জয় গজানন দেব দয়াময়।

সরস্বতী বন্দনা।

কবির আরাধ্য ধন কমল-আলয়া,
নিরক্ষর নরগণে ক'রেছিলে দয়া।
মূর্খাধম কালিদাস, পূরা'লে তাহার আশ,
অদ্বিতীয় কবি নামে বিখ্যাত ধরায়,
অসাধ্য সাধন হয় তোমার কৃপায়।
বাগ্‌দেবী বীণাপাণি, স্তব স্তুতি নাহি জানি,
কৃপাদানে কৃপণতা না কর কাঙ্গালে,
তব নামে করি কাজ যা' থাকে কপালে।
বাসনা বড়ই মনে, সাজাইতে সযতনে,
সুনিয়মে সুশৃঙ্খলে ধর্ম্ম-ছবিগুলি,
হৃদয়েতে সবে যেন যত্নে রাখে তুলি।
পুরাণ-উদ্যান সার, পুণ্যকথা পুষ্পহার,
গলে দিবে বঙ্গবাসী চিরশোভাকর,
বহিবে সুধার ধারা যাহে নিরন্তর।
দেখো দেবি রেখো মনে, নিবেদন নিরঞ্জনে,
ভাসিন্ধু অপার সেই সাহিত্য-সাগরে,
আদরের নিধি যেন সবাই আদরে!

* * *

অনাদি অনন্ত দেব নারায়ণ,
পতিতপাবনী পদেতে যাঁর,
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ যাহে শোভা পায়,
মরি কি সুন্দর বাহার তার।

যে পদ সেবায় রত নিরন্তর,
পরমা প্রকৃতি কমলা সতী,
যুগ যুগান্তর ধরি যে পদ ধেয়ান
যোগী ঋষি আদি যতেক যতি!

দেবারাধ্য সেই মহাবিষ্ণু পদ,
বাঁধিতে বাসনা ভকতি-ডোরে,
নরজন্মে ছার বিষম দুরাশা,
অধর চাঁদকে ধরিব জোরে;

কিন্তু কৃপাময় পরম পুরুষ,
পাইলে তোমার দয়ার বিন্দু,
নিমেষের মাঝে হেলায় মানব,
পার হ'তে পারে প্রবল সিন্ধু।

তাই শুধু চাই চরণের দয়া,
তা'হলেই পাব অতুল সুখ,
হইব নির্ভয় খুলিবে হৃদয়,
মাতিবে মানব থাকিবে মুখ।

স্বয়ং লক্ষ্মী যিনি মনোরমা রমা,
রূপে আলো যাঁর গোলোক ধাম,
চির কৃপা তাঁর না পায় মানব,
চঞ্চলা কমলা যাঁহার নাম।

ভাগ্যদোষে বুঝি বঞ্চিত কৃপায়,
নহিলে বিমুখ এতই দেবী ?
দিন যায় শুধু অভাব চিন্তায়,
হবে না কি ফল চরণ সেবি ?

সঙ্কল্প সাধন অসাধ্য হেথায়
লক্ষ্মী না হইলে সহায় মোর,
ধোয়াব চরণ নয়নের নীরে
কেঁদে কেঁদে সারা জীবন ভোর !

উর উর দেবি হৃদয় আসনে
রাখগো মা রাঙ্গা চরণ দুটি,
দেবের দুর্ল্লভ হরির চরণ
একত্রে রাখিয়া করিব যুটি ;

যুগল রূপের চারিটী চরণ
রাখিব আমার অন্তর মাঝে,
জনম অবধি পূজিব যতনে
সাজাব চন্দন কুসুম সাজে ॥

যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি,
অব্যয় অচিন্ত্য অনন্ত কায়:
যুগে যুগে হও যুগল মূরতি
ভেদাভেদ কিছু বুঝি না হায় !

* * *

যতেক দেবতা করি ক্ষীরোদমন্থন
সুধা পেয়েছিল সবে করিয়া যতন,
হরভাগ্যে হলাহল উঠিল আবার,
ভাগ্যফলে সুধা, বিষ, দোষ দিব কার

পান করি সেই বিষ নীলকণ্ঠ শিব
রাখিলেন সৃষ্টি স্থিতি জগতের জীব।
ভুলি নাই ভোলানাথ চরণ তোমার,
কোথা হর, মহেশ্বর এস একবার !

সুগভীর শাস্ত্রসিন্ধু করিয়া মন্থন,
বরষিতে সুধা-ধারা ক'রেছি মনন ;
ভাগ্যক্রমে যদি হয় বিষ বরিষণ ;
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে করি করিও ধারণ !

একমাত্র বিল্বপত্র তোমার সন্তোষ,
ভক্তিভরে দিলে পরে তোমা আশুতোষ ;
স্বকার্য্যসাধনে তাই ভরসা তোমার,
চিরতরে সকাতরে ডাকি বার বার !

* * *

দেবতা তেত্রিশ কোটী বন্দিয়া সবায়,
দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি মহামায়া মায় !
দুর্গমেতে দুর্গা নাম দুর্গতিহারিণী,
মহাশক্তি মুক্তিদাত্রী দেবি নিস্তারিণী !

নাই মা আনন্দময়ী আনন্দের ধ্বনি
ঘরে ঘরে হাহারব জগৎজননি !
আধি ব্যাধি জরামৃত্যু শোকের উচ্ছ্বাস,
অন্নচিন্তা অর্থচিন্তা শুধু হা হুতাশ !

তাই মা বাসনা বর্ষিতে এখন,
আঁধার সংসারে সুধার ধারা,
ঘুচিবে বিপদ পাইবে সম্পদ
হরষিতে পান করিবে যারা।

সাহিত্য-বাজারে লেগেছে আগুন
শঠতা বঞ্চনা লোভের ফাঁদ,
উপহার নামে সংহার মুরতি
বিনামূলে দেয় গগন চাঁদ !

অর্থ নাহি দেয় পরমার্থ পেতে
উপহার অর্থে অমনি জুটে,
রত্ন বিনিময়ে কাণাকড়ি নিয়ে
হরষে আইসে আবাসে ছুটে ;

বিষম দুর্দ্দিনে বিপুল বাসনা,
মরুতে ফোটাব সুগন্ধি ফুল !
তুমি মা ভবের ভরসা কেবল,
অকূলে আমায় দাও মা কূল !

শ্রীদুর্গা শ্রীহরি বলিয়ে এবার
দুর্গমে দুস্তরে করিনু যাত্রা,
চিরশান্তিময় সুধা বরিষণে
বাড়াতে বাসনা সুখের মাত্রা।

অভাবে আকুল দুঃখেতে ব্যাকুল,
পাপে তাপে চিন্তায় সারা
যাদের জীবন জগতে এখন
হবে না থাকিতে এমন ধারা।

চির-তরে রাখ চিরসাথি করি
'যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব',
পরমেশ পদ পাবে পরিণামে
হবে না থাকিতে মায়াতে মত্ত।

গ্রন্থারম্ভ।

(১)

শ্রীক্ষেত্রের পথে পথিক একজন সন্ন্যাসী ; যেন কি ভাবিতে ভাবিতে একমনে চলিয়াছেন ! সন্ন্যাসী সুপুরুষ গৌরাঙ্গ ; দেহ হইতে যেন তেজোরাশি বাহির হইতেছে ! মস্তকে জটাজূট, বদনে শ্মশ্রু, স্কন্ধে ঝুলি, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, কটীতে বাঘছাল ও করে কমণ্ডলু ! বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ ! যোগী পুরুষ যাইতে যাইতে যাজপুর অতিক্রম করিয়া সোজা পথ ছাড়িলেন ; অন্যপথে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন ; পরে পথ ছাড়িয়া প্রান্তর দিয়া বরাবর চলিলেন ; চলিতে চলিতে দিবাবসান সময়ে এক বটবৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ঝুলি হইতে ক্ষুদ্র একটী একতারা বাহির করিয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিতে দিতে পূরবী রাগিণীতে গান ধরিলেন—

যতনে রতন মিলে, অযতনে যায়রে,
গেল বেলা, এই বেলা আয় আয় আয়রে !

নিকটবর্ত্তী নিবিড় বন হইতে বামাকণ্ঠে ঐ সুরে সুর মিশাইয়া কে গাহিল—

আসিয়ে কূলের কাছে, তরণী ডুবাই পাছে,
সদা সেই ভয় আছে, সেই দিকে চিত ধায়রে !

সন্ন্যাসী আবার সেই সুরে গাইলেন—

ভবভোগে অবহেলা, ফুরায়েছে ধূলাখেলা,
ছাড় শুধু এই বেলা, সেই অনিত্য মায়ায়রে !

সেই বামাকণ্ঠস্বরে সেই সুরে আবার গগন ভেদ করিয়া গান উঠিল—

নাহি করি কোন কর্ম্ম, ধরেছি বিষম ধর্ম্ম,
কিবা এ ধর্ম্মের মর্ম্ম, কি জানি কেমন হায়রে!

সন্ন্যাসী পুনরায় সুর মিলাইয়া ধরিলেন—

যতনে রতন মিলে, অযতনে যায়রে,
গেল বেলা এই বেলা আয় আয় আয়রে।

তখন সেই বনবাসিনী বামা, বনদেবীর ন্যায় বনভূমি আলো করিতে করিতে তথায় আসিয়া সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে পড়িয়া প্রণাম করিল। যোগী কহিলেন "এখনও তুমি এ ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই? ভবিষ্যতে ভাল করিয়া বুঝাইব এবং কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিব"।

বামা সবিস্ময়ে কহিল "অকস্মাৎ প্রভুর অসময়ে এপথে পদার্পণ কেন? অসম্ভব ঘটনা এমন ঘটিল কেন? যে জন্যই হউক, দাসীর পক্ষে দেব-দর্শন পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে"।

সন্ন্যাসী। অসময়ে লঙ্কার রাক্ষস রাজর্ষি বিভীষণ পুরুষোত্তমে পুরুষোত্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন তাঁহার আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় এখনও হয় নাই— অথচ বিপুল সাজ সজ্জায় তাড়াতাড়ি আসিতেছেন জানিতে পারিয়া আমি ইহার কারণ জানিবার জন্যই পুরীর পথে ছুটিতেছি।

বামা। আপনি এসকল কথা কি করিয়া জানিলেন?

সন্ন্যাসী। একদিন সঙ্গীত আলাপ করিতে করিতে সহসা আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; তখন ধ্যানে মগ্ন হইয়াই এই ঘটনা জানিতে পারিলাম।

বামা। আপনি কি ঠাকুরদের সে সকল কথোপকথন শুনিতে পাইবেন ?

সন্ন্যাসী। (সহাস্যে) কেন, কি অপরাধে ? আমি কি ভেসে এসেছি, শুনিতে না পাইলেই বা যাইতেছি কেন ?

বামা। আমি কি আপনার সহিত যাইবার অনুমতি পাইতে পারি ?

সন্ন্যাসী। (গম্ভীর স্বরে) সাবধান ! এরূপ কথা আর বলিও না ; বামা জাতির এরূপ বাচালতা বড়ই বিড়ম্বনাময়। যে কথা সেখানে শুনি, পরে জানিতে পারিবে।

বামা। প্রভো ! ক্ষমা করুন, আমি না বুঝিয়াই এরূপ বলিয়াছি ; কিন্তু কলিযুগের কাণ্ড সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে, সে সকলের সুমীমাংসার জন্য কি আপনাকে একটু বিরক্ত করিতে পারি ?

সন্ন্যাসী। এখন নহে—ফিরিবার কালে সে সকল হইবে।

বামা। তখন কি এখান দিয়া যাইবেন ? ভুলিবেন না ত ?

সন্ন্যাসী। কেন ভুলিব মা ? মাকে কি ভুলিতে পারি ?

বামা। কিন্তু যে মহাপুরুষের লক্ষ্য সেই জ্যোতির্ম্ময়ী জগন্মাতা, তাঁহার কি এই মানবী মাতাকে সর্ব্বদা স্মরণ থাকে ? যিনি মহামূল্য মরকত মণি পাইয়াছেন, তিনি কবে কোথায় একটু রূপার টুক্‌রা দেখিয়াছেন, তাহা কি মনে থাকে ? যিনি স্বর্গের সার পারিজাতের হার গলে পরিয়াছেন, তিনি কবে কোথায় একটী কাঠমল্লিকা দেখিয়াছেন, তাহা কি মনে থাকে ? তপনের তেজ যাঁহার তপ্ত কাঞ্চন তুল্য দেব দেহ হইতে অহোরাত্র

বহির্গত হয়, তাঁহার কি একটী সামান্য তৈলশূন্য প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোর কথা মনে পড়ে ?

সন্ন্যাসী। যে পরমপিতার চক্ষে একটী ধূলিকণাও লুকান থাকে না, যাঁহার দৃষ্টি জগতের যাবতীয় জিনিসেরই উপর, সু, কু বা বৃহৎ ক্ষুদ্র দ্রব্য মাত্রেতেই যাঁহার অবস্থিতি, এই কীটানুকীট তাঁহারই ত মা দাসানুদাস! তবে কেন ভুলিব ? এখন আমি চলিলাম।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে—সেই চন্দ্রালোকে যোগী পুরুষ পুনরায় পুরীর পথে পথপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সেই জগৎভরা জ্যোৎস্নালোকে সেই জ্যোৎস্নাময়ী জগৎমোহিনী রমণীও রূপের রাশি লইয়া ধীরে ধীরে বনপথে চলিল। নিবিড় বনের মধ্যে গিয়া একখানি পর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিল এবং একটী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে দীপ জ্বালিল। দীপটী যেমন জ্বালা হইল, অমনি সেই বনভূমি কম্পিত করিয়া কোথা হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে একটী শব্দ আসিল—"রাক্ষসি! এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?" কোথায়ও কেহ নাই, অথচ কোথা হইতে যে ভয়ানক রবে এই কয়েকটী কথা আসিল তাহা বুঝা যায় না; অন্য কেহ সেখানে, সে অবস্থায়, সে সময়ে, সেই স্বর শুনিলে স্পন্দহীন হইয়া মূর্চ্ছা যাইত, কিন্তু রমণীর সে দিকে দৃকপাতও নাই! দীপ জ্বালিয়া রমণী হরিগুণ গানে গগন প্রাঙ্গন প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। গীত সমাপ্ত হইবামাত্র এবার আবার নিবিড় বন বিদীর্ণ করিয়া বিকট চীৎকারে খল খল হাস্যের রব উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই রবের সহিত এই কয়েকটী কথা কোথা হইতে

আসিল—"পাপিয়সি! পাপের মাত্রা কি এখনও পূর্ণ হয় নাই ?"

রমণী ইহাতেও লক্ষ্য না করিয়া একখানি মৃগচর্ম্মোপরি বসিয়া একমনে হরিধ্যানে নিমগ্ন হইল। এমন অতুলনীয় রূপলাবণ্য ত্রিভুবনে দুর্লভ! সেই দুগ্ধালক্তক বিনিন্দিত বর্ণ দেখিয়া বোধ হয় যেন দেহ হইতে রক্তরাশি ফাটিয়া বাহির হইতেছে। বয়স বিংশ হইতে ত্রিংশের মধ্যবর্ত্তী—যেন একটী সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল—ফুটিতে কোথায়ও বাকি নাই, অথচ আজিও ম্লান বা শুষ্কোন্মুখ হয় নাই! এই ললনার অলৌকিক ললিতলাবণ্য লেখনী দ্বারা লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। চিত্রকর হইলে সে সুচারু বিচিত্র চিত্র চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া তুলির সার্থকতা দেখাইতাম। যখন রুদ্রাক্ষ-মালা গলে দিয়া গৈরিকবসন পরিয়া বামা বম্ বম্ শব্দে বিজন বন বিদীর্ণ করে, তখন তাহাকে কৈলাসেশ্বরী ভবারাধ্যা ভগবতী বলিয়াই বোধ হয়; যখন শুভ্রবসন পরিয়া এলো-কেশে কামিনীকরে একতন্ত্রী লইয়া কোকিলকণ্ঠে কানন কাঁপাইয়া কুরঙ্গ বিহঙ্গাদিকে নিশ্চল নিস্পন্দ করে, তখন তাহাকে বীণাপাণী সরস্বতী স্বরূপই জ্ঞান হয়; আবার এখন আলুলায়িত কুন্তলা রমণী যেরূপে কুটীরে বসিয়া পরমেশ প্রেমে পাগলিনী, তাহাতে যেন সে—লক্ষ্মীস্বরূপিণি; অধিক কি—সে ভুবন ভুলান মূর্ত্তি, সে অপরূপ রূপরাশি, সে সোণার সুচারু ছবি বারেক দর্শনেই বোধ হয় দেবকন্যা দারুণ শাপ-ভ্রষ্ট হইয়া যেন মহীমণ্ডলে মানবীমূর্ত্তিতে এই বনের বনদেবী-রূপে বিরাজিতা!

রমণী রাজরাণী বা কাঙ্গালিনী—সন্ন্যাসিনী বা পাগলিনী,

যাহাই হউক, এখন তাহার আর অধিক পরিচয় পাঠক পাই-বেন না; কিন্তু বিজনবনে দৈববাণীবৎ দুইবারের দুইটী বিস্ময়কর বাক্য এবং বিকট হাস্যের রব যেন সকলেরই স্মরণ থাকে।

(২)

যথাকালে যোগীপুরুষ পুরুষোত্তম হইতে পুনরায় রমণীকে দেখা দিবার জন্য তাহার কুটীরে আগমন করিলেন। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর! সন্ন্যাসী অত্যল্পকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়াই কহিলেন "বৎসে! তোমার কোন্ কোন্ বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহা এখন বলিবে কি?" রমণী কহিল "প্রভো! কলির কাণ্ড সম্বন্ধে শুকদেব গোস্বামী শাস্ত্রে যাহা ভবিষ্যৎ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার সকল লক্ষণই ত দেখা যাইতেছে; কিন্তু কোন কোন বিষয় যেন তাহার অপেক্ষাও কমবেশী পরিমাণে ঘটিতেছে দেখিতেছি; ইহার কারণ কি? শুকদেব বলিয়াছেন "কলিতে অর্থেরই জয়—অর্থ হীনতার পরাজয়! দরিদ্রতাই অসাধুর লক্ষণ—ধনগর্ব্বই সাধুতার চিহ্ন! বাচা-লতাই পাণ্ডিত্য—গাম্ভীর্য্যই মূর্খতা! আহারে খাদ্যাখাদ্য ভেদ নাই—বিবাহে কুল গোত্র বিচার নাই! ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রই সার মাত্র—একেবারে সন্ধ্যাবন্দনাদি বিবর্জ্জিত! ভূমি সমূহের মৃত্তিকামাত্রই, সার—একেবারে উর্ব্বরতাশক্তি শূন্য! মানবের পরমায়ু পঞ্চাশ বৎসর মাত্র! তাহার পর অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক ও চিন্তা প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গই তিনি কলির লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন; কিন্তু প্রভো! সকল স্থলেই কি এসকল সমান কার্য্য করে? মানবের আয়ু জ্যোতির্বিদগণ পঞ্জিকায় একশত বিংশ

বৎসর স্থির করিয়াছেন, আবার পঞ্চাশ বৎসর শুকদেব বলেন, কিন্তু সেই সেই বয়সেই বা কতজন যায় ? অকাল-মৃত্যু এতই হইতেছে যে কলির শাস্ত্রোক্ত লক্ষণেরও অতিরিক্ত ; ইহার কারণ কি ?" আরও শাস্ত্র পাঠ করিবার সময় সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্য দেখি না কেন ? মূলে ঠিক থাকিলেও নানা মুনির নানা মতের কারণ কি ? সন্ন্যাসী সহাস্যে কহিলেন "মা ! এসকল বিষয় তোমার মনেও উদিত হইয়াছে, আমি পুরীধামে পুরুষোত্তমের সহিত বিভীষণের যে কথোপকথন হইল, তাহাতেও শুনিলাম যে স্বর্গে মহা হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে ; অত্যধিক অকাল-মৃত্যু ও অন্যান্য অনেক কারণে ইন্দ্রালয়ে দেবগণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইবে এবং তথায় যমরাজ ও চিত্রগুপ্তকে আনাইয়া কলির বহুতর বিষয়ে সুমীমাংসা হইবে। তাহাতে সমগ্র ত্রিদিব ধাম টলমল করিবে এবং চতুর্দ্দশ ভুবন প্রকম্পিত হইবে। স্বর্গের দেবদেবী মাত্রই তথায় উপস্থিত থাকিবেন, তাহা ছাড়া মর্ত্ত্যভূমি এবং পাতালপুরীরও অনেক সাধুর সজীবনে সেখানে সমাগম হইবে ; নিমন্ত্রণের ভার আবার সেই নারদ ঋষির উপর পড়িয়াছে ; তাহাতে যে আরও কি মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। এই সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ লইবার জন্য বিভীষণ, কলির দেবতা জগন্নাথজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে এমন অসময় আসিয়াছিলেন। যাহাই হউক মা ; এইবার একটা সোজা পথ অনেকেই পাইবে ; অনেক সময়ে অনেকের বড়ই গোলমালে পড়িতে হয়, কিন্তু এবার ধাঁধা ঘুচিবে—চক্ষু ফুটিবে—হিন্দুধর্ম্মের একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম নিশ্চয়ই সংস্থাপিত

হইবে—নানা মুনির নানা মতের কারণও বুঝা যাইবে”। রমণী কহিল, “ঠাকুর! ইহাতে যে সন্দেহ আরও বাড়িল; যদি কলির জীবের ধাঁধাই ঘুচিবে—চক্ষুই ফুটিবে, শাস্ত্রের গোলমাল কাটিয়াই যাইবে, তবে শুকদেবের বর্ণনা যে মিথ্যা হইবে—পৃথিবীর পাপের ভার যে লাঘব হইবে; আর তাহা হইলে সকলি একাকার হইয়া ত যাইবে না অর্থাৎ বৈষম্য গিয়া সাম্যের দুন্দুভি ত বাজিবে না? ইহারই বা অর্থ কি? আবার স্বয়ং ভগবান যে কলির শেষে কল্কি-রূপে সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের বাটী জন্মগ্রহণ করিয়া দেবদত্ত অশ্বারোহণে খড়্গাঘাতে কলির ধ্বংস-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, শাস্ত্রোক্ত একথাও থাকিবে কি?” সন্ন্যাসী কহিলেন “অবশ্যই থাকিবে—শাস্ত্র কখনই মিথ্যা হইবার নহে, ইহা স্থির জানিও। সে সকল গুরুতর বিষয়ের প্রশ্নোত্তর বা বাদানুবাদ করিবার সময় এখন নহে”। রমণী কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল “প্রভো! প্রশ্নোত্তরে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করা দাসীর উদ্দেশ্য নহে। আমি আর নিজে নিজের নহি—ঐ পাদপদ্মে আমার যাহা কিছু, সকলি সমর্পণ করি-য়াছি। আর একটী কথা—আপনারও কি স্বর্গে দেব সভায় নিমন্ত্রণ হইবে?” সন্ন্যাসী কহিলেন “কি করিয়া জানি মা? যাহাই হউক তুমি সমস্তই জানিতে পারিবে। আমি এখন আশ্রমে চলিলাম; নারদ ঋষি আসিয়া যদি আশ্রমে আমার সাক্ষাৎ না পান, তবে একটা বিভ্রাটও ঘটিতে পারে; সেই জন্যই আমি তাড়াতাড়ি চলিলাম। পরে যখন আমি তোমাকে সংবাদ দিব, তখন তুমি আমার আশ্রমে যাইও; সেখানে বসিয়া সকল কথা তোমাকে জানাইব এবং এই

সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিব।” রমণী যে-আজ্ঞা বলিয়া যোগীর পদপ্রান্তে পড়িয়া প্রণিপাত করিল। যোগী যাইবার সময় রমণীকে কেবল নিম্নস্থ এই বাক্য কয়েকটী গম্ভীরস্বরে বলিয়া গেলেন—

“ধরা, জরা, জ্যান্তে মরা আছে ত মা তিন ?
ভুলো না তাদের তুমি কভু কোন দিন ;
করিবে কর্ত্তব্য কাজ হয়ে এক মন,
পাইবে বাঞ্ছিত বস্তু যা তব মনন।”

কথা কয়েকটী রমণীর ত রাত দিনই জপমালা হইল ; পাঠকেরও কিন্তু বেশ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত।

চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা

বা

যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব।

(স্বর্গপর্ব্ব)

প্রথম অধ্যায়।

স্বর্গদ্বারে।

"এতন্নানাবতারানাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাং শাংসেন সৃজ্যন্তে দেবতর্য্যোঙ্নরাদয়ঃ॥"

মায়াময়ের কিবা মায়া! নিজের যদুবংশ নিজেই ধ্বংস করিলেন। পরে আপন দেহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই যে মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িয়াছেন—সেই যে স্বধাম স্বর্গধামে আসিয়াছেন, আর যেন তাঁহার কোন উদ্দেশই নাই—আর যেন মর্ত্ত্যের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই! ভাল, ভগবান যেন অন্তর্দ্ধান—অন্য দেবগণও বা কই দৃশ্যমান? সকলেই যেন সেই নীরদবরণ নারায়ণের ন্যায় নিতান্ত নির্লিপ্ত ও ও নিশ্চিন্ত! এ অচিন্ত্য ব্যাপার বুঝেই বা কে? তবে কি পৃথিবীর প্রতি দেবদৃষ্টি আর নাই?

আঃ! ছি, ছি—ও কথা কি বলে? অবোধ আমরা—অন্ধ আমরা! তাই আমরা দেবদর্শন পাই না,—দেবতার অস্তিত্ব বুঝি না। এই যে, দেখ, দেখ! দশদিকে দেখ! দশদিকেই দেবদৃষ্টি—সকল স্থলেই সুধাবৃষ্টি! কলিকালেও কৃপা কটাক্ষ—বিশ্বের ভাবেও বিশেষ লক্ষ্য! সর্ব্বদেবতারই বসুমতীর প্রতি অতি যত্ন! যাহার জন্য

জগন্নাথ যুগে যুগে জলমগ্নের যাতনাও তুচ্ছ করিয়াছিলেন—যাহার ভূভার হরিবার তরে বারবার তাঁহার অবতার রূপেও আসিতে হইয়াছিল—যাহার জন্য যুগযুগান্তরে তিনি অনেকবার অনেক ক্লেশ অক্লেশে ভোগ করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, সেই পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিতে কি তিনি পারেন? দ্বাপরের শেষে তাঁহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠধামে গিয়াছেন বলিয়া কি, কলির মধ্যভাগে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যধাম মর্ত্ত্য-ধামের মায়া মন হইতে দূর করিতে পারেন? তবে কলিযুগে অন্য যুগের মত বরপ্রাপ্ত দানব দৈত্য নাই—সুরাসুরবিজয়ী অজেয় যোদ্ধা নাই—তাই আর তাঁহার বারম্বার মর্ত্ত্যে গতায়াতও নাই!

যদিও ভগবান স্বয়ংই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ আমি (ঈশ্বর) সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিবার জন্য এবং ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি; কিন্তু কলিযুগে সাধুকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে কষ্ট পাইয়া আর দেখা দিবার দরকার করে না; কারণ কলির জীবের মুক্তি সর্ব্বযুগাপেক্ষা সহজ উপায়েই হয়, সে উপায় সকলে সময়মতে পরে এই গ্রন্থ পাঠেই জানিতে পারিবেন। আর দুষ্কৃত অর্থাৎ পাষণ্ডকে দণ্ড দিবার বা বিনাশ করিবার ভার যমরাজা ও চিত্র-গুপ্তের প্রতি অর্পিত হইয়াছে; ইহার জন্য এ যুগে তাঁহার বারম্বার যাতায়াতের আবশ্যক নাই। আবার এই যুগে ধর্ম্মকে রক্ষা করাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; কারণ কলিযুগ শেষযুগ, এই ধ্বংসের যুগে সকলই একাকার ধর্ম্মহীন হইয়া ধ্বংস হইবে—ইহাই তাঁহার অভি-প্রায়! কলির প্রথমে ধর্ম্মের এক পদ মাত্র ছিল, এখন মধ্যভাগে তাহাও খোঁড়া হইয়া গিয়াছে; শেষে সেখানিও একেবারে খসিয়া পড়িবে! সুতরাং ধর্ম্ম একেবারে নিশ্চল হইয়া যাইবে এবং অধর্ম্মের ভারে বসুমতী অস্থির হইয়া পড়িবে। ভগবান সেই সময়ে কলির

শেষে কেবল একবার মাত্র অবতাররূপে মর্ত্ত্যে শেষ দেখা দিয়া কলির সমস্তই সমাপ্ত করিবেন; তাই বলি, ধ্বংসই যখন উদ্দেশ্য, তখন ধাতার আর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য জগতে আসারও আবশ্যক নাই! তাই এত নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত! কলির আগমনে নিজে সমস্ত দেবগণকে লইয়া নিশ্চিন্তে স্বর্গবাস করিতেছেন। মর্ত্তে যা করেন যম! জগতে যেন যমরাজেরই রাজত্ব—চিত্রগুপ্তেরই একাধিপত্য—যমদূতেরই সর্ব্বত্র প্রভুত্ব! যদিও পৃথিবীর প্রতি পদার্থেই পরমেশ্বর প্রকাশ-মান—যাবতীয় বস্তুতেই বিধাতা বিদ্যমান, তবু তিনি ইচ্ছা করিয়াই আত্মগোপন পূর্ব্বক এই খেলা খেলিতেছেন। এখন ভগবান অনন্ত-দেব নিশ্চিন্তে অনন্তশয্যায় শয়ান—পরমা প্রকৃতিও প্রভুর পদপ্রান্তে নিশ্চিন্তে অচিন্ত্যের চিন্তায় নিমগ্না! অন্যান্য দেবগণও দিব্য আরামে অমরাবতীর অতুল সুখ উপভোগ করিতেছেন।

দেবগণের এত আরাম—এত সুখ বুঝি সহিল না! সহসা কেমন একটী কণ্টক কয়দিন ধরিয়া তাঁহাদের আরামের পথে বাধা জন্মা-ইতেছে। স্বর্গদ্বারের দিক হইতে দিবানিশি যেন একটী নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি ও সকরুণ চীৎকার শব্দ আসিতেছে! সেই ভয়ানক শব্দে স্বর্গধাম যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে বোধ হয়! কোন দেবতারই আর সেই শব্দে সুখ নাই—স্বস্তি নাই, আরাম নাই—বিরাম নাই; কেবল সেই যোগময় জগদীশ যুগলরূপে যোগনিদ্রায় অনন্তশয্যায়! দেবতা-দিগের কিন্তু মহাদায়! সেই কাতরকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি ও ভয়া-নক চীৎকারে দেবগণ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ইন্দ্রালয়ে ইন্দ্রের নিকট আসিয়া কহিলেন "রাজন্! আপনার উপর যখন স্বর্গের সমু-দায় ভার, তখন স্বর্গদ্বারের দিকের এই অবিরাম চীৎকারের সংবাদ কিছু রাখেন কি?" ইন্দ্র কহিলেন "কি জানি কিসের চীৎকার? এখন আর কে কার? যা ঘটে ঘটুক—আমরা আরাম-সুখ ভোগ করি"।

দেবগণ। বটে, সে ত মর্ত্ত্যের পক্ষে! স্বর্গের জন্য ত আর নয়? আর এরূপ চীৎকারে আরাম-সুখ কি পাওয়া যায়?

ইন্দ্র। কলিকালের এতকাল ত কিছুই ছিল না; এখন এ আবার কি? তবে চলুন, সকলে একত্রে যাই।

দেবগণ "তবে চলুন" বলিয়া সকলে মিলিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্বর্গ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, কোথায়ও কিছু নাই—কেবল একজন মুনি গোঁসাই!

তাঁহারা গোঁসাইকে দেখিয়া হাসিয়াই সারা! বলিলেন "বলি, এ আবার তোমার কি মায়াকান্না? এমন যুগে আমরা একটু আরাম করি, তাও কি তোমার প্রাণে সহিল না?"

মুনি। কেন সহিবে? আপনাদের উপর যখন জগতের অনেক ভার রহিয়াছে, তখন আপনারা আরাম-সুখ ভোগ করিলে চলিবে কেন?

দেবগণ। আমাদের উপর আবার কি ভার? সকল ভার সেই যম-রাজার, হাজার মাথা কুটিয়া মরিলেও এখন আমাদিগকে কেহ পাইবে না।

মুনি। শুধু সংহারের ভার যমরাজার, আর বিচারের ভার চিত্র-গুপ্তের উপর; অন্য ভার সকলই আপনাদের উপর আছে; কিন্তু কেহই কিছু দেখেন না; যমরাজ বা চিত্রগুপ্তেরই ন্যায় অন্যায় কিছু দেখেন কি? আর বরুণ দেবকে দিয়াই বলি, তিনি কেবল নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছেন না কি? মর্ত্ত্যে জলের দরকার, কিন্তু বরুণদেব দিব্য আরামে, দেবধামে বসিয়া আছেন! আবার যখন জলাভাব নাই, তখনও অজস্রধারে বর্ষণ! কেবল পবনদেবই আপন কর্ত্তব্য একরূপ পালন করিতেছেন। এ সকল কি উচিত?

দেবগণ। ভাল, এটা কোন্ যুগ তা জান? আমাদের দোষ কিছুই নাই—সকলি যুগধর্ম্ম জানিবে। তোমার চিরদিনই সমান গেল! তা বলিয়া আমাদের ত আর নয়! তোমার তিন যুগেও যেমন দৌড়াদৌড়ি—এযুগে দেখি আরও বাড়াবাড়ি! হুড়োহুড়ি

দেখিলেও ছাড়াছাড়ি নাই—তাড়াতাড়ি সর্ব্বত্রই যাতায়াত কর। কেন বলদেখি? তোমার কি একটু বিরাম নাই? তা, নাই থাকিল, আমরা আরাম করিব—তাহাতেও তুমি প্রতিবাদী!

মুনি "যাহা ইচ্ছা হয় করুন—কিন্তু ঐ দেখুন!" এই বলিয়া বৈতরণীর পরপারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন—একটী প্রাচীনা রমণী! তাহার অস্থিচর্ম্মসার—দেহই যেন দারুণ ভার—জরাজীর্ণ শীর্ণ কলেবর! আহা! বৃদ্ধার শুভ্রবর্ণ পক্ককেশগুচ্ছ ধরিয়া এক দৈত্যরূপী দীর্ঘাকার পুরুষ টানাটানী করিতেছে ও সেই শীর্ণ শরীরে শাণিত অস্ত্রাঘাত করিবার উপক্রম করিতেছে। তাই কামিনী কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে! সেই শব্দ বৈতরণীর বারি-রাশীর মধ্য দিয়া আসিয়া সমগ্র স্বর্গধাম যেন কাঁপাইয়া দিতেছে! দেবগণ দেখিয়াই ত নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ! মুনি কহিলেন "আপনারা চিনিতে পারেন কি—কে অই কামিনী কাতরে ক্রন্দন করিতেছে আর কেই বা অই দুর্দ্দান্ত দৈত্য কেশাকর্ষণে কামিনীর কণ্ঠাগতপ্রাণ করিয়া তুলিতেছে?" দেবগণ নিরুত্তর হইয়া একদৃষ্টে পরপারের দিকে চাহিয়া আছেন আর কেবল মনে মনে ভাবিতেছেন—কি সর্ব্বনাশ! কি অত্যাচার! কে অই বুড়ী—আর কেই বা অই নষ্টের ধাড়ী—ইহার যে বড় বাড়াবাড়ি! চুলের মুটী ধরিয়া আবার অস্ত্রা-ঘাতেও উদ্যত?

ইহারা যাহারাই হউক, পাঠক! পার কি বলিতে—কে এই মুনি গোঁসাই? আর কেনই বা দাঁড়াইয়ে বৈতরণীর এই ধারে—

স্বর্গদ্বারে!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কুঁদুলে ঠাকুর!

বলিতে পারিবে বুঝিয়াছি—বলিবে বলিবে করিতেছ, তাহাও বুঝিয়াছি; মুনির নাম মুখে আসিয়াছে, কিন্তু সহসা সাহস করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেছ না; কেন বল দেখি? বিবাদ বিসম্বাদ বাধিবে বলিয়াই কি এত ভয়? আহা! যে নামে পাপীর পাপ দূরে যায়—যে নামে মানুষ মুক্তি মোক্ষ পায়—যে নামে ভবধামে ভক্তিতত্ত্ব শিখায়—যে নাম সেই সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্বকার্য্যে সহায়; হায় হায়! সে নাম করিতে কি ভয় পায়? সেই হরির হৃদয় আলোকরা—ভগবদ্ভক্তি-ভরা—প্রেমপীযূষ-পোরা, মধুময় নামটি যে—নারদ! এই মুনি গোঁসাই যে সেই মহর্ষি নারদ—এ নামে কি ঘটে বিরোধ?—হায় রে অবোধ! দেখিতে পাই, লোকালয়ে কলহক্ষেত্রে বেশী বিবাদ বাধিবে বলিয়া বালকবৃন্দও নারদ নারদ নাম করিয়া নৃত্য করে; আবার ধর্ম্ম কথা কহিবার কালে নারদ নামের বদলে বহুতর বামা বিবাদের ভয়ে বলিয়া ফেলে—কুঁদুলে ঠাকুর! বালক স্ত্রীলোক বা অজ্ঞ লোক এ সকল কথা কোথায় পাইল? বোধ হয় যাত্রাদির অভিনেতার বক্তৃতায়—কথক ঠাকুরের মুখভঙ্গিতে নারদ নামের নানা অর্থ করিয়াই এই সকল বিকৃত ভাব ভাবিয়াছে। আবার অনেকে অন্তরে সাত্ত্বিক ভাব থাকিলেও বাহিরে তামসিকভাবে আমোদের জন্য নারদ নামের দুর্নাম করে। সত্য বটে, সত্যভামার সাধের অভিমানে পারিজাত-হরণের হুলস্থূল ব্যাপার—দক্ষযজ্ঞে দক্ষ-দুহিতার দেহত্যাগে দক্ষস্কন্ধে ছাগমুণ্ডের বাহার—উষার অস্বাভাবিক প্রেমের স্বপনে বাণরাজার ভয়ঙ্কর সমর প্রভৃতি বহুতর বিবাদ বিসম্বাদাদি নারদের চক্রান্তে ঘটিয়াছিল; কিন্তু এ চক্রান্তের অন্ত কে পায়? এই সকল প্রলয়কাণ্ডে জগতের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা জান কি? কোথায়ও স্বর্গীয় প্রেমের মধুময় সম্মিলন—কোথায়ও ভক্তি-ভিক্ষুক দীনজন প্রতিপালন; কোথায়ও পুণ্যময় পুরুষের পরিত্রাণ—কোথায়ও প্রচণ্ড পাষণ্ডের দণ্ডবিধান; কোথায়ও সংসার-শত্রুর সংহার—কোথায়ও অমূল্য নাম হরিনাম প্রচার; কোথায়ও দারুণ দাম্ভিকের দর্প চূর্ণ—কোথায়ও বিবাগী বিরাগীর বাসনাপূর্ণ! এইরূপ সম্পূর্ণভাবেই

ভগবানের একমাত্র সহায়—নারদ! ত্রিভুবনে ভগবান যত কার্য্য করিয়াছেন, সকল বিষয়েই একমাত্র উত্তরসাধক—নারদ! জগতের যেখানে যে গোলযোগ ঘটিয়াছে, সেখানেই বিরোধ বা উপরোধে, কলে বা কৌশলে, তাহা দূর করিয়াছেন—নারদ! বিশ্বহিতব্রত সাধনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছেন—নারদ! জান না কি তাঁর জন্মকথা?

কতকগুলি বেদবিৎ ব্রাহ্মণের এক দাসীর গর্ভেই যে নারদের জন্ম হয়। ব্রহ্মণ-সেবাই তাঁহার বাল্যব্রত ছিল; ব্রাহ্মণের ভিক্ষালব্ধ যৎসামান্য উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিয়াই তিনি কৃতার্থ হইতেন; ব্রাহ্মণবর্গের বেদগান ও হরিগুণ গান প্রত্যহ শুনিয়া নারদের নারায়ণের প্রতি অনুরাগ ক্রমশই জন্মাইতে লাগিল। পরে সেই মহাপুরুষগণ দূরদেশগমন সময়ে নারদকে অতি গোপনীয় দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান দান করিয়া গিয়াছিলেন; সেই জ্ঞানবলেই নারদ নারায়ণের মায়া জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই মায়াময়ের মায়া বুঝিতে পারিলেই জীব সাক্ষাৎ পরমেশপদ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সেই পঞ্চম বর্ষ বয়সেই নারদ নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরে আসক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জননীর জন্য তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না। তাঁহার মাতা সেই একমাত্র পুত্রকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন—চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। এইরূপ পরাধীন বা স্নেহাধীনে থাকাও নারদের ভাল লাগিত না, তিনি ভগবানকে জননীর স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নিয়ত প্রার্থনা করিতেন। ভগবানও সদয় হইলেন; কালক্রমে একদিন গো-দোহনার্থ নারদ-জননী যেমন বাহিরে যাইবেন, অমনি এক বিষধর সর্পের গাত্রে পদসংলগ্ন হইল; সর্পও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তীব্ররূপে দংশন করিল এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল!

নারদ তাহাতেও অণুমাত্র দুঃখিত হইলেন না; বরং স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া যদৃচ্ছা যাইতে লাগিলেন। দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া এক বনমধ্যে ভয়বিহ্বলচিত্তে ভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলেন; অমনি প্রেমভক্তিতে তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল! ভক্তবৎসল ভগবান ধীরে ধীরে এই সময়ে নারদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। সেই সর্ব্বসন্তাপহারী ভগবানের অনুপমরূপ হৃদয়ে দেখিয়া নারদের সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল; পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া পরমাত্মাকে আর আপনা হইতে পৃথক বোধ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিদ্যুৎ বিকাশবৎ বনমালীর অপরূপ-রূপ নিমেষ

পরেই নারদ-হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল! তখন নারদ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলেন—কিছুতেই সেই জ্যোতির্ম্ময়-রূপ আর তাঁহার হৃদয়-মাঝে উদয় হয় না। কতকাল এইরূপ অধীরভাবে অতিবাহিত হইলে নারদের মৃত্যুকাল আসিল; তখন তিনি তাঁহার সেই দাসীপুত্ররূপ ঘৃণিত-জীবন পরিত্যাগ করিলেন এবং ঈশ্বরের নিশ্বাসের সহিত তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে পুনরায় নূতন জগৎ-সৃষ্টির সময়ে ভগবান অনন্তশয্যা হইতে উত্থান করিয়া ইন্দ্রিয় হইতে মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদিগের সহিত নারদকেও সৃষ্টি করিলেন। শুনিলে কি শুকদেব কথিত নারদের জন্মকথা? এই মহাপুরুষকে কি বলিতে আছে—কুঁদুলে ঠাকুর।

আবার তিনি ত্রিভুবনের ভিতর বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই ভ্রমণ করেন বলিয়া তাঁহার আর এক তামসিক নাম—ভবঘুরে! তাহারও কারণ আছে; প্রথমে যখন জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন পৃথিবী এত প্রজাসমাকুল বা লোক ভারাক্রান্ত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে এক এক মহাপুরুষের দ্বারাই ভগবান নানা দেশে নানাবিধ প্রজাসৃষ্টি করাইতে লাগিলেন। প্রজাপতি দক্ষ জগতের যে দিকে প্রজাসৃষ্টি করিতেছিলেন, সেই দিক লোকাকীর্ণ হইলে অনেক অমঙ্গল ঘটনা ঘটিবে বলিয়া নারদ তাহাতে বিশেষ বাধা দিয়াছিলেন; সেই জন্যই দক্ষ ক্রোধান্ধ হইয়া নারদকে এই বলিয়া শাপ দেন যে—"তুই ত্রিজগতে সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিবি, কিন্তু কোথায়ও স্থান পাইবি না"। ক্ষমাশীল সাধু নারদ হাসিতে হাসিতেই সেই শাপ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; সেই অবধি তিনি অবিরামে অবিশ্রামে অনিবার ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন—তাই তিনি ভবঘুরে! কেবল অনর্থকই যে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, তাহা নহে; বিশ্বের মঙ্গলচিন্তা ও ত্রিজগতের উপকারের জন্যই তিনি দিবারাত্রি পরিভ্রমণ করেন। কখনও সদয়—কখনও নির্দ্দয়; কখনও নির্ভয়—কখনও সভয়; কখনও ক্ষমাশীল—কখনও দুর্জ্জন, এইরূপ যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ ভাবেই ভগবানের লীলা প্রচার করেন! পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুবের কঠোর সাধনা দেখিয়া সদয়ভাবেই তাহাকে দীক্ষাদানপূর্ব্বক তাহার আরাধনার ধন পদ্মপলাশলোচনকে দেখাইয়া দেন; আবার নহুষকে নিস্তারের জন্য নির্দ্দয়ভাবেই নারদ নরমেধ যজ্ঞে যযাতিকে ব্রতী করেন! দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর তপস্যাকালে দেবেন্দ্র ইন্দ্র যখন গর্ভবতী দৈত্যরাজপত্নী কয়াধুকে বিনাশার্থ লইয়া গিয়াছিলেন, তখন নারদ সেই গর্ভে পরম হরিভক্ত সন্তান

আছে বলিয়া নির্ভয়েই ইন্দ্রের নিকট হইতে কয়াধুকে ভিক্ষা লইয়া দৈত্য-কুল উদ্ধার করেন; আবার কতবার দুর্ব্বার দৈত্যবংশ বিনাশের জন্য সভয়েই কত চক্রান্ত করিয়াছেন! ক্ষমাশীলতাগুণেই কতস্থানে কত দুর্ব্বাক্য নারদ অঙ্গের আভরণ করিয়াছেন; আবার দুর্জ্জন হইয়াই কতজনকে কোপাগ্নিতে ভস্মীভূতও করিয়াছেন; কিন্তু সকলই মঙ্গলের জন্য! বিশ্বের হিতকামনাই তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য! এই দেখ—স্বচক্ষেই দেখ! এই বিপদ বিজড়িত বৃদ্ধার উদ্ধার সাধনের জন্য একচক্ষে কেমন অই দৈত্যরূপী পুরুষের দিকে ভীম ভ্রূকুটী করিতেছেন! আবার অন্য চক্ষে অই প্রাচীনাকে কেমন সাহস দিতেছেন! বৃদ্ধার বিপদ জানিয়াই তিনি পূর্ব্ব হইতে স্বর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে স্বীয় দেবদত্ত বীণায় মূর্চ্ছনা দিয়া তাহাতে সুররূপ ব্রহ্ম সংযোগ করিয়া সুমধুরস্বরে সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন——

ভক্তির ভিখারী মুক্তির নিদান,
ভয় বিঘ্নহারী জয় ভগবান!
কর অবিরাম সুখ মোক্ষধাম,
সেই হরি নাম, খুলে মন প্রাণ!
নামেরি তুলনা নাহিক তুলনা,
ভুলোনা ভুলোনা, কর নাম গান!
মধুর মধুর চির সুমধুর
হরিবোল সুর, ধর সেই তান!
হরিবোল ব'লে এস বাহু তুলে,
পাপ যাবে চ'লে, পা'বে পরিত্রাণ!
হেন নাম-বল অনলেতে জল,
পড়ে অবিরল, গলেগো পাষাণ!
অকূল পাথার এই পারাবার,
কেন ভাব আর, হইয়ে অজ্ঞান!
কৃপা চক্ষে হেরি কৃপাময় হরি,
তরাবেন তরি, তরঙ্গ তুফান!

কি ভয় কি ভয় হইবে নির্ভয়,
জয় দয়াময় কর ধ্যান জ্ঞান।

এই বিশুদ্ধ সঙ্গীতের শব্দ স্বয়ং বাসুদেবের নিস্তব্ধ অনন্তশয্যা কাঁপাইয়া নিদ্রিত হরির হৃদয়ে গিয়াও আঘাত করিল। নারদের নিকটস্থ দেবগণও সঙ্গীতের শব্দে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এখনও কি বিশ্বাস হয়, নারদ—

কুঁদুলে ঠাকুর!

তৃতীয় অধ্যায়।

উদ্বোধন।

এ জগতে সঙ্গীতে মুগ্ধ না হয় কে? সঙ্গীতের মত সঙ্গীত শুনিলে সংসারে সবাই সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হয়—সঙ্গীতে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায়—সঙ্গীতে পুত্র শোক ভুলা যায়—সঙ্গীতে সংসার যাতনা শান্তি হয়—সঙ্গীতে আত্মহারা হইতে হয়! সামান্য ঘুম পাড়ানি সঙ্গীতে চঞ্চল শিশুও স্থির হইয়া ঘুমায়! সঙ্গীতে বালক ভুলে—যুবক ভুলে—বৃদ্ধ ভুলে; সঙ্গীতে বালিকা সদানন্দময়ী—যুবতী বিচ্ছেদ-বিজয়ী—প্রৌঢ়া প্রেমপাগলিনী—বৃদ্ধা ধর্ম্মসোহাগিনী! সঙ্গীতে স্তম্ভিত পশুপাখী—সঙ্গীতে নিস্তব্ধ লতাশাখী—সঙ্গীতে ভুলিতে কেবা বাকী? সঙ্গীতে যে স্বপ্নময় আবেশ আছে, সেই আবেশে দেহের বাঁধন শিথিল হয়—প্রাণের বাঁধন সুদৃঢ় হয়—সংসার স্বজন ভুলিতে হয়—আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়! মহাদেবের মহারাগিণীতে মহাবিষ্ণুপদে মহাঘর্ম্ম হইয়া মহানদী মন্দাকিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল—নন্দের বাধা বহনকারী গোবর্দ্ধনধারীর রাধানাম সাধা বাঁশীর সঙ্গীতে সমগ্র গোকুল আকুল হইয়াছিল—কালবরণ কালবারণের কালবাঁশীর গানে কাল যমুনার কাল জল স্রোতও কালে উজান বহিয়াছিল—বালক ধ্রুব প্রহ্লাদের হৃদয়োন্মাদকারী হরিগুণগানে আপনি হরিও আপনা হারা হইয়া পড়িয়াছিলেন—নিতাই চৈতন্যের সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনের সুধাস্রোত সমগ্র নদীয়া ভাসাইয়া শেষে সমস্ত সংসার পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিয়াছিল—সাধক প্রধান রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতে স্বয়ং মহামায়া মায়াবিনী মেয়ে হয়েও তাঁহার বেড়া বাঁধিবার সহায় রূপে

দেখা দিয়াছিলেন—কোন প্রসিদ্ধ চণ্ডী উপাসকের প্রচণ্ড চণ্ডীর গানে গঙ্গাতীরস্থ কোন দেবী-মন্দিরের দ্বারও একদিক হইতে অন্যদিকে ফিরিতে দেখা গিয়াছিল—নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন নিধুবাবুর পার্থিব প্রেমসঙ্গীতেও এক দিন সেই প্রেমময় পরম পুরুষের স্বর্গীয় প্রেমের জ্বলন্ত জ্যোতি দীপ্তি পাইয়াছিল—তানসানের সুমধুর তানে বিমোহিত হইয়া জলপাত্র ভ্রমে কোন রমণীমণি তাহার নয়নমণি যাদুমণির গলেও রজ্জু বাঁধিয়া তাহাকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল; তাইবলি সঙ্গীতে সবাই বিমুগ্ধ! যাহার গদ্যময় জীবন সংসার নিগড়ে দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ, যাহার হৃদয় নিতান্ত কবিত্বশূন্য—কল্পনাশূন্য—প্রেম-শূন্য, যাহার অন্তর নিরন্তর নীরস বিষয়ে নিমগ্ন, কল্পনার স্বপ্নময় মোহময় স্বর্গীয় ভাব যে কখন অনুভব করে নাই, যাহার শুষ্ক চক্ষুতে কখন বিন্দুমাত্র বারিও দেখা যায় নাই, তাহারও মানস-মরু মধুর সঙ্গীতে আর্দ্র হয়।

শুনিয়াছি সঙ্গীতে কোথায়ও আগুণ উঠিত—কোথায়ও বারিবর্ষণ হইত; সঙ্গীতে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত—সঙ্গীতে পাষাণও দ্রবীভূত হইত! সঙ্গীতে দুর্বৃত্ত দস্যু জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল—সঙ্গীতে জনৈক যবন যুবক পরম বৈষ্ণব হরিদাস হইয়াছিল! সঙ্গীতে সকলি সম্ভবে। নারদের হৃদয়-বিদারক সঙ্গীতে বৃদ্ধার গগন-বিদারক রোদনের রোল রুদ্ধ হইয়া গেল! দুর্বৃত্ত পাষণ্ডেরও—

হরি বোল ব'লে এস বাহু তুলে
পাপ যাবে চ'লে পা'বে পরিত্রাণ!

শুনিতে শুনিতে মোহাবেশে শিথিল শরীর হইল—সেই ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তিও কেমন বিনম্রভাব ধারণ করিল! বৃদ্ধার পক্ককেশে দৃঢ়বদ্ধ বজ্রমুষ্টি খুলিয়া গেল—শাণিত অস্ত্র ভূতলে পড়িল! আবার—

হেন নাম-বল অনলেতে জল
পড়ে অবিরল, গলে গো পাষাণ!

শুনিবা মাত্রই সেই দুর্বৃত্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল! কোথায় গেল—কিরূপে অদৃশ্য হইল—সেই মায়াবী মূর্ত্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় মিশাইল? কিছুই ঠিক হইল না; যেন ঐন্দ্রজালিকের বিষম ভোজবাজী!

তাহার পর রমণী দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া যেমন শুনিল—

অকূল পাথার, এই পারাবার,
কেন ভাব আর, হইয়ে অজ্ঞান !

অমনি বৈতরণীর বিস্তৃত বারিরাশির উপর স্বীয় তনু-তরণী ভাসাইল এবং—

কৃপাচক্ষে হেরি কৃপাময় হরি
তরাবেন তরি, তরঙ্গ তুফান !

শুনিতে শুনিতে ধীরে ধীরে এই ধারে স্বর্গদ্বারে অকাতরে উঠিল ও শুনিল—

কি ভয় কি ভয় হইবে নির্ভয়
জয় দয়াময় কর ধ্যান জ্ঞান !

রমণীও অমনি "জয় দয়াময়" বলিয়া নারদ এবং অন্যান্য দেবগণের চরণ-প্রান্তে পড়িয়া প্রণাম করিল। দেবগণ কহিলেন, "কে মা তুমি? আর কেনই বা ওরূপ ঘোর বিপদে পড়িয়া অবিরল রোদন করিতেছিলে?" বৃদ্ধা বিনীতভাবে কহিল, "এ অধিনী আপনাদের সেই চিরপ্রতিপালিতা বসু-মতী।" দেবগণ চমকিত হইয়া কহিলেন, "সে কি? তোমার এত কষ্ট? কে অই দুর্বৃত্ত, তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া বক্ষে শাণিত অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হইয়াছিল?" বসুমতী অতি ধীরে ধীরে কহিল "অই দুর্বৃত্ত কলির প্রধান অমাত্য সেই পাপ! কলির চিরসহচর সেই মূর্ত্তিমান পাপ! পাপের তেজে এই জরাজীর্ণ দেহ আরও জর জর! শীর্ণ শরীর নিতান্তই অবসন্ন! সেই দুঃসহ তেজ শেষে সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে স্বর্গদ্বারে ছুটিয়া আসিয়াছি। দেবগণসমীপে দুঃখকাহিনী বর্ণন করিতে আসিতেছি জানিতে পারিয়া সন্ধানে সন্ধানে অই পাষণ্ড পাপপুরুষ পরপারে নদীর ধার পর্য্যন্তও আসিয়াছিল এবং আমাকে ফিরাইবার জন্য কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অস্ত্রাঘাত করিতেও উদ্যত হইতেছিল; কিন্তু ত্রিজগতের চিরোপকারী প্রভু নারদ না দেখিলে নিস্তার থাকিত' না। প্রভুর পরমার্থিক পরাক্রমে পাপ পুরুষ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল; কেমন করিয়া পলাইল, কোথায় গমন করিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেবর্ষির দেবদুর্ল্লভ সঙ্গীতের সুরবে বৈতরণীর কল কল নাদও নিস্তব্ধ হইয়া গেল; পরে রাগালাপের সময় যেন অনন্ত

জ্যোতি তাঁহার সর্ব্বশরীর হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল; সেই জ্যোতি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া যেন সেই পাপপুরুষের পাষাণ প্রাণও পুড়াইতে লাগিল; সেই তেজে সে যে কোথায় অদৃশ্য হইল, তাহা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি কিন্তু পরিত্রাণ পাইয়া সেই প্রচণ্ড তেজের পরিবর্ত্তে দেখিলাম—দিব্য সুস্নিগ্ধ শশীকরোজ্জ্বল বিভা! সেই সর্ব্বসন্তাপহারী সুশীতল উজ্জ্বল আলোকসহায়ে সাহস পাইয়াই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে স্বর্গদ্বারে আসিয়াছি। এক্ষণে এখানেই সাক্ষাৎ পাইয়া আপনাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছি;—আমাকে হয় এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন, নয় শীঘ্রই ধ্বংস করিয়া ফেলুন। দুর্ব্বহ পাপের ভার আর আমার সহ্য হয় না।"

দেবগণ সমধিক বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, "তাই ত, পাপের এত অত্যাচার? ইহার প্রতিবিধান কি উপায়েই বা হয়?" নারদ মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন, "কেমন, এখন একটু চৈতন্য হইল কি? যমরাজা ও চিত্রগুপ্তের প্রতি মর্ত্ত্যের সকল ভার দিয়া সকলেরই একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত কি? যাহা হউক এক্ষণে উপায় কি?" দেবগণ কহিলেন, "উপায়ের জন্য চিন্তা কি? সেই নিরুপায়ের উপায় নারায়ণের নিকট গোলোকধামে গমন করিলেই সকল উপায় হইবে।" নারদ কহিলেন, "তাহা কি সম্ভব? বৈকুণ্ঠে সেই পরমব্রহ্মের নিকট ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মকাণ্ডের কোন সম্বন্ধই নাই! সেই নির্গুণ নির্ব্বিকার নিত্যপুরুষের নিকট নিরর্থক গিয়া কোন ফল দর্শিবে না। বরং অনন্ত-শয্যাশায়ী অনন্তদেব মহাবিষ্ণু সমীপে বসুমতীর দুঃখকাহিনী বর্ণন করা যাউক।" দেবগণ সহাস্যে কহিলেন, "নারদ! তোমার কি ভ্রমান্ধকার এখনও ঘুচে নাই? বৈকুণ্ঠনাথ আর অনন্তদেব কি পৃথক?" নারদ উত্তর করিলেন, "পৃথক না হইলেও পৃথকভাব বোধ করিয়া লইতে হয়; নতুবা কার্য্যোদ্ধার হয় কৈ? আমরা যেখানে কার্য্য পাইব, সেইখানে যাইব; সেইজন্যই নিষ্কাম হরি ছাড়িয়া কর্ম্মময় হরির নিকট সমুদ্রতীরেই যাওয়া উচিত।" দেবগণ পুনরায় কহিলেন, "সেই সচ্চিদানন্দ মহাবিষ্ণুর আরাম-নিদ্রা ভাঙ্গিবে কি? নারদ বলিলেন, "কেন ভাঙ্গিবে না? ইহা ত আর সেই কল্পান্তকালের অনন্ত নিদ্রা নহে? মায়ানিদ্রা মাত্র! আরও তিনি ত ভক্তবৎসল, ভক্তের সম্ভাষণ শুনিতেই হইবে; চিন্তামণির নিকট সে চিন্তা কিছুই নাই! এক্ষণে আপনারা বসুমতীকে লইয়া সকলেই সমুদ্রতীরে চলুন; আপনাদের চিরানুগত নারদও অনুসরণ করিতেছে।"

তখন দেবগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া সকলে মিলিয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রতীরে গমন-পূর্ব্বক মহাবিষ্ণুরই উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন——

অনন্ত অনন্তকাল অনন্ত জলধি,
অনন্ত মহিমা যাঁর গায় নিরবধি!
অনন্ত তরঙ্গতানে যাঁর সুধানাম,
অনন্ত ওঙ্কাররবে গায় অবিরাম!

অনন্ত বাসুকী বক্ষে অনন্ত নাগিনী
বিস্তারি অনন্ত-ফণা দিবস যামিনী
যাঁহার অনন্তশয্যা রাখিয়া মাথায়,
মৃদুল দোলনে দিব্য আরামে দোলায়!

সে দোলনে সে আরামে সেই সে শয্যায়,
মায়া করি মগ্ন যিনি মায়ার নিদ্রায়!
নীলানন্ত জলে যাঁর নীলানন্ত কায়,
নীলে নীল মিশামিশি কেমন মানায়!

অনন্ত অনন্তকোটী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
অনন্ত চন্দ্রমাতারা মার্ত্তণ্ড প্রকাণ্ড!
প্রতি লোমকূপে যাঁর প্রকাশিত রয়,
কটাক্ষে সৃজন যাঁর কটাক্ষে প্রলয়!

ক্ষীরোদ সম্ভবা দেবী ক্ষীরোদ শয়নে,
দিবানিশি যাঁর পদ সেবেন যতনে!
দেবতা দুর্ল্লভ ধন যে রাঙ্গাচরণ,
মুক্তি মোক্ষ শান্তি যাঁর সদা বিতরণ!

অপ্সর কিন্নর নর যক্ষ রক্ষ জন,
জগতের যত জাতি আছে অগণন!
করিয়ে কঠোর তপ অসাধ্য সাধন,
কেহ কভু যাঁর পদ না পায় দর্শন!

অনাহারে বাতাহারে ঋষি বনবাসী,
জটায় জড়িত কেশ অঙ্গে মাটিরাশী!
জপি তপি জন্মাবধি যুগ যুগান্তরে,
অন্ত যাঁর নাহি পান আপন অন্তরে!

সেই মহাবিষ্ণু পদে করি নমস্কার,
অগতির গতি তিনি বিশ্বের মাঝার!
গভীর ওঙ্কাররবে হুঙ্কারে হিল্লোল,
ওঁ নমঃ ওঁ নমঃ শব্দে উঠুক সে রোল!

বচন অতীত তিনি পুরুষ চিন্ময়,
স্তবস্তুতি কিবা তাঁর, তিনি দয়াময়!
'জয় দয়াময়' গান অমূল্য রতন,
গাইছে সঘনে সদা এ তিন ভুবন!

সেই স্বরে সমস্বরে মিশাইয়া স্বর,
সেই দয়াময় নাম ভাবি নিরন্তর!
আমরাও সবে মিলি খুলিয়া হৃদয়,
করিব কীর্ত্তন আজি 'জয় দয়াময়'!

গীত।

(আস্থায়ী)

তুমি দয়াময় হইয়ে সদয়
এ বিশ্ব সংসার করেছ সৃজন!
যে দিকেতে চাই, দেখিবারে পাই,
অনন্ত ভাণ্ডার অশেষ রতন!

(অন্তরা)

মায়ানিদ্রা পরিহরি, উঠ হে দয়াল হরি,
কেন মায়া করি আছ অচেতন!

বহুযুগ যুগান্তরে, সাধ্যাতীত সমাদরে,
যাহার উদ্ধারে ছিল হে যতন!
সে সাধের বসুমতী, জরাজীর্ণা সাধ্বীসতী,
কাঁদিতেছে অতি, কর বিলোকন!
দারুণ পাপের ভারে, চক্ষে অশ্রু চারিধারে,
ডাকে বারে বারে হয়ে জ্বালাতন!
মুছা'য়ে নয়ন জল, জুড়া'য়ে যাতনানল,
কর অবিরল সুধা বরিষণ!
তুমি ভক্তবৎসল, আছ বিদিত সকল,
ভক্তের গরল ক'রেছ ভক্ষণ!
ভক্তবৃন্দ মিলি সবে, ডাকি তোমা উচ্চরবে,
থেকো না নীরবে—করি উদ্বোধন!
ডাকি ওঁ নমঃ ওঁ নমঃ, বাসুদেবায় নমঃ,
নারায়ণায় নমঃ—করি উদ্বোধন!

চতুর্থ অধ্যায়।

অভয়বাণী।

সত্য-লোকেরও উর্দ্ধে সেই সর্ব্বোচ্চ ধাম শান্তি-সুখধাম বৈকুণ্ঠধাম বা গোলোকধাম! যেখানে রত্নাসনে বিরাজমান—সেই সুঠাম, বঙ্কিম ঠাম, নয়নাভিরাম, নবঘনশ্যাম! যাঁর বামে বিশ্বেশ্বরী বিরাজিতা অবিরাম! চারিদিকেই চিরশান্তি চির-আরাম!

বৈকুণ্ঠের অনতিনিম্নেই অনন্ত কারণ বা ক্ষীরোদ সমুদ্র! সেই সমুদ্রেই অনন্তদেবের অনন্ত-শয্যা! মহাবিষ্ণু সেই শয্যায় শায়িত! তাঁহার এক এক

লোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড! সেই অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পরম-পুরুষেরই পদপ্রান্তে পরমা প্রকৃতি!

* তবে কে বা বৈকুণ্ঠেশ্বর—কেই বা অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর? আর কে বা বিশ্বেশ্বরী—কেই বা পরমা-প্রকৃতি?

যে যুগল মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে, সেই দুইয়ে এক মূর্ত্তিই পরম ব্রহ্ম! আর যে যুগল মূর্ত্তি অনন্ত-শয্যায়, সেই দুইয়ে এক মূর্ত্তিই বিশ্বের পালনকর্ত্তা মহা-বিষ্ণু! পরম ব্রহ্মের একমাত্র অনন্ত ঐশী শক্তি এই মহাবিষ্ণু! যেমন এক সূর্য্যের তেজ হইতে সমগ্র গ্রহ উপগ্রহগণ দীপ্তি পায়, সেইরূপ এই এক মহাবিষ্ণুর অনন্তশক্তি হইতেই সমস্ত দেবগণের দৈবশক্তি বিকাশ পায়! আবার সূর্য্য যে কোন্ তেজোময় পদার্থের তেজ পাইয়া এমন ভয়ঙ্কর তেজস্বী হইলেন, তাহা যেমন জানা যায় না; সেইরূপ এই মহাবিষ্ণু যাঁহার শক্তিতে অনন্ত শক্তিমান, তাঁহাকেও সহজে জানা যায় না। বৈকুণ্ঠেশ্বরই সেই বাক্যাতীত ও বোধাতীত বস্তু! সেই দুর্জ্জেয় দুরারাধ্য পরমপুরুষই পরমব্রহ্ম! তিনি নির্গুণ ও নির্ব্বিকার—অচিন্ত্য ও অব্যক্ত! গোলোকে যুগলরূপে বিরাজ করেন বটে, কিন্তু সে—সাধকের হৃদয়ে! তিনি নিরাকার পরমব্রহ্ম হইলেও সাধকের হৃদয় সাকার পুরুষ প্রকৃতিরূপ ধ্যানে নিমগ্ন থাকে!

মহর্ষি সনক একদিন এই যুগলরূপী পরমব্রহ্ম দর্শনে গিয়া গোলোকের দ্বারীদ্বয় জয় বিজয়কে তাহাদের স্বকৃত অপরাধের জন্য দারুণ শাপগ্রস্ত করিয়াছিলেন; সেই শাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যখন তাহারা প্রভু পরম-ব্রহ্মের শত্রুভাবে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অসহনীয় অত্যাচারে ত্রিভুবন কম্পিত করিতেছিল, তখন দেবগণ অনন্ত-শয্যাশায়ী মহাবিষ্ণুর নিকটই বিপদ উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলেন, এবং মহাবিষ্ণুই বারম্বার অবতাররূপে

* ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে বিশ্বসৃষ্টি ও ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তাহার একটী কথাও মিথ্যা নহে; কারণ কত কত বার যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি লয় হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই—কত কত বার যে এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহাই হউক, এখনকার এই কল্পের যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কাটিয়া কলি চলিতেছে, সেই ভাবের বিশ্ব-সৃষ্টি ও ঈশ্বরতত্ত্বের বৃত্তান্ত শাস্ত্রানুযায়ী এই পুস্তকে লিখিত হইতেছে। তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে, পরে এই পুস্তক পাঠেই বুঝিতে পারিবেন।

মর্ত্ত্যে আসিয়া সেই সকল উপদ্রবের শান্তি করিয়াছিলেন। অনন্তশয্যার যেরূপ যুগল-মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, সেইরূপ মর্ত্তেও যুগল-মূর্ত্তিতে গিয়া লীলা করিয়াছিলেন, মহাবিষ্ণুই অনন্তশয্যায় অর্দ্ধপুরুষ—অর্দ্ধ প্রকৃতি! মর্ত্ত্যে অর্দ্ধ রাম—অর্দ্ধ সীতা, আধা কৃষ্ণ—আধা রাধা! রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি প্রকৃতির অংশমাত্র। প্রকৃতির পূর্ণ অংশই রাধা! সারাজীবন ভক্তিতত্ত্ব শিখিয়া এবং প্রচার করিয়া স্বয়ং ব্যাসদেবও রাধা নামের মহিমা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। প্রকৃতিই স্বর্গে লক্ষ্মী—মর্ত্ত্যে সীতা ও রাধা! রুক্মিণীকে লক্ষ্মী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; কিন্তু শাস্ত্রের সার কথায় তিনি লক্ষ্মীর অংশপদবাচ্য!

এই মহাবিষ্ণু হইতেই ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের সৃষ্টি! তাই তাঁহারা ত্রিমূর্ত্তিই এক—এক মূর্ত্তিই তিন—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা! কিন্তু সকল দেবতারই একমাত্র নিদান সেই নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পরম-ব্রহ্ম! কল্পান্তকালে মহাপ্রলয়ে সর্ব্ব দেবতাই সেই একমাত্র ব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া এক বিরাট পুরুষ হইয়া এই অনন্ত-শয়নে শায়িত হইবেন। আবার বিশ্ব-সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে কর্ম্মময় বিষ্ণু সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে অন্যান্য দেবতাসৃষ্টি ও বিশ্বকার্য্যের ভার দিয়া তিনি এখনকার ন্যায় নিরাকার, নিষ্কাম ও দুজ্ঞের্য় ভাবেই বৈকুণ্ঠে বিরাজ করিবেন; অথবা অন্য ভাবেও সৃষ্টি-প্রকরণ সম্পন্ন করিতে পারেন। মহাবিষ্ণু অবতাররূপে মর্ত্ত্যে আগমন করিলে বৈকুণ্ঠের সিংহাসন শূন্য থাকে না; সেখানে সেই সাকার বা নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ ও নিষ্কাম চৈতন্যময় পুরুষ চির-বিরাজিত থাকেন। তবে অনন্ত-শয্যা শূন্য থাকে বটে; কিন্তু ছায়ারূপ শয্যা অধিকার করিয়া রাখে। যেখানে এই ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণুকেই বুঝিতে কত কত ভক্ত মহর্ষি দেবর্ষিগণের কোটী কোটী যুগ কাটিয়া গিয়াছে, সেখানে সেই কর্ম্মাতীত বোধাতীত বৈকুণ্ঠনাথের কথা আর কি বলিব? এই কর্ম্মক্ষেত্ররূপ বিশ্বসংসারে এই অনন্তশয্যাশায়ী কর্ম্মময় মহাবিষ্ণুই সকলের সুখমোক্ষদাতা—সকলের পর-মাত্মা! ইনিই ভবার্ণবের তরি—ইনিই সচ্চিদানন্দ হরি!

স্বর্গদ্বারে একাকী নারদের সেই সঙ্গীতেই এই হরির হৃদয় কাঁপিয়াছিল; এখন আবার নারদও দেবগণের সমস্বর বিশিষ্ট স্তবস্তুতি ও সঙ্গীতের রবে মহাবিষ্ণুর মহানিদ্রা বা মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল; তিনি যেন চমকিত হইয়াই উত্থিত হইলেন। ক্রমশঃই তাঁহার সেই স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি চঞ্চল ভাব

ধারণ করিল। পদপ্রান্তস্থা পরমাপ্রকৃতি পতির অতি চঞ্চলমতি দেখিয়া শশব্যস্তে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন নাথ, অকস্মাৎ চঞ্চল এমন,
ফুরা'ল কি পুনঃ মম সুখের স্বপন ?"

নারায়ণ কহিলেন—

"কাঁদ কাঁদ মুখখানি কেন অকারণ,
কি ভয়ে কাতরা কান্তা কহলো কারণ ?"

লক্ষ্মী। হেরিলে অধীর ভাব সুধীর নয়নে,
বড় ভয় দয়ামর, হয় মনে মনে!
কি ভাব উদয় আজ কি জানি কি হয়,
রাঙ্গাপদে বাঁধা তবু পদে পদে ভয়!

নারায়ণ। অকারণে এত ভয় কি হেতু ললনে,
অকারণে অমঙ্গল দেখ কি স্বপনে ?

লক্ষ্মী। অকারণে কেন তবে উঠেছ হে হরি!
অকারণে অসময়ে শয্যা পরিহরি ?

নারায়ণ। ডাকিছেন দেবকুল দাঁড়াইয়ে কূলে,
প্রাণের নারদ সহ মনপ্রাণ খুলে;
ভক্তিমূলে বাঁধা আমি ভক্তি ভিন্ন নই,
ভক্তিতে ডাকিলে আমি স্থির কভু হই ?

লক্ষ্মী। ভালবটে, ভালকথা ভাল আরো শুনি,
ভাল জ্বালা পুন বুঝি ঘটা'লে গো মুনি ?

নারায়ণ। মুনি নাম শুনি কেন ভয়েতে বিহ্বল ?
মুনি যে নারদ মম প্রাণের সম্বল!

ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মকাণ্ডে নারদ সহায়,
ভুলিলে কি মায়াময়ি, ভুলিয়ে মায়ায়?

লক্ষ্মী। ভুলি নাই ভগবান, ভুলিব কি আর?
বড় ব্যথা আজো জাগে হৃদয়ে আমার!
পড়ে মনে এইরূপ কত কত বার,
ডাকিতেন দেবগণ তোমা অনিবার;
ভাঙ্গিলে ঘুমের ঘোর ঘটিত গো দায়,
ভবে গিয়ে ভবঘোরে ভুলিতে আমায়!
বঞ্চিত হইত দাসী সেবিতে ওপদ,
ঘুচিত সুখের সাধ স্বর্গীয় সম্পদ;
পেয়েছ দিয়েছ ব্যথা, ব্যথাহারী হরি!
হরি হারা হ'য়ে মরি দিবস শর্ব্বরী!
স্মরিলে সে সব কথা, ব্যথা পাই মনে,
পুনঃ কেন দেবগণ ডাকিছে সঘনে?
তাই নাথ, দিনরাত শঙ্কা পদে পদে,
হারায়ে হরির পদ, পড়িবা বিপদে।

নারায়ণ। লীলাময়ি! লীলা তব নাহি অগোচর,
যা কিছু কোরেছি ভবে, তুমিই দোসর!
মহাশক্তি তুমি দেবি, তব শক্তি বলে,
সাধিয়াছি বিশ্বকার্য্য নানাবিধ ছলে;
জান না কি যুগে যুগে কত ভাঙ্গি গড়ি,
প্রলয়ের পরে পুনঃ পারাবারে পড়ি;
কর্ম্মেতে আরব্ধ বিশ্ব কর্ম্মেতেই শেষ,
কর্ম্মতরে কর্ম্মময়ি, কিবা তব ক্লেশ?
মানবী মায়ার ন্যায় ভয়ের ছলনে,
হেন ভাষা কেন শুনি ও শুভ আননে?

লক্ষ্মী। জানি আমি, আমি তুমি ভিন্ন কভু নই,
বিচ্ছেদ মিলনে রই, দুয়ে এক হই!
দেখাতে দৃষ্টান্ত দেব, অনন্ত জগতে,
কালে কালে লীলা কার্য্য করি বিধিমতে;

সত্যবটে, সত্যযুগে ছিনু সর্ব্ব সুখে,
ত্রেতার তরাস তবু জেগে উঠে বুকে;
দারুণ দুঃখের দিন দুর্দ্দান্ত দ্বাপর,
দুরু দুরু করে বুক কাঁপে কলেবর!

কলিকালে কর্ম্মান্তরে হব না অন্তর,
নিশ্চিন্তে অনন্তপদ সেবি নিরন্তর;
জানিয়ে সকল তবু মানবী লীলায়,
কি জানি কেমন করে আকুল আমায়!

মনে হ'লে মায়ামৃগ মারীচ সংহার,
অশোক কানন মাঝে চেড়ীর প্রহার;
মনে হ'লে অগ্নিদেব পরীক্ষা সময়,
যে দুর্ব্বাক্য বোলেছিলে, তুমি দয়াময়!

মনে হ'লে সেই দিন গর্ভ পঞ্চমাস,
বিনা দোষে বনবাস, তপোবনে বাস!
মনে হ'লে ছেলেদের জটাধারী বেশ,
ত্রেতাযুগে সর্ব্বশেষ, পাতাল প্রবেশ!

মনে হ'লে দ্বাপরের দুর্ব্বিসহ কথা,
রাধারূপে কাঁদা কাঁদি পেয়ে প্রাণে ব্যথা!
মনে হ'লে প্রভাসের দ্বারীর আঘাত,
আজো চক্ষে শতধারা পড়ে দিন রাত!

তাই নাথ, ভয় বড় দেব-সম্ভাষণে,
পাছে পুন মর্ত্ত্যে যাও কলি আগমনে?

নারায়ণ। কলিকালে কিবা ভয় কেশব সঙ্গিনী,
দিতেছি অভয় বাণী ভয়কি ভাবিনি ?
কলিকালে শেষ খেলা খেলি একবার,
করিব বিশ্বের ধ্বংস হইবে আঁধার !
নিষ্কাম ব্রহ্মের সহ মিশি পুনরায়,
পড়িব প্রগাঢ় ঘুমে অনন্ত শয্যায় ;
ক্ষীরোদবাসিনী সহ ক্ষীরোদ শয়নে,
ভুঞ্জিব অনন্ত শান্তি নিষ্কাম জীবনে !
নিষ্কণ্টকে নিরবধি হেরিব তোমায়,
পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে কভু ছাড়া নয় !
ডাকিছেন দেবগণ দেখ বারম্বার,
চল যাই, কূলে গিয়ে দেখি একবার।

মহাবিষ্ণুর এই প্রকার অভয়-বাণীতে বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং দুইজনে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ক্ষীরোদের কূলে সমাগত সকলকেই দর্শন দিলেন। দেবগণ, নারদ ও বসুমতী সকলেই সেই "ওঁ নমঃ ভাগবতে বাসুদেবায় নমঃ" সুর গাহিতে গাহিতেই ভগবানের চরণে প্রণাম করিলেন। নারায়ণ সকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন "অসময়ে কেন আগমন ? এখনও যে অনেক কার্য্য প্রয়োজন—তবে ত হইবে ধ্বংসের আয়োজন ! তবে ত মর্ত্ত্যমাঝে দিব হে দেখা—তবে ত অবতাররূপে যাইব একা ; তবে ত ধরিব কল্কির বেশ—তবে ত করিব সকল শেষ ! এখন কেন এ মহা আহ্বান—এখন কেন করাইলে উত্থান ? বল, বল, শুনিয়া জুড়াই প্রাণ !" দেবগণ কহিলেন "অন্তর্য্যামী তুমি নারায়ণ—কিবা তোমা করিব জ্ঞাপন ? কি আছে অজানিত তোমার গোচর—তুমি ব্যাপ্ত এই বিশ্ব-চরাচর !" নারায়ণ কহিলেন "তবু মম জানিতে মনন—নহিলে কি হয় কার্য্যের সাধন ? কামনা, ছলনা, মায়া সকলই যে চাই—নহিলে কি বিশ্বমাঝে কোন কর্ম্ম পাই ?" তখন দেবগণ বসুমতির প্রতি পাপের অত্যাচার যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, সকলই বর্ণন করিলেন। নারায়ণ বিস্মিত হইয়া কহিলেন "কি ভয়ঙ্কর ! পাপের এত অত্যাচার ?

তবে কিবা কার্য্য তোমা সবাকার? কিবা কার্য্য সেই যমরাজার? চিত্র-গুপ্তেরই বা কিরূপ বিচার? যদি হয় এত অত্যাচার? বড় সাধের বসুমতী আমার! হবে না কি তার বিপদ উদ্ধার?”

বসুমতী আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া দুই চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে নারায়ণের চরণে পড়িয়া কাতরে কহিল “আমার অনন্ত দুঃখের কাহিনী কত আর বলিব নাথ? আপনার এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও আমার অসংখ্য দুঃখ রাখিবার স্থান সংকুলান হয় না। যখন প্রথমে আমায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন কেবলমাত্র জম্বুদ্বীপটাই বক্ষে করিয়া রাখিতাম—অন্য সকল স্থান জলময় ছিল; ক্রমে এক এক মহাপুরুষের দ্বারা ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেও প্রজাসৃষ্টি হইতে লাগিল; তাহাদেরও ভার আমি অক্লেশে বহন করিয়াছি। তাহার পর জলময় স্থানসমূহ ক্রমে ক্রমে দ্বীপ উপদ্বীপে পরিণত হইয়া কত কত দেশ, কত কত জনাকীর্ণ নগররূপ ধারণ করিয়াছে। এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশ, তাহাতে আবার চীন জাপান, তুরস্ক পারস্য, রুসিয়া সাইবিরিয়া, ইংলণ্ড ল্যাপল্যাণ্ড, সাহারা মিসর প্রভৃতি কত দেশ, কত নগর, কত গ্রাম যে এখন লোকাকীর্ণ হইয়াছে, সে সকল আর কত জানাইব? এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা ও আচারব্যবহার যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ ভাবেই খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শাক্যসিংহ প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে পাঠাইয়া আপনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আপনার স্বপ্রচারিত সাধের সনাতন ধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুস্থান ভিন্ন ত আর কোথায়ও নাই! যে ধর্ম্মবীজে আমার উৎপত্তি—যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র আমার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে—যে ধর্ম্মাবলম্বী সন্তানগণকে আমি আদরের সহিত আজীবন বুকে করিয়া রাখিয়াছি, যে ধর্ম্মকে বহুতর বিদেশী বিধর্ম্মী সন্তানও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে, সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে কলিতে এককালে লোপ হইবার উপক্রম হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। সেই জন্যই ত আমার এত নির্য্যাতন—আমি এত জ্বালাতন! আমার বিদেশী বিধর্ম্মী সন্তানগণের সহিত হিন্দু সন্তানগণের আচার ব্যবহারের আদান প্রদান চলিতেছে বলিয়াই ত পাপের এত প্রভুত্ব! জম্বুদ্বীপবাসীগণ স্বধর্ম্মে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে আর আমার চিন্তা থাকিত না। জম্বুদ্বীপই আমার জীবনকাটী মরণকাটী! জম্বুদ্বীপই আমি—আমিই জম্বুদ্বীপ! জলময় জগতে প্রথম আমিই স্থলরূপে সৃজিত হইয়াছিলাম; আমার চারি-

দিকে তখন জল ছিল বলিয়াই নাম হইয়াছিল দ্বীপ—আদিস্থল জম্বুদ্বীপ! তাহার পর যত জনপদ, যত পর্ব্বত, যত মরুভূমি সৃষ্টি হইতেছে, সকলই আপনার ইচ্ছায় বলিয়া আমি সে সকলকেও অম্লানবদনে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক আপনার কার্য্য সাধন করিতেছি। আবার আমেরিকা নামক একটী স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাকে কেহ কেহ পাতালের অন্তঃর্গত বলেন; কেহ কেহ বা আমারই পৃষ্ঠের মহাদেশ বলেন; যাহাই হউক, আপনিই জানেন! আমার কিন্তু সে দিকেও আজকাল বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে; ইহাতেও আমার কষ্টবোধ নাই। যে জম্বুদ্বীপবাসীগণকে স্বধর্ম্মে রাখিবার জন্য কত অস্ত্রাঘাত বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছি, তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিলে এখন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! আবার জম্বুদ্বীপের মানব-রাজ্যও কত বিশৃঙ্খল! হিন্দুরাজ্যের পর যবনরাজ্য; যবনরাজ্যের পর এখন ইংরাজ রাজ্যের সুদূর বিস্তার! তাহাও ভগবদিচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া আমার দুঃখ নাই! কিন্তু হিন্দুর অমূল্য মণি ধর্ম্মকোহিনুর যে ক্রমে ক্রমে হিন্দুস্থান হইতে অন্তর্হিত হইতেছে, পুণ্যভূমি ভারতভূমি যে পাপের আকর-স্থান হইয়া উঠিতেছে, শান্তিময় রাজ্য যে অশান্তি অনর্থ—চৌর্য্য লাম্পট্য—শঠতা বঞ্চনা—জাল-জুয়াচুরী—গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা—আত্মহত্যা ভ্রূণহত্যা—কন্যাপুত্র বিক্রয়—ব্যভিচার কদাচার—সাম্যমন্ত্রে একাকার প্রভৃতি পাপানুচরে পূর্ণ হইতেছে; তাহাতেই আমার দুঃখের সীমা নাই। যদিও যুগধর্ম্মে জগদীশেচ্ছায় এই সকল ঘটিবার কথা, কিন্তু এত অসহনীয় অত্যাচার কেন? অন্যান্যযুগে কদাচিত দুই একটী পাপানুচরের ভার বহন করিতাম বটে, কিন্তু তখন যে এই দেবদুর্ল্লভ রাঙ্গাচরণ আমার বক্ষে বিরাজ করিত; এই জন্যই তখন তাহাতে দৃক্‌পাতও ছিল না। এখন পাপের ভারও যেরূপ গুরুতর, দেব-পদরজও সেইরূপ দুর্ল্লভ! সুতরাং এই অভাগিনী কাঙ্গালিনী কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়াই কাল কাটাইত; কিন্তু দিন দিন পাপের প্রবল অত্যাচার নিতান্তই অসহ্য হওয়ায় প্রাণ কণ্ঠাগত হইলে ছুটিয়া স্বর্গে আসিয়াছি; মরণের পথে পড়িয়া চরণে শরণ লইতে আসিয়াছি।

যখন মহারাজা বেণের বাহু-মন্থনোদ্ভব পৃথু রাজা আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন কত প্রাণের আশা! প্রাণভয়ে গাভীরূপ ধারণ করিয়াও ছুটীয়া বেড়াইয়াছি; সে সময়ে যদি পৃথু আমাকে দোহন না করিয়া একেবারে বধ করিতেন, তবে আর কলির এত নিগ্রহ আমাকে সহিতে

হইত না! কিম্বা একপদবিশিষ্ট বৃষরূপী ধর্ম্ম এবং গাভীরূপে আমি যখন কলিসম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলাম, সেই সময়ে রাজা পরীক্ষিত যদি কলিকে বিনাশোদ্যত হইয়াও বিরত না হইতেন, তাহা হইলেও আমার মঙ্গল হইত। এখন যে প্রাণ যায়! ওহে বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! যতদিনে আপনি এই কলির ধ্বংস করিবেন, ততদিন যে আর বাঁচিতে পারি না। দুর্ম্মতি পাপের ছোট বড় সকল অনুচরই যে আমাকে দিবা রাত্রি ক্ষত বিক্ষত করিতেছে; কলির আধিপত্যে ভয়ানক ভীতই হইয়াছি! আপনার আদেশ পালন ও কার্য্যোদ্ধার আমার নিতান্ত ভারস্বরূপই জ্ঞান হইতেছে—আর বুঝি পারি না।

আবার যমরাজা ও চিত্রগুপ্তের আচার বিচারের বিষয়ই বা বলিব কি? যখন যাহা মনে করিতেছেন, তখন তাহাই করিতেছেন; দেখিতে পাই, সংসারে যে অপেক্ষাকৃত সৎ বিনীত ও ধার্ম্মিক—যাহার দ্বারা জগতের উপকার সাধিত হয়—বহুলোক প্রতিপালিত হয়, তাহাকেই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে গ্রাস করেন। শুনিতেছি ধ্বংসের এখনও অনেক বাকী, তবু তাঁহারা এক একটী দুর্দ্দান্ত নূতন দূত পাঠাইয়া এক একটী দেশই একেবারে ছারখার করিতেছেন। আর কিছুদিন এইরূপ একাধিপত্য করিলে ধ্বংস শীঘ্রই হইবে—আপনার নির্ণীত কালও সংক্ষেপ হইয়া আসিবে। আর অকাল-মৃত্যু এতই হইতেছে যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কত আরাধনার ধন একমাত্র পুত্ররতন—কত পতিগতপ্রাণার একমাত্র অবলম্বন—কত গৃহীর গৃহের ভূষণ জীবনের জীবন স্ত্রীধন—কত মানুষের মানুষকরা আশার ধন যে শমন হরণ করে, তাহার দমন কে করে? এইরূপ অসংখ্য অকাল-মৃত্যুজনিত স্ত্রী-পুরুষের বিকট আর্ত্তনাদ ও রোদনের রোলে আমি বধির হইয়া গিয়াছি; তাহাদের নয়নকোণে নিরবধি যে নীরধারা পড়ে, তাহাতেই আমার নিত্য-স্নান! ঠাকুর! আর কত শুনিবেন? এই দেখুন আমার জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে পাপ-পদাঘাতের পদচিহ্ন—পাপ-অস্ত্রাঘাতের ক্ষতচিহ্ন! আর কি দেখিবেন? দেখুন আমার দুনয়নের সহস্রধারা—দেখুন আমার জীবন্তদেহ কিরূপ 'দগ্ধে মারা'! দেখুন আমার পাগলিনীবেশ—দেখুন আমার আকর্ষিত পক্ককেশ! দেখুন কলিতে কিরূপ সুখ—আর কি আমার রেখেছে মুখ!"

মায়াময় হরি জানিয়াও যেন জানেন না, এই ভাবে সমস্তই শুনিলেন; শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভীত হইয়া রহিলেন। পরে নারদকে ডাকিয়া কহিলেন,

"নারদ! বসুমতীর বিপদ উদ্ধারার্থ ইন্দ্রালয়ে একটী দেবসভার অধিবেশন করিতে হইবে; তথায় যম ও চিত্রগুপ্তকে আনাইয়া তাহাদের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে হইবে এবং ন্যায় অন্যায় দেখিতে হইবে; পরে সকলে মিলিয়া ইহার একটী সু-মীমাংসা করিতে হইবে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে যেখানে আমার যত ভক্ত আছেন, যেখানে আমার অংশসম্ভূত যত দেবদেবী আছেন, তোমার অগোচর ত আর কিছুই নাই? আমার আদেশে তুমি তাঁহাদিগের সকলকেই সাদরে সভায় আহ্বান করিয়া লইয়া আসিবে। আর ব্রহ্মা ও পার্ব্বতীসহ মহেশ্বরকে আমার নিকটই আসিতে বলিবে; কারণ সকলেই ইন্দ্রালয়ে সমাগত হইলে আমরা ত্রিমূর্ত্তি একত্র হইয়া তথায় উপস্থিত হইব।"

নারদ এতক্ষণ নীরব ছিলেন; এইবার অবসর বুঝিয়া নারায়ণকে কহিলেন, "কার্য্যের সময়েই নারদের ডাক পড়ে! এতক্ষণ ত একটী কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই? নিজের অংশ দেবগণের সহিত বাক্যালাপের সময় কি অধম নারদের দিকে একটীবারও লক্ষ্য করিতে নাই?" নারায়ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কেন নারদ? তুমি ত আমার দেহাভ্যন্তরেই আছ; তোমায় আবার কি জিজ্ঞাসা করিব বা কিরূপ লক্ষ্য করিব?" নারদ বলিলেন, "তবু লোকাচারে লৌকিক সম্ভাষণেরও প্রয়োজন!" নারায়ণ কহিলেন, "লোকাচার লোকালয়ে—এখানে কি নারদ?" এইবার নারদের হারি মানিতে হইল; তখন তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বৈকুণ্ঠে যাইব কি?"

নারায়ণ। তাহাতে আপত্তি কি? কথাপ্রসঙ্গে যদি এ সকল কথা কিছু উঠে, তবে বলিও—নচেৎ বলিবার আবশ্যক নাই।

নারদ। 'আবশ্যক নাই' তা জানি; কে বা আপনি—কেই বা তিনি, তাহাও জানি! তবে আপনারা যেরূপে কার্য্যোদ্ধার করেন—আমারও সেইরূপ বলা উচিত। তিনি চক্রী—আপনি চক্রান্ত, তিনি কারণ—আপনি কার্য্য! ধার্য্য ঠিক করিয়াছি, তবু একবার সে কথা জিজ্ঞাসা আবশ্যক।

নারায়ণ। (সহাস্যে) নারদ! যমপুরী যাইবে কে?

নারদ। ক্ষমা করিবেন প্রভু; আমি কলিকালে যমালয়ে যাইতে পারিব না। পুরীষে পতিত পাপীর প্রেতাত্মার দুর্গন্ধে আমি যমালয়ের যোজন পরিমাণ পথেও যাই না; তা, যমালয়ে যাইব কি? তবে আপনার আদেশ নিতান্তই পাইলে কোথায় যাইতে না পারি?

নারায়ণ নারদের আপত্তি বিলক্ষণ বুঝিলেন; নারদকে তখন আর কিছু না বলিয়া পবনদেবকেই যমরাজা ও চিত্রগুপ্তকে লইয়া আসিবার ভার দিলেন; কারণ দুর্গন্ধ সুগন্ধ সকলই পবন বহন করেন—পবনের বিকার-বোধ কিছুতেই নাই! পবনও ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। তখন নারায়ণ ইন্দ্রকে সভাস্থল সুসজ্জিত করিতে, বরুণকে বিশৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে, এইরূপ সমাগত দেবগণ-মধ্যে সকলকেই এক একটী কার্য্যের ভার দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই সভার শুভ দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল; সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে সচেষ্ট হইলেন। নারদ ও ইন্দ্র পবন প্রভৃতি দেবগণ সকলেই ভগবচ্চরণে প্রণামপূর্ব্বক আদেশানুযায়ী কার্য্য পালনের জন্য বিদায় হইলেন।

তখন ভগবান বসুমতীকে কহিলেন, "আর কি বা ভয়? এবার হইবে নির্ভয়—তোমায় দিতেছি অভয়! দেখ, হয় কি না হয়? ঘুচিবে বিপদ—পাইবে সম্পদ! অত্যাচারে অব্যাহতি—হইবে সম্প্রতি! বিনামূলে আমায় রেখেছ যে কিনে—আসিবে সভার নির্দ্দিষ্ট দিনে!" বসুমতী ভগবানের এই অভয় বাণী শুনিয়া বিশেষ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া নারায়ণের চরণে, প্রণাম-পূর্ব্বক যখন বিদায় চাহিল, তখন একটী স্থিরা অচঞ্চলা সৌদামিনী মূর্ত্তির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল; দেখিল, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি বিদ্যুদ্দাম-বিভাসিত অপরূপ রূপরাশী লইয়া ছল ছল নেত্রে তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন! ক্ষণকাল পরেই সেই সুমুখের সুধাবাণী বসুমতী শুনিতে পাইল; দেবী কহিলেন—

চিনেছি চিনেছি দেবি চিনেছি তোমায়,
তুমি যে ধরণী নাম ধোরেছ ধরায়!
একি দেখি অনাথিনী,
রাজরাণী কাঙ্গালিনী!
একি দেখি শীর্ণ হায়,
ধূলায় ধূসর কায়!
বদন মলিন হেন,
জনমদুঃখিনী যেন!

কি ভাবে এ ভাব দেখি ম'রে যাই দুঃখে,
পোড়া পাপ এত তাপ দিয়েছে কি বুকে ?

বসুমতী। কে তুমি লো সুরবালা নবীনা ললনা,
কে তুমি রমণী মণি করিছ ছলনা ?
ভাবেতে বুঝিতে পারি,
বিশ্বেশ্বরী তুমি নারী ;
নহিলে এমন মায়া,
কে করিবে কৃষ্ণজায়া ?
দুঃসময়ে দুঃখিনীর,
কে মুছায় দুঃখ-নীর ?
কে চাহে কৃপার চক্ষে করুণা-চাহনি,
বিনা সেই নারায়ণী সত্য সনাতনী ?

লক্ষ্মী। মনে কি প'ড়েছে দেবি, প'ড়েছে কি মনে ?
সপত্নী সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিল যে দুজনে !
মনে কি পড়ে গো সতি !
সেই অগতির গতি
পতিরূপে মম পতি
পেয়েছিলে বসুমতি !
একদিন ভাগ্যবতী,
রঙ্গ রস ছিল অতি,
গর্ভে গ্রহ ধ'রেছিলে নামেতে মঙ্গল,
সুমঙ্গলে কেন এবে এত অমঙ্গল ?

বসুমতী। বুঝেছি বুঝেছি তব বুঝেছি বাসনা,
সতিনী বলিয়ে বুঝি দিতেছ যাতনা ?

সতিনী জ্বালায় জ্ব'লে
সংসারে সবাই বলে,
'যে নারী সতীনে পড়ে,
ভিন্ন বিধি তারে গড়ে!'
তাই দুঃখ অবিরাম,
বিধাতা বিষম বাম!
তুমিও গো তাই বুঝি ঠেলিয়াছ পায়,
তোমারও সতীনে ভয়, হায় হায় হায়!

লক্ষ্মী। সতীন কতই মম 'নিতুই নূতন!'
সতীনে নাহিক ভয় শুনলো বচন;
মম পতি বিশ্বপতি,
সকলেরি সেই পতি!
পতি-প্রাণা কত সতী
হা'রায়ে প্রাণের পতি,
মম পতি পদতলে,
প'ড়ে আছে কুতুহলে!
লীলাছলে কত স্থলে কত কৃষ্ণদারা;
শুনিয়ে সতীনে শঙ্কা, সরমেতে সারা।

বসুমতী। জলমাঝে যবে আমি ছিনু নিমগন,
প্রভু মোরে করিলেন উদ্ধার সাধন!
বিকট বরাহ বেশে,
হিরণ্যাক্ষে বধি শেষে,
বিবাহ করিয়ে মোরে
বাঁধিলেন প্রেম-ডোরে!
তবে কেন দুঃখ পাই?
বল মোরে বল তাই!

অবলা-স্বভাবে মোর কুভাব যে গায়,
সতিনী সাপিনীবিষে বুঝি বা জ্বালায়!

লক্ষ্মী। সতিনী সাপিনী বলি ভেবো না আমায়,
তুমি যে জননী মম ছিলে মা ধরায়!
সতিনী যে সখীসম,
তবু তাহা নাহি মম ;
যেই কৃষ্ণপ্রেমাধীন,
সেই মম প্রেমাধীন!
কেহ অংশ কেহ ভক্ত,
সকলেতে অনুরক্ত,
উভয়ে একত্র হ'য়ে থাকি অনুক্ষণ,
মিছে কেন মেয়েরে মা বল কুবচন?

বসুমতী। পরমা প্রকৃতি তুমি শ্যাম-সোহাগিনী,
কি আর কহিব দেবি, আমি যে দুঃখিনী!
গিয়েছে সকল সুখ,
দুঃখেতে ফাটিছে বুক,
মা বোলে আমায় আর,
কেন ডাক বারম্বার?
অসময়ে অন্ধকার,
দেখি, কেহ নহে কার;
নহিলে কি পাই হেন দারুণ যাতনা,
মেয়ের মা হ'লে আজ কিবা গো ভাবনা?

দেবী। কেন মা কেন মা আজ এত অভিমান,
অসময়ে তুমি মোরে দিয়েছ যে স্থান!

তোমারি কোলে ত সীতা,
পরে ত জনক পিতা!
পুন পরীক্ষার ভয়ে,
তোমারি আশ্রয় ল'য়ে,
জানকী-জীবন শেষ,
হ'ল পাতালে প্রবেশ!
কৃষ্ণপ্রেমে কাঙ্গালিনী পাগলিনী রাধা,
তোমারি ত স্নেহ-ঋণে ছিল চির-বাঁধা!

বসুমতী। সীতা হ'তে তাই পাই যাতনা এমন,
রাধার স্নেহের ধার শুধিলে যেমন!
জানি গো মা দয়ামায়া,
যেন তালপত্র ছায়া,
বড় যার ভাগ্য-জোর,
শক্ত বাঁধা ভক্তি-ডোর,
তারি বাঁধা পদতরি,
কাণ্ডারী আপনি হরি!
যাই মা যাই মা রমা কর মা বিদায়,
মা বোলে মা মনে রেখো, দেখো মা আমায়!

দেবী। কোথা যাবে মা জননি, পাগলিনী বেশে,
পড়িয়ে পাপের ফাঁদে প্রাণ যাবে শেষে!
পেয়েছি তোমার দেখা,
আর না ছাড়িব একা,
জানি না এমন পাপ,
তাই পাও মনস্তাপ,
নহে কি নিশ্চিন্ত রই?
মা'র দুঃখ প্রাণে সই?

যেও না যেও না আর করি মা বারণ,
এবার ধরিলে পাপ নিশ্চয় মরণ!

বসুমতী। চখে দেখে বড় মায়া ও মা কৃষ্ণজায়া,
মায়াময়ী মেয়ে তুমি জানি তব মায়া!
ভূমিকম্পে টলমল,
পৃথ্বী যাবে রসাতল,
আমি না ধরিলে বল,
কৃষ্ণকার্য্য অবিরল,
কে সাধিবে তাই বল,
জগত হইবে জল!
আসিব সভার দিনে ভয় নাহি মানি,
নির্ভয়ে পেয়েছি আমি যে অভয় বাণী!

দেবী। তবে আর কি বলিব, এস মা ত্বরায়,
পাপের কুহকে ভুলি ভুলো না আমায়!
দেখিবারে মুখখানি,
শুনিবারে সুধাবাণী,
.তোর আদরের মেয়ে,
রহিল রে পথ চেয়ে,
যেন অভিমান ভরে,
থেকো না বিলম্ব ক'রে,
নির্ভয়ে অভয়বাণী পেয়েছ এবার,
সত্বর বিপদ তব হইবে উদ্ধার!

বসুমতী। তুল মা তুল মা মুখ, যাই চেয়ে চেয়ে,
চির আদরের তুমি আদরিণী মেয়ে!

মুখে যাহা বলি কই,
তোমারে কি ভুলে রই ?
আমার সন্তানগণ,
সবে বলে অনুক্ষণ,
চঞ্চলা তোমার নাম,
কভু আছ কভু বাম,
কেবলে চঞ্চলা তুমি, চির-অচঞ্চলা,
নিজ দোষে লক্ষ্মীছাড়া, ভাবে না কমলা !

এই বলিয়া বসুমতী বিদায় হইল ; যাইবার সময় কেবল একমাত্র শেষ কথা—

মেয়ে বলি, যাই বলি, তুমি বিশ্বেশ্বরী,
চরণে শরণ তব ল'য়েছি ঈশ্বরি !
তোমাদেরি কৃপাবলে ভয় নাহি মানি,
নির্ভয়ে পেয়েছি আমি যে অভয়বাণী !

পঞ্চম অধ্যায়।

দিক্‌ভ্রম।

ভগবানের আদেশে দেবগণ সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন ; দেবর্ষি নারদও চতুর্দ্দশ-ভুবন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সচরাচর সকলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল লইয়া ত্রিভুবনই বলিয়া থাকে ; এই তিন ভুবনকে তিন পর্ব্ব করিয়া তিন স্থানের চিত্রই এই গ্রন্থে লিখিত হইতেছে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত—এই বিশ্বে চতুর্দ্দশ লোক পর পর স্থাপিত।

পাতালেরও ত্রিশ যোজন নিম্নে ভগবানের এক প্রধান অংশ অনন্তদেব বিরাজ করিতেছেন ; তাঁহার আর এক নাম সঙ্কর্ষণ দেব ! কল্পান্তকালে

তাঁহারই মুখাগ্নিতে বিশ্বের ধ্বংস হয়। তাঁহার নিম্নে আর আধার কিছুই নাই—তিনি নিজেই নিজের আধার! এই অনন্তদেব নাগরূপে অনন্ত অংশে বিভক্ত হইয়া এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। এই অনন্ত দেবেরই কতিপয় অংশ কোটী কোটী ফণা বিস্তারপূর্ব্বক ক্ষীরোদ সমুদ্রের তলদেশে মহাবিষ্ণুর অনন্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

এই অনন্ত দেবের মস্তকে প্রথমে ভূগর্ভস্থিত অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত ভুবন স্থাপিত; তদুপরে 'ভূ ভুর্বঃ স্বঃ' এই তিন লোক, তদুপরে মহল্লোক, তপলোক, জনলোক ও সত্যলোক! এই চতুর্দ্দশ ভুবনই উপর্য্যোপরি বিরাজিত!

ভগবান অনন্তদেবের বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য এবং পাতালাদি সপ্ত ভুবনের বিবরণ পাতাল পর্ব্বে প্রকাশিত হইবে। দেবর্ষি নারদ প্রথমেই ভগবানের অংশ অনন্তদেবের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাঁহাকে দেবসভার বিষয় সমস্ত বলিয়া পাতালাদি সপ্তলোকবাসী যাঁহাকে যাঁহাকে বলিবার আবশ্যক সেই সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরে পাতাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূলোক ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

কেমন যে অদ্ভুত ঘটনা, দেবর্ষিরও আজ যেন দিক্‌ভ্রম হইল! পাতাল হইতে ভূলোকে উঠিতে উঠিতে পাতালের পথে পথ হারা হইলেন। যুগ-যুগান্তর কতবার নারদ চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এমন পথভ্রম ত কখন হয় নাই! কোন্ পথে আসিতে কোন্ পথে আসিয়া পড়িলেন? নারদ কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পাতালে প্রবেশ করিবার সময় এ পথ দিয়া ত গমন করেন নাই; দেখিতেছেন এ পথ অতি মসৃণ ও সরল, অথচ ভয়াবহ! এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঁধা পথে কাহারও সমাগম নাই; নীরব নিস্তব্ধ—এক শব্দ—যেন কেবল অদূরবর্ত্তী নানাপ্রকার কোলাহলের একটীমাত্র অস্পষ্ট শব্দ! থাকিয়া থাকিয়া নারদের প্রাণ চমকিয়া উঠিতে লাগিল; তিনি অত্যন্ত ভয় পাইলেন। ভয়হারী ভগবানের অভয়চরণ পাইয়াও ভক্তপ্রধান আজ ভয়যুক্ত মানবের ন্যায় ভয় পাইলেন। তাঁহার বক্ষস্থল দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে নানাবিধ বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটী ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া আর তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

দেখিলেন একটী প্রকাণ্ড গভীর কূপমধ্য হইতে অনবরত তীব্র দুর্গন্ধময়

ধূমরাশী উঠিতেছে; তিনি সেই দুর্গন্ধময় ধূমের অন্ধকারে আরও দিশেহারা হইলেন। কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া দেখিতে লাগিলেন—সেই সুগভীর কূপ হইতে ধূমপুঞ্জ ভেদ করিয়া দীর্ঘাকার কৃষ্ণকায় ভীমমূর্ত্তি দুই পুরুষ উত্থিত হইল; একজনের স্কন্ধে সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা মাখান একটী সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি! তাহার জিহ্বা আমূল বাহির হইয়া লক্ লক্ করিতেছে; আর এক জনের স্কন্ধে ঘর্ম্মাক্ত ললাটবিশিষ্ট একটী সুপুরুষের কাটামুণ্ড! রমণীর লক্ লক্ জিহ্বার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সেই ছিন্ন মুণ্ড যেন খল খল হাস্য করিতেছে!

নারদ আবার দেখিলেন আর একটী সেইরূপ ভীমাকার পুরুষ দুইজন যুবাপুরুষকে দুই হস্তে ধরিয়া সেই কূপ হইতে উত্থিত হইল, যুবকদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গেই গলিত ক্ষত—তাহাতে পচা পুঁয রক্ত পড়িতেছে ও পোকা বিজ্ বিজ্ করিতেছে! তাহার দুর্গন্ধ বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা সেই দুর্গন্ধময় পুঁয রক্ত ও পোকা সকল চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে! নারদ নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ অনেক্ষণই হইয়াছেন, এখন ভয়ানক দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া পড়িলেন।

নারদ পুনরায় দেখিলেন একটী বিকটাকার রাক্ষসীর ন্যায় স্ত্রীমূর্ত্তি এক হস্তে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ ফলাকা লইয়া এবং অন্য হস্তে একজন যুবা পুরুষকে ধরিয়া সেই কূপ হইতে উঠিল ও সেই উত্তপ্ত অস্ত্র পুরুষটির বক্ষে সজোরে বসাইয়া দিল। পরক্ষণেই কূপমধ্য হইতে আবার একপ্রকার অতি তীব্র দুর্গন্ধ ও ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল; এবার যে আবার কি বিভীষিকা দেখিবেন, এই ভাবিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এবারের ঐই শব্দ শুনিয়া এবং ভয়ানক দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া নারদের মূর্চ্ছা হইল; তিনি বিষম ভয়ে একেবারে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

কি জানি এ সকল কি ভয়ানক বিভীষিকা? কি জানি দেবর্ষির আজ এ কিরূপ—**দিক্‌ভ্রম!**

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দর্প চূর্ণ।

কথায় বলে দশ-চক্রে ভগবান ভূত! কিন্তু অদৃষ্ট-চক্র অত্যন্তই অদ্ভুত! এই চক্রে ভগবান নিজে নিজেই ভূত! কতবার হইয়াছেন—কিমাকার কিম্ভূত! এই চক্রে অবিরত ঘূর্ণীত সর্ব্বভূত! ভূতাবাস ভূমণ্ডলে এই ভাগ্য-ফলে অকালেই পঞ্চভূতে মিশায় পঞ্চভূত! এই চক্র সুখ দুঃখের ও মূলীভূত! জগদীশের এই জটিল চক্রে জড় জগতের জীব মাত্রই জড়ীভূত! এই ভাগ্য-চক্রে ভবের জীব ভূত ভবিষ্যত ভুলিয়া ভয় ভাবনায় সদাই অভিভূত! অদৃষ্ট চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কখন যে কে কোন্ পথে যায়, তাহার কিছুই ঠিক নাই; আবার অদৃষ্ট ছাড়া কাহারও পথ নাই! তুমি ভূপতি বা ভিখারী—সন্ন্যাসী বা সংসারী, রাজা বা উজীর—আমীর বা ফকির, নারী বা পুরুষ—দেবতা বা মানুষ যেই হও, অদৃষ্টের বশে সকলেই চলিতেছে; অদৃষ্ট যে পথে লইয়া যায় সেই পথে যাইতেছ! তুমি ভবের জীব প্রিয়বিরহে বা আত্মজন-বিয়োগে মিথ্যা শোক প্রকাশ কর—বৈষয়িক বিবিধ বিড়ম্বনায় বৃথায় বিলাপ কর—ক্ষতির দশায় পড়িয়া অনিষ্টাপাতের আতিশয্যে অনর্থক অনুতাপ কর—ঘূর্ণায়মান চক্রবৎ অনবরত অবস্থা পরিবর্ত্তনে আপনাকে অলীক ধিক্কার দাও; তুমি বুঝিয়াও বুঝিতে পার না যে, অদৃষ্ট ছাড়া তোমার গতি নাই! ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি আমরণ অদৃষ্ট তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে অদৃষ্টের সৃষ্টি হইয়াছিল; অদৃষ্ট বিশ্ব-সৃষ্টির একটী প্রধান উপাদান। বিধি যে বিধিলিপি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, বিধির বিধানে সকলকেই তাহার ফলাফল ভোগ করিতে হইবে। যে চক্রীর চক্রান্তে এই অদৃষ্ট চক্র চতুর্দ্দিকে চালিত হইতেছে, সেই চক্রধর স্বয়ংই যখন অবতাররূপে কতবার অদৃষ্টের ফলাফল ভোগ করিয়াছেন, তখন সেই চক্রীর চক্রান্তজাল বিস্তার করিবার প্রধান সহায় দেবর্ষি নারদ যে আজ অদৃষ্ট চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পাতাল-পথে পড়িয়া চেতনাশূন্য হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মহীরাবণ যখন রাম লক্ষ্মণ হরণ করিয়া পাতাল-পুরী লইয়া যাইতেছিল, তখনকার সেই প্রসঙ্গে অদ্যাপিও অনেকে বলিয়া থাকে—যিনি বিধাতা পুরুষ, যিনি জীবের

ভাগ্যলিপি লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার কপালে এরূপ বিড়ম্বনা কে লিখিল? বিধির বিপাকে বিধি-বিড়ম্বনায় জীবেরই বিপদ ঘটে, কিন্তু বিধির অদৃষ্টে বিধির বিপদ কোন্ বিধাতা লিখিল? কবি কৃত্তিবাস কল্পনা-কৌশলে এস্থলে লিখিয়াছেন—"বিধির কপালে আছে বিধির লিখন!" বাস্তবিকই বিধির কপালেও বিধিলিপি বিধিবদ্ধ! তাই বলি ভগবানও যখন ভাগ্যের অধীন, তখন ভগবানের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মারূপ অংশ হইতে যে নারদের উৎপত্তি হইয়াছে, তিনিও কি আর এই অদৃষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন? অদৃষ্ট ক্রমেই দিগ্‌ভ্রমে নারদ মূর্চ্ছিত হইয়া পাতাল-পথে পড়িয়া আছেন।

এইরূপ অনেকক্ষণ অচেতন অবস্থায় থাকিলে নারদের শরীরে সুশীতল সমীরণ সঞ্চালিত হইতে লাগিল; তাহাতেই তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল; জ্ঞান পাইয়া ভাবিলেন ভূপৃষ্ঠের ন্যায় মৃদুমন্দ মলয়ানিল কোথা হইতে আসিতেছে? ক্ষণপরে চক্ষু চাহিয়া তিনি দেখিলেন পবনদেব পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছেন; দেখিয়াই অধীরভাবে উঠিয়া বসিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! পবনদেব! বলুন, বলুন, আমি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি—কি বিভীষিকা দেখিয়াছি? কেন এত ভয়ানক দুর্গন্ধে আমি অস্থির হইয়াছি?" পবনদেব কহিলেন "ভয় কি নারদ! তুমি যে উত্তরদিকের পথ ছাড়িয়া 'ভূ র্ভুবঃ স্বঃ' এই ত্রিলোকের সর্ব্ব দক্ষিণাংশে পাতালের ঊর্দ্ধে ভূলোকের নিম্নে যমালয়ের পথে আসিয়া পড়িয়াছ; এস্থান হইতে যমালয় ত বেশী দূর নহে। বোধ হয় কলির কোন পাপীর প্রেতাত্মার পৈশাচিক দুর্গতি বা নরকস্থ নারকীগণের বিভীষিকাময় দুর্দ্দশা দেখিয়াই এত ভীত হইয়াছ এবং তত্রস্থ তীব্র পূতীগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছ! তাহাতে আর ভয় কি? আমি সুগন্ধে তোমায় আমোদিত করিতেছি এবং ভূলোকের পথ দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি।" নারদ কহিলেন "কই দেব! এখন ত আর সেই ভয়ানক দৃশ্যগুলি নাই! মুহূর্ত্তে সে দৃশ্য কোথায় অদৃশ্য হইল? কেবল সেই কূপটীকে মাত্রই দেখিতেছি; তাহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ বা দুর্গন্ধ কিছুই নাই; তাহার সেই ঘোরান্ধকারময় ধূমপুঞ্জ বা ভয়ানক ভয়ানক দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া এখন কোথায় লুকাইল? পরমেশের এ কি প্রকার প্রহেলিকা? যাহাই হউক দেব! আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?" পবন বলিলেন "আমি সেই ভগবানের আদেশে

যমরাজা ও চিত্রগুপ্তকে লইয়া আসিবার জন্য যমপুরী গিয়াছিলাম; প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে তোমার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তোমাকে বসিয়া বসিয়া ব্যজন করিতেছিলাম।”

নারদ কহিলেন “তবে যমরাজ ও চিত্রগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন না কেন?” পবন উত্তর করিলেন “তাঁহারা কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমার সঙ্গে আসিতে পারিলেন না; সভার নির্দ্দিষ্ট দিনে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন বলিয়াছেন”। নারদ তখন প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে, মৃদুগম্ভীর বচনে, চিন্তাকুল প্রাণে প্রাণের অন্তস্তল হইতে যেন এই কয়েকটী কথা পবনদেবকে বলিলেন—“যাহাই হউক দেব! আমার দিক্‌ভ্রম দূর করিয়া দিয়া, আমার ভয় ভাবনা ঘুচাইয়া এবং দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে দিব্য সুগন্ধ বিস্তার করিয়া প্রাণ-দানপূর্ব্বক আপনি আমায় আজ যে ঋণ-বন্ধনে বাঁধিলেন, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু—”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নারদ বিষম বিমর্ষ হইয়া বড়ই ভাবিতে লাগিলেন। পবন জিজ্ঞাসা করিলেন “কিন্তু কি নারদ? নীরবে কি ভাবিতেছ?” নারদ উত্তর করিলেন “ভাবিতেছি ভগবান—আর ভাবিতেছি তাঁহার সেই দুর্ভেদ্য চক্র!

পবন। কেন বল দেখি?

নারদ। সে দুঃখের কথা কত আর বলিব দেব?

পবন। তোমার আবার কি দুঃখ নারদ? তুমি যে দেব-দুর্ল্লভ ভগবচ্চরণ পাইয়াছ; আর তোমার দুঃখ কি?

নারদ। চরণ আর পাইলাম কই? মরণ হইলেই বাঁচিতাম; এত কালেও যে আমার উপর তাঁহার পরীক্ষা শেষ হইল না—সেই ত মহাদুঃখ! দেখুন দেব! প্রথমে নিজ দেহাংশ ব্রহ্মা হইতে আমার সৃষ্টি করিলেন; পরে আবার দাসীপুত্ররূপে পৃথিবীতে পাঠাইলেন; পুনরায় কল্পান্তে নারায়ণ নিশ্বাস সহ নিজ দেহ মধ্যে লইলেন; আবার বিশ্ব-সৃষ্টির সময়ে ইন্দ্রিয় হইতে আমাকে বাহির করিলেন। তাহার পর কতবার আমাকে স্ত্রীপুত্রসহ সংসারী করিয়া কত যাতনাই দিলেন—আবার উপবর্হন নাম দিয়া গন্ধর্ব্বকুলেও জন্মগ্রহণ করাইলেন—কতবার আমার কত দর্প চূর্ণ করিয়া কত পরীক্ষা করিলেন; তাহাতেও কি নিস্তার নাই? কলি-কালেও কি বিধিবিড়ম্বনায় বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল? ধিক্

আমাকে! আমি ত দর্প করিয়া কিছুই বলি নাই; যমালয়ে যাইতেও একেবারে অস্বীকার করি নাই; তাঁহার অনুমতিতে কোথায় যাইতে না পারি, এইরূপই বলিয়াছিলাম! তাই আমার কি এই প্রতিফল?—একেবারে নরকভোগ! যাহাই হউক, কপালের ফলাফল কপালেই আছে; কিন্তু এতকালেও যে সেই নারায়ণের মায়া কিছুই বুঝিলাম না, আমার অনুক্ষণ সেই ত অনুতাপ!

পবন। এরূপ বিলাপ তোমার নিতান্তই অসঙ্গত; দর্পহারী ভগবান সর্ব্ব সময়েই দর্পচূর্ণ করেন; অবশ্যই তোমার মনে একটু তম তখন হইয়াছিল; নতুবা কখনই তোমার এরূপ দুর্গতি হইত না। আরও দেখ, জগতের জীব যেখানে যিনি যত দর্পই করেন, সেখানেই তাঁহার দর্পচূর্ণ হয়। মানুষই হউক আর দেবতাই হউন, দর্পহারী সকলের দর্পই চূর্ণ করেন! অধিক কি, আপন দেহার্দ্ধ পরমা প্রকৃতির দর্পই যখন কতবার চূর্ণ করিয়াছেন, তখন আর অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য কি?

নারদ। জানিও সকল—বুঝিও সকল; আমার তমোভাবই যদি তিনি বুঝিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বের মত কলিতে এত আমার নিগ্রহ না করিয়া অভয়চরণের আশ্রিতকে অভয়বাণী দ্বারা উপদেশ দিলেও পারিতেন। তাই বলি হে দেব পবন—কত আর করিব জ্ঞাপন—যাহা তাঁর মনন—ক্রমেতে করুন সম্পাদন! আমি কিন্তু বড় জ্বালাতন!

পবন। কথায় কি কার্য্য সিদ্ধ হয়? তা যদি হইত, তবে আর ভগবান দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য বারম্বার অবতাররূপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতেন না; মনে করিলে কটাক্ষে সকলই সম্পন্ন করিতে পারিতেন। ভবের জীবকে আদর্শ দেখাইবার জন্যই ত তাঁহার মর্ত্ত্যে আগমন। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণের ফল যে শীঘ্র সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা কি তুমি জান না? তোমার ন্যায় মহাজ্ঞানী ভগবদ্ভক্তকে আমি আর কত বুঝাইব?

নারদ আর এ সকলের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া কেবল মাত্র কহিলেন, "দেখা যাবে—দেবসভায় দীননাথ কি বলেন।" পরে পবন দেবকে যমালয়ের এই পথে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর কাণ্ড তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, সকলই বিবৃত করিয়া কহিলেন, "এ সকলের ভাব কি? কে বা অই জিহ্বা বাহির করা বিষ্ঠা মাখান কামিনী? আর কাহারই বা অই হাস্তময় কাটা-

মুণ্ড ? এবং অন্যান্য ভয়ানক দৃশ্যগুলিই বা কি প্রকার ? এই সকলের রহস্য কিছু জানেন কি ?" পবন কহিলেন "আমি কি করিয়া জানিব ? দেব-সভায় যমরাজ ও চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই যাবতীয় রহস্য জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া পবনদেব নারদকে সঙ্গে লইয়া ভূলোকের পথ দেখাইয়া উভয়ে একত্রে ভূলোকে চলিলেন। এখন নারদের মনের বিষণ্ণতা বিস্তর বিদূরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু দর্পচূর্ণের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না ; চলিতে চলিতে চকিতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে হইতেছে—এ কেমন দর্পচূর্ণ ?

দেবতা বা দেবর্ষি—মহাত্মা বা মহর্ষি, বিরিঞ্চি বা বিরূপাক্ষ শচী বা সহস্রাক্ষ, সাবিত্রী বা সরস্বতী—প্রকৃতি বা পার্ব্বতী প্রভৃতি সকলের দর্পই যখন নারায়ণ দমন করেন, তখন তুচ্ছ মানব জীবনে মানুষ যে কেন দর্প করে, তাহা বুঝা যায় না। মানুষ! তোমার এত দর্প কেন ? দর্পের ভরে সর্পের মাথায়ও তোমার হাত দিতে ভয় নাই ! কেন বল দেখি ? মুখে ত অহঙ্কারের অনেক নিন্দা কর—গর্ব্ব সর্ব্বদোষের আকর বলিয়া থাক—শাস্ত্র গ্রন্থ বা ইতিহাস হইতে দর্পচূর্ণের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রচুর প্রমাণও প্রয়োগ কর—"নাহঙ্কারাৎ পরোরিপু." "অতি দর্পে হতা লঙ্কা" প্রভৃতি প্রচলিত নীতিবাক্যও উচ্চারণ কর, কিন্তু কার্য্যে ত কিছুই করিতে দেখা যায় না। সুখ সম্পদ বা শান্তি স্বাস্থ্যাদিতে সামান্য প্রাধান্য কেহ লাভ করিলেই মান্য গণ্য হইয়া অন্যান্যকে অগণ্য করিয়া ভিন্ন ভাব ধারণ করে—কেহ বা মাৎসর্য্যের মোহে মোহিত হইয়া এমন মহীমণ্ডলকেও মুষ্টিমেয় মৃত্তিকাপাত্র মাত্রই মনে করে—অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া অনেক অবতারই অন্ধজনকেও অন্নদানে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে—অনেক অন্তঃসারশূন্য গর্ব্বিত পুরুষ গর্ব্বের ভরে সর্ব্ব দ্রব্যেরই দোষ দর্শন করে ! আবার রমণীগণও "অতি বাড় বেড়ো না—ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে" প্রভৃতি প্রবাদবাক্য বলিয়া থাকে ; কিন্তু অলঙ্কারের অহঙ্কারে, রূপ যৌবনের গরবে বা অন্যপ্রকার দর্পে সদাই দর্পিত হয় ; এক নারীর অহঙ্কারে অন্য নারী তাহাকে 'ঠ্যাকারী' 'গ্যাদারী' বলিয়া মেয়েলী গালি দিয়াও থাকে ; কিন্তু নিজেই আবার সেই গজগামিনী গ্যাদায় ডগমগ হইয়া গহনা-গরবে গৌরব করে। সংসারের নরনারী—সবাই অহঙ্কারী ! মানুষ দেখিয়াও দেখে না—বুঝিয়াও বুঝে না ! আজ যেন তুমি দম্ভের ভরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দাপটে বেড়াইতেছ—আজ যেন তুমি মদমত্ত মাতঙ্গের মত

মদগর্ব্বে মেদিনী কাঁপাইয়া দিতেছ—আজ যেন তুমি তেজের জোরে জড় জগতকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতেছ—আজ যেন তুমি গর্ব্বিত বাক্যে ব্যথিত বক্ষে বেদনা দিয়া চক্ষের জলে সেই বক্ষ ভাসাইতেছ, কিন্তু কাল যে কি দিন আসিবে, কি হইবে—কিছু ভাবিয়াছ কি? আবার সেই অদৃষ্ট চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে যে কোথায় গিয়া পড়িবে, তাহা কিছু ঠিক রাখিয়াছ কি? তবে কেন এত গর্ব্ব? খর্ব্ব হইতে ত বিলম্ব ঘটে না! মাটীর মানুষ মাটীতেই মিশাইবে—এই মাটীর পুঁতুলের কি মাৎসর্য্য শোভা পায়? মাটীর জগতে মাটীর মানুষ মাটী হইয়া থাকাই উচিত নয় কি? অনর্থক কেন হও অহঙ্কার পূর্ণ, জান না কি পদে পদে হইবে—দর্পচূর্ণ!

সপ্তম অধ্যায়।

ভূলোক।

বসুমতীর গর্ভে বিষ্ণুক্ষেত্রে পবিত্র নৈমিষারণ্যে এক সাধু তপস্বীর আশ্রমে মূর্ত্তিমতী বসুমতী বসিয়া আছেন! জরাজীর্ণা সাধ্বী সতী সেই বসুমতী স্বীয় পতি পরমেশপার্শ্ব হইতে স্বস্থানে আসিয়া বসুমতী গর্ভে মূর্ত্তিমতী বসুমতী হইয়া সম্প্রতি এই তপস্বীর প্রতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সাধুও আনন্দে সে সকলের যথার্থ উত্তর দান করিতেছেন। বিবিধ বিষয়ে এইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর সাধু কহিলেন "দেবি! আপনি যে পাপের অসহনীয় অত্যাচারে স্বীয় দুঃখ-কাহিনী শুনাইতে স্বর্গে গিয়াছিলেন এবং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য দেবগণ যে শশব্যস্ত হইয়াছেন, সে সমস্তই আমি পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম"।

বসুমতী বিস্মিত হইয়া কহিলেন "তুমি কি করিয়া জানিলে?"

সাধু। আমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া পুরীর জগন্নাথজী ও লঙ্কার রাক্ষস রাজর্ষি বিভীষণের কথোপকথন প্রসঙ্গে সে সকল শুনিয়াছিলাম। পূর্ব্ব হইতেই বিভীষণ যখন যোগবলে জানিয়া জগন্নাথজীকে জানাইতে আসিয়াছিলেন, তখন ঠাকুর তাঁহাকে বসুন্ধরার ব্যক্তব্য বিষয় বিবৃত করিলেন এবং দেবীর দুঃখ দূর করিবার জন্য জগদীশ যে যে কার্য্য ধার্য্য করিয়া-

ছেন সাক্ষাতে সে সকলই শুনাইলেন; বিভীষণ বিষম ব্যাপার বিলোকন করিতে বিলম্ব না করিয়া বিমান-পথে যাত্রা করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদের নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া জগন্নাথজীর আদেশে স্বর্গ প্রদেশে পূর্ব্বেই গমন করিয়াছেন।

বসুমতী। বিভীষণের অসময়ে শ্রীক্ষেত্রে গমন প্রভৃতি তুমি বা কিরূপে জানিলে?

সাধু। আমিও যোগবলে জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুরীর পথে ছুটিয়াছিলাম।

বসুমতী। ভাল কথা, তুমি শ্রীক্ষেত্রে গমনকালে পুরীর পথে তোমার সেই শিষ্যা ও আমার সেই বড় সাধের স্নেহের সামগ্রী বনবাসিনীকে দেখিয়া আসিয়াছিলে কি?

সাধু। দেব-দর্শনে গিয়া সেই দেবী মূর্ত্তিকেও দেখিয়া আসিয়াছি বৈ কি! স্বর্গের এই বিষম ব্যাপারের বিষয়ও বলিয়া আসিয়াছি; পরে সে আমাকে কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিয়াছিল, কিন্তু ব্যস্তুতাবশতঃ তখন তাহা পারি নাই; পাছে দেবর্ষি আসিয়া দেখা না পান, তাই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি ও সময় মতে সংবাদ দিয়া তাহাকে আশ্রমে আনাইয়া সে সকল বুঝাইব বলিয়াছি।

বসুমতী। এই যাত্রাতেই কেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলে না?

সাধু। তাহা হইলে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়? এখন তাহাকে এখানে আনিলে সে যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে।

তখন বসুমতী "বুঝিয়াছি" বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাধু আবার কহিলেন "বলুন দেখি দেবি! দেবর্ষি নারদ পাতাল হইতে ভূলোকে আসিয়া প্রথমে কোথায় যাইবেন? এখন এই কলিকালে কোথায় বা কাহাকে খুঁজিয়া পাইবেন? এখন যে নূতন নূতন নানা দেশ নানা নগর নানা দিকে! কোথায় কোন্ দিকে কখন যাইবেন কিছু বলিতে পারেন কি?" বসুমতী কহিলেন "কেন পারিব না? আমার পৃষ্ঠে ভূলোক যত দেশ বা যত দ্বীপই হউক, জম্বুদ্বীপই এক মাত্র আদি জানিবে। এই জম্বুদ্বীপের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষই ভূলোক! ভূলোকই ভারতবর্ষ! অন্যান্য নূতন স্থান ভগবদিচ্ছায় আমি বহন করিতেছি বলিয়াই নাম মাত্র ভূলোক! কল্পান্তে আমি জলমগ্ন হইলে ভগবান বরাহরূপে

হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া যখন জল হইতে আমাকে উদ্ধার করেন, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ মধুকৈটভের মেদে পরিপূর্ণ ছিল! সমভূমি কোথায়ও ছিল না—পর্ব্বতাদির দ্বারা সকল স্থলই উচ্চ নীচ ছিল, কোন বিভাগ বা খণ্ড কিছুই ছিল না। মহাত্মা ধ্রুবের বংশোদ্ভব বেণতনয় পৃথুরূপে ভগবান আমার অধিকাংশ স্থল সমতল করিয়া কৃষিবাণিজ্যাদির সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন এবং তিনিই আমাকে দোহনপূর্ব্বক 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' করিয়া আমাকে ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। সেই পৃথু হইতেই অভাগিনীর এক নাম পৃথিবী হইয়াছে। আবার মনুতনয় প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রের দ্বারা যে সাতটী সুগভীর প্রকাণ্ড খাত হইয়া যায়, তাহাতে তিনি সেই সপ্ত খাত বা সাগর দ্বারা জলের আস্বাদ অনুসারে আমাকে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধী, দুগ্ধ ও জল নামক সপ্ত সমুদ্রে জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর নামে সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত করেন। এক একটী দ্বীপ এক একটী সাগরে পরিবেষ্টিত; প্রিয়ব্রতের সপ্ত পুত্র এই সপ্ত দ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। জম্বুদ্বীপ এই সপ্তদ্বীপের শ্রেষ্ঠ! জম্বুদ্বীপই আমি! প্রিয়ব্রত-পুত্র আগ্নীধ্র এই জম্বুদ্বীপাধিপতি হইয়া ইহাকে নয়টী বর্ষে বিভাগ করেন। তাঁহার নাভি প্রভৃতি নয় তনয়ই নিজ নিজ নামে জম্বুদ্বীপের এক এক বর্ষ অধিকার করেন; তন্মধ্যে নাভির বর্ষ ভারতবর্ষই নয়টী বর্ষের শ্রেষ্ঠ! ভারতবর্ষই জম্বুদ্বীপ বা সপ্তদ্বীপেরই কর্ম্মক্ষেত্র! নাভির পৌত্র সেই বিখ্যাত জড়ভরত হইতেই নাভির বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। অন্যান্য ছয়টী দ্বীপ ও তন্মধ্যস্থ বর্ষগুলির অধিবাসীগণের অধিকাংশই কর্ম্মশূন্য! জম্বুদ্বীপের অন্য অষ্টবর্ষবাসীগণও নিষ্কাম! এই সপ্তসাগরে বেষ্টিত, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর বা আমার একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্রই **ভারতবর্ষ।**

ভারতবাসীগণই কর্ম্মময়! স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই তাহারা ইহ-পরকালে ফলভোগ করে। ভারতবর্ষই ভগবানের লীলাভূমি! জম্বুদ্বীপের অন্যান্য বর্ষ পুণ্যাত্মাগণের স্বর্গ-পথের বিরাম স্থান মাত্র! এখন কলিকালেও নূতন দেশ মহাদেশ বা দ্বীপ উপদ্বীপাদি যতই হউক, ভারতবর্ষ অপেক্ষা কোনস্থানই শ্রেষ্ঠ নহে। এই ভারতবর্ষেই বার মাস পর্য্যায়ক্রমে ষড়ঋতু বিরাজিত; এই ভারতবর্ষেই সকল বিষয়ের সম্পূর্ণতা আছে; এই ভারতবর্ষই ভগবানের আদর্শভূমি মর্ত্ত্যভূমি—এখানেই তিনি বার বার অবতাররূপে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন ও করিবেন। এই ভারতের ভাষাই মূলভাষা! ভারতের দেব-নাগর বা বঙ্গাক্ষরে আধুনিক সকল দেশের সর্ব্বভাষাই বানান করিয়া লেখা যায়; কিন্তু আর কোন দেশের কোন অক্ষরেই ভারতীয় ভাষা স্পষ্ট লেখা যায় না। ভারতের কোন কোন অক্ষর অন্য জাতি আজিও উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভারতবর্ষ যে আর্য্যজাতির বাসস্থান, আধুনিক অন্যান্য দেশের অনেক জাতি সেই আর্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। স্বর্গের দেবগণও বলিয়া থাকেন যে, বহুপুণ্যফলে এই ভারতবর্ষে জীবের জন্ম হয়; তাঁহারাও ভারতে জন্মগ্রহণ প্রার্থনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ভারতীয় ধর্ম্মে মুক্তির পথও সহজে পরিষ্কার হয়; ভারতবাসীগণ স্বধর্ম্মে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে তাহাদের জন্য স্বর্গদ্বার শীঘ্রই উন্মুক্ত হয়। এমন সনাতন ধর্ম্ম স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করে, ইহাই ত আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ! আরও দেখ এখন আধুনিক অন্যান্য দেশে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা অন্য কিছু যাহা নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে, বহুপূর্ব্বে ভারতেই সে সকল ছিল; যুগধর্ম্মে কালবশে সে সকল এখন এখানে লুপ্তপ্রায়! ভারতে যাহা নাই—তাহা কোথায়ও নাই! তাই আবার বলি—ভারতবর্ষই ভূলোক, ভূলোকই ভারতবর্ষ! নারদ এখানেই আসিবেন; কলিতে বিধর্ম্মীর দেশে কেন তিনি যাইবেন?"

সাধু সমস্তই শুনিয়া কহিলেন "তবে কি অন্যান্য দেশের প্রতি সেই দয়াময়ের লক্ষ্য নাই?" বসুমতী কহিলেন, "লক্ষ্য থাকিবে না কেন? যিনিই এখন নূতন নূতন দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনিই সেই সেই দেশবাসীর জন্য স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আমিও তাঁহার আদেশে আমার ভারতের সহিত তাহাদেরও বহন করিতেছি। তবে সে সকল দেশের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা সুখ দুঃখের সহিত কিন্তু আমার কোন সম্বন্ধই নাই! তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম বা মুক্তিমোক্ষ সম্বন্ধে নিরূপিত পন্থাগুলি পরে জানিতে পারিবে। এখন ভারতবাসীর ধর্ম্মে মতি হইলে—ভারতের দুঃখ দূর হইলে—ভারতে পাপের প্রবল অত্যাচার অন্তর্হিত হইলেই আমারও বৃদ্ধ বয়সের এই দারুণ যাতনা দূরীভূত হয়। আদিতে ভারত লইয়াই আমি সৃষ্ট হইয়াছি; তাই এই ভারতের বা ভূলোকের অথবা এই মর্ত্ত্যের পাপ দূর করিবার জন্যই আমি দেবধামে গিয়াছিলাম।" সাধু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমেরিকা নামক মহাদেশটী আপনার ভূপৃষ্ঠের

অন্তর্গত? না পাতালের মধ্যবর্ত্তী? আর প্রকৃতই কি কলম্বস নামক এক ব্যক্তি ইহার আবিষ্কারক? পূর্ব্বে কি এদেশবাসীগণ ইহার অস্তিত্ব অবগত ছিল না?" বসুমতীও পুনরায় উত্তর করিলেন, "থাকিবে না কেন? পূর্ব্বে আমেরিকা পাতালেরই অংশবিশেষ ছিল; সেকালে সেখানে মহীরাবণের পুরী নির্ম্মিত ছিল এবং অন্যান্য অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরই বাস ছিল। পরে কলিতে বেরিং নামক যে প্রণালী দেখা যায়, তাহার মধ্যে সেণ্ট লরেন্স নামক দ্বীপটীর সৃষ্টি হওয়ায় এসিয়া হইতে আমেরিকা অতি নিকটই হইয়াছে; তাই ভগবদিচ্ছায় আমেরিকাকে আমার ভূপৃষ্ঠেরই অন্তর্গত করিয়া লইয়াছি—পুরাতন অঙ্গে নূতন অঙ্গ মিশাইয়া লইয়াছি। যখন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া এই সনাতন ধর্ম্মকে নূতন আকারে দেশে দেশে প্রচার করিয়াছিলেন, তখন সেই বুদ্ধের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রচারকগণ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া আমেরিকায়ও এই পথ দিয়া গিয়াছিল; তথায় এখনকার মেক্সিকো নামক দেশে এখনও বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে! তথাকার লোক সকল সেই মূর্ত্তিকে এখন 'শাকা' বলিয়া থাকে। তাহার পরেও কিছুদিন এদেশবাসীগণের তথায় যাতায়াত ছিল; এদেশের অনেক ব্যক্তি গিয়া তখন তথায় বাসও করিয়াছিল; এদেশের অনেক জন্তুর ছবিই আমেরিকার পুরাতন রাশীচক্রমধ্যে দেখিতে পাইবে। তাহার পর কিছুকাল আর কাহারও তথায় গতায়াত না থাকায় অধিকাংশ জগতবাসীরই অই দেশ অজানিত ছিল; এই সময় কলম্বস প্রথমে তথায় যাওয়াতেই সেই ব্যক্তি ইহার আবিষ্কারক বলিয়া বিখ্যাত হইল। নতুবা কোথায় প্রায় এক হাজার চারি শত বৎসর হইল, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণের আমেরিকা যাত্রা; আর কোথায় কেবলমাত্র চারিশত বৎসর হইল, কলম্বসের আবিষ্কার! অধিক আর কি বলিব—ইহাতেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে।"

তপস্বী ও বসুমতীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে নারদ ও পবন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু সসম্ভ্রমে সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিলেন। নারদ আসন পরিগ্রহ করিয়াই বসুমতীকে বলিলেন "কই দেবি! কই তোমার সেই ইক্ষুরসোদ-সাগরে বেষ্টিত প্লক্ষদ্বীপ? সেই সুরাজল সমুদ্রে বেষ্টিত শাল্মলদ্বীপ? সেই ঘৃত জলধিতে বেষ্টিত কুশদ্বীপ? সেই দুগ্ধ বা ক্ষীর সমুদ্রে বেষ্টিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ? সেই দধি সমুদ্রে বেষ্টিত শাকদ্বীপ এবং সেই স্বাদুজল-সাগরে বেষ্টিত পুষ্করদ্বীপ? কিছুই

যে দেখিতে পাইলাম না"। বসুমতী কহিলেন "কি আর দেখিতে পাইবে নারদ? সে সকল কি আর এখন আছে? সে সকল দ্বীপের নানাবর্ণে ও নানা জাতিতে বিভক্ত নিষ্কাম অধিবাসীগণ কি আর এখন আছে? তাহাদের সেই অগ্নি, জল, বায়ু বা সূর্য্যপূজা আর কি এখন দেখা যায়? এখন সেই সকল দ্বীপে ও তাহার পার্শ্বে কত কত দেশ, কত কত নগর হওয়াতে নূতনভাবে আমার ভূপৃষ্ঠের বিভাগ হইয়াছে। আসিয়া ইয়ুরোপ ও আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশে এবং তাহার মধ্যস্থ নানা দেশে এখন সেই পৃথুর পৃথিবী বিভক্ত হইয়াছে। আর কি এখন চিনিবার যো আছে? লবণসাগরে বেষ্টিত জম্বুদ্বীপের অন্যান্য অষ্টবর্ষই এখন সুমেরু পর্ব্বতের চারিধারে তুষার মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে! কেবল এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ বা আমিই অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পাপের অত্যাচারে জর জর হইয়া রহিয়াছি!"

নারদ বসুমতীকে আর কিছুই না বলিয়া সাধুকে কহিলেন "তুমি দেবসভার বিষয় বসুমতীর নিকট অবশ্যই শুনিয়াছ কিম্বা যোগবলে জানিতেও পারিয়াছ; যাহাই হউক তোমাকে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই! সভার নির্দ্দিষ্ট দিনে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইও।" সাধু কহিলেন "ভারতের বাহিরে আর কোন স্থানে যাইবেন কি?"

নারদ। আর কোথায় যাইব? ভারতবর্ষই 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই ত্রিলোকের মধ্যে প্রথম লোক—ভূলোক!

সাধু। লঙ্কায় যাইবেন কি? বিভীষণ ত পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছেন।

নারদ। তবু একবার ঘুরিয়া যাইতে হইবে! এক্ষণে বড় ব্যস্ত আছি, আপাততঃ বিদায় দাও; পরে একবার তোমার সহিত সাক্ষাতের আবশ্যক হইবে।

সাধু। একবার কেন?—কতবার!—ভুলিতে কি পারিবেন?

নারদ। তোমাকে কি ভুলিতে পারি? তুমি যে আমার প্রাণের শিষ্য—প্রাণের সখা! এস এস প্রাণ ভরিয়া একবার আলিঙ্গন করি।

এই বলিয়া নারদ সাধুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বসুমতীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে বিদায় হইলেন; পবনদেবও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রে চলিলেন সাধু সকলকেই প্রণামপূর্ব্বক বিদায় দিয়া একাকী কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পাঠক! গ্রন্থারম্ভে এই সাধুকেই সেই সন্ন্যাসীরূপে

পুরীর পথে সেই বনবাসিনীর কুটীরে দেখিয়াছিলেন; ইনি একজন মহা-পুরুষ—পরে সমস্তই জানিতে পারিবেন।

সাধু সেই সকল কথোপকথন স্মরণ করিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলেন ভারতবর্ষই—**ভূলোক!**

অষ্টম অধ্যায়।

গোলোক।

নারদ পবন ও বসুমতী তিনজনে ভারতের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, কর্ণাট, দ্রাবিড় এবং এই সকলের মধ্যবর্ত্তী যে যে স্থানে যাইবার আবশ্যক, সে সকল স্থল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দেব-সভার কথা ভূলোকে ঘোষণা করিয়া দিলেন। পরে বসুমতীর নিকট বিদায় লইয়া নারদ ও পবন ভুবলোকাভিমুখে চলিলেন।

পৃথিবীর ঊর্দ্ধে সূর্য্যের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত ভুব লোক; এই স্থানে সিদ্ধ বিদ্যাধর ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করেন। মেঘের স্থিতি, উৎপত্তি ও চলাচল এই লোকেই হইয়া থাকে। ইহার একদিকে পরীস্থান! সহস্র সহস্র পরীসকল ফুলময়ী সাজে ফুলের বিছানায় বসিয়া আছে। তাহাদের সৌন্দর্য্যের ছটায় ভুবলোক আলোকিত! দেবতা ও গন্ধর্ব্বাদির মধ্যে অনেক নায়ক নায়িকার মধুময় সম্মিলন ইহারাই করিয়া দিয়া থাকে। ত্রিলোকের সর্ব্বস্থানেই শূন্যপথে পরীগণ পরিভ্রমণ করে! ভুবলোকের অপর দিকে অপ্সরীগণের বাসস্থান; কিন্তু এখানে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না—তাহারা স্বর্লোকে সর্ব্বদাই সুখে সময় কাটায়! ব্রহ্মার হাস্য হইতেই অপ্সরীগণের সৃষ্টি! এমন অতুলনীয় অসাধারণ সৌন্দর্য্য বিশ্বমাঝে আর কোথাও নাই! বিশ্ব-সংসারস্থ সমুদয় শোভার সামগ্রীর সার অংশই অপ্সরী অঙ্গে বিরাজিত! অপ্সরীগণের অতুল রূপরাশীর তুলনা কোথাও নাই! যেখানে দেবী দানবী বা মানবী মধ্যে কাহারও রূপলাবণ্যের তুলনায় লোকে পরী বা অপ্সরী-গণের উদাহরণ দেয়, সেখানে তাহাদের আর সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথায়?

অপ্সরীগণের অনেকেই অতুলনীয় রূপরাশীতে ও অস্বাভাবিক গুণগ্রামে দেবধামে দেবতা-পার্শ্বেও স্থান পাইয়াছে।

নারদ ও পবন ভুবলোকে উঠিয়া তথাকার অপ্সর, কিন্নর, সিদ্ধবিদ্যাধর, দানব, দৈত্য ও ভূত গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে যাহাদের নিকট যাইবার আবশ্যক, সকলেরই সহিত সাক্ষাত করিলেন; পরে পরীস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক অপ্সরীগণের অপরূপ রূপ অবলোকন করিতে ও তাহাদের সুকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে অপ্সরী-আবাসে আগমন করিলেন। তাহাদের সেই দেবতা-বাঞ্ছিত দিব্য দেহের দিব্য রূপ দর্শন দৈববশে দেবর্ষির অদৃষ্টে ঘটিল না; কারণ তাহাদের মধ্যে যাহারা বিলাস-বিভ্রমে বিভোরা বা নৃত্য গীতাদিতে নিপুণা, তাহারা সকলেই স্বর্লোকে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছে। যদিও অপ্সরীগণের অপরূপ রূপযৌবন, বিশ্ববিমোহন বিলাস বিভ্রম, হাস্যমাখা হাবভাব, রঙ্গময় অঙ্গভঙ্গী ও শক্তিশেলস্বরূপ সুতীক্ষ্ণ স্মর-শরসদৃশ সুচারু চাহনি দেখিয়া অনেক জিতেন্দ্রিয় দেবপুরুষ বা মহাপুরুষেরও ইন্দ্রিয় সংযত করা সুকঠিন, কিন্তু তাহারা নিজে নিজে আপন ইন্দ্রিয় বিলক্ষণই বশীভূত রাখিয়াছে। যদিও এই বামাগণ বৈজয়ন্তীর বিলাসিনী বারাঙ্গনা বলিয়াই বিখ্যাত, তবুও তাহারা সুরপুরের পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি! পার্থিব পঙ্কিল প্রেমের ছায়ামাত্রও তাহাদের হৃদয়ে নাই! যখনই কোন সূত্রে সেই প্রেমের উপচ্ছায়া তাহাদের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই তাহারা শাপভ্রষ্ট হইয়া মহীমণ্ডলে মানবী বা দানবীরূপে জন্মগ্রহণ করে; পরে বহুক্লেশে বহুসাধনায় বহুদিনে আবার তাহাদের উদ্ধার হয়! তাই তাহাদের বক্ষে গিরিশৃঙ্গ—প্রাণে ভক্তিভৃঙ্গ; চক্ষে কাম-কটাক্ষ—হৃদয়ে সুখমোক্ষ; অধরে মধুর হাসি—অন্তরে অমৃতরাশি; দেহে দুর্দ্দান্ত যৌবন—মনে শান্তি নিকেতন; বাহিরে বিলাস বিভ্রম—ভিতরে পুণ্যের আশ্রম! তাই দেবগণ সেই বিশ্বরূপের আদর্শরূপ অপ্সরীরূপ সর্ব্বদাই সন্দর্শন করেন—তাই সেই সুন্দরীদিগের সুন্দর শোভা দেখিয়া সুন্দরের সুন্দর শ্যাম সুন্দরকে সদাই স্মরণ করেন—তাই তাহাদের শ্রুতি সুখকর সুরম্য কণ্ঠস্বরের সুমধুর সঙ্গীত সততই শ্রবণ করেন। দেবর্ষি নারদ ভুবলোকে অপ্সরীগণের আবাসে আসিয়াও তাহাদের রূপলাবণ্য দেখিতে বা কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন না—জলাশয়ে আসিয়াও তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটিল না। তখন পবন সহ তিনি সেই লোক হইতে তদুপরিস্থ স্বর্লোকে উঠিলেন।

সূর্য্যের ঊর্দ্ধ হইতে ধ্রুবলোকের নিম্ন পর্য্যন্ত স্বর্লোক! লোকে যে লোককে স্বর্গধাম বলে, সেই লোকই এই ধাম; স্বর্লোকই স্বর্গধাম! বিশ্বের সৃষ্টি সময়ে সুবর্ণময় অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রথমে দ্যুলোক ও ভূলোক এই দুই লোক হয়; দ্যুলোকে—ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক তপলোক ও সত্যলোক এই ছয় লোক উপর্য্যুপরি স্থাপিত! নিম্নে ভূলোকে—কেবলমাত্র এই এক লোক—ভূলোক! এই সপ্তলোকের নিম্নের শেষ লোক ভূলোকের নিম্নেই পাতালাদি আর সাত লোক পর পর বিরাজিত! সচরাচর সকলে এই চতুর্দ্দশ ভুবনের ঊর্দ্ধের ছয় লোককে স্বর্গ, ভূলোককে মর্ত্ত্য এবং তন্নিম্নস্থ পাতালাদি সপ্তলোককে পাতাল বলিয়া থাকে। এইজন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালকেই লোকে ত্রিভুবন বলিয়া থাকে; এই গ্রন্থও এই ত্রিভুবন লইয়া তিন পর্ব্বে বিভক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কেবল লৌকিক কল্পনামাত্র! প্রকৃতপক্ষে ত্রিভুবন, ত্রিলোক বা ত্রৈলোক্য বলিয়া যে কথাটী আছে, তাহা এই স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল লইয়া নহে। পাতাল প্রদেশে যে সপ্তলোক আছে, সেগুলি ত ভূলোকেরই নীচে; সুতরাং ভূলোক বলিলে পাতাল সমেতই বুঝায়! পাতাল সহিত এই ভূলোক, তাহার ঊর্দ্ধে সূর্য্যের নিম্ন পর্য্যন্ত ভুবর্লোক এবং তাহার ঊর্দ্ধে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্লোক, এই তিন লোকই ত্রিভুবন বা ত্রিলোক বলিয়া উক্ত হয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই যুগ-চতুষ্টয় কাটিয়া গেলে ব্রহ্মার যে এক দিন হয়, সেই দিনকে কল্প বলে, কল্পে কল্পে এই ত্রিলোকের নাশ হয় এবং কল্পে কল্পে ইহার নূতন সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এই ত্রিলোকের অধিবাসীগণেরই জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে; কেবল ঈশ্বরের অংশ-সম্ভূত স্বর্লোকবাসী দেবগণ এবং তাঁহাদেরই আশ্রিত প্রধান প্রধান সহচর সহচরীগণ কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত পরমায়ু পাইয়া থাকেন। পরে ত্রিলোকনাশের সময় তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া যান; আবার নূতন সৃষ্টির সময় আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভুবর্লোকবাসীর পরমায়ু তদপেক্ষা অল্প; কিন্তু ভূলোকবাসীর পরমায়ু অত্যন্তই অল্প—আবার কলিতে এখন যেমন ঘটিতেছে, তাহা সকলে স্বচক্ষে সর্ব্বদাই দেখিতেছেন; তাহার বেশী বর্ণনা এখন নিষ্প্রয়োজন! সেই জন্যই ত বসুমতীর এত আয়োজন!

এই স্বর্লোকই স্বর্গধাম! ইহাই বৈতরণীর পর পারে স্থিত! বসুমতী বহুকষ্টে বৈতরণী পার হইয়া এই স্বর্গদ্বারেই নারদ ও দেবগণের দেখা

পাইয়াছিলেন। এখানেই গ্রহ নক্ষত্রগণের স্থিতি! এখানেই ইন্দ্রাদি দেবগণের বসতি! ইন্দ্র, বরুণ, পবন ও অন্যান্য দেব দেবীগণ এই লোকেই এক এক বিভাগে এক এক পুরীতে বিরাজিত আছেন। অত্রস্থ সমুদায় বিভাগ মধ্যে অমরাবতী ধামই শ্রেষ্ঠ! সমুদায় উদ্যান মধ্যে নন্দন কাননই রমণীয়। সমুদায় পুরী মধ্যে দেবেন্দ্র ইন্দ্রের পুরীই প্রধান! সমুদায় সুন্দরীগণের মধ্যে শচী দেবীই রমণীরত্ন! সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে পারিজাতই সার সামগ্রী! নন্দনকাননের মধ্যস্থলেই প্রধান তরু পারিজাত। এই তরু অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত রক্ষিত; পাছে পুষ্পের অপচয় হয়, এই জন্ত ইহার চতুর্দ্দিকে প্রহরীগণ অনুক্ষণ পরিভ্রমণ করিতেছে! একবার এই পারিজাত হরণের হুলস্থূল ব্যাপ্যারে ব্রহ্মাণ্ড অস্থির হইয়াছিল—বজ্র, হল ও সুদর্শন ত্রি-অস্ত্রই একত্র মিশিয়াছিল—শচীপতিকে স্বয়ং সত্যভামাপতি এবং বলদেবের সহিতও সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই পারিজাতের সুষমাময় সৌন্দর্য্যে স্বর্লোক আলোকিত এবং ইহার দিগন্তব্যাপী সৌগন্ধে সহস্র যোজন আমোদিত! নারদ নরকের নিদারুণ দুর্গন্ধের পরে পুনরায় পারিজাতের পরিমল পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন; এখন যেখানে এই শোভাময় ফুলের শোভা আরও শোভাময় দেখায়, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন! সে আর কোথায়? সেই ইন্দ্রালয়! নন্দনোদ্যানবেষ্টিত অমরাবতীধামে এই ইন্দ্রালয়! ইহারই বা তুলনা কোথায়? কথায় বলে—যেন ইন্দ্রপুরী! সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা সুরম্য প্রাসাদ, সর্ব্বোচ্চ অট্টালীকা, সুসজ্জিত নাট্যশালা বা কোন শোভাময় স্থান সন্দর্শন করিলেই সকলে শচীপতির শোভাময় সদনের সহিতই সে সকলের তুলনা দেয়; আর কি কোথাও ইহার তুলনা আছে? বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত এমন পুরী বিশ্বমাঝে কোথাও নাই! নারদ দেখিলেন বৈদূর্য্যাদি বিবিধ মণিমণ্ডিত স্বর্ণের সিংহাসনে শচীপতি, বামে শচীসহ উপবিষ্ট আছেন; উভয়েরই গলদেশে পারিজাত মালা দোদুল্যমান! উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরীগণও তাঁহাদের চারিপার্শ্বে পারিজাতের হার গলে দিয়া—সেই ফুটন্ত ফুলের সাজে ফুলময়ী সাজিয়া নৃত্য করিতেছে এবং সহস্রাক্ষের দিকে কটাক্ষ বিক্ষেপপূর্ব্বক কোকিলকণ্ঠে কণ্ঠসুধা বর্ষণ করিতেছে! চিরবসন্তের মারুত হিল্লোল পারিজাতের সৌরভসহ সেই সঙ্গীতসুধা শত স্থলে বিস্তার করিতেছে; নারদ অপ্সরী-আবাসে গিয়াও যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এখন অন্তরালে থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই সঙ্গীত

শুনিয়া পিপাসিত প্রাণ পরিতৃপ্ত করিলেন এবং ভাবিলেন প্রকৃতই পারিজাতের প্রকৃত শোভা এখানেই হয়! তিনি শুনিলেন তাহারা গায়িতেছে—

মধুরে মধুর, কিবা সুমধুর সুখের সদন!
সুখের আকর, সুখের সাগর স্বরগ-ভবন!
মাধুরীতে ভরা মধু, তুমি হে পরাণ-বঁধু!
বামে তব শচী-মধু, মধুতে মগন!
আদরে চিবুক ধ'রে, মাতোয়ারা প্রেমভরে,
বাঁধাবাঁধি প্রেমডোরে, যুগল মিলন!
রাজা রাণী দুই জনে, মিশামিশি মনে মনে,
করিতেছ প্রাণপণে, প্রেম-আলাপন!
মন বাঁধা প্রাণ বাঁধা, বিষম গোলক-ধাঁধাঁ,
প্রেমে হাসা প্রেমে কাঁদা, পীরিতি কেমন!
রাখিতে প্রেমের মান, ধরি সুমধুর তান,
গাহিব প্রেমের গান, জুড়াবে জীবন!

সঙ্গীতটী সমাপ্ত হইবামাত্র সেই সঙ্গে সঙ্গেই সুন্দরীগণ আবার আরম্ভ করিল—

মনের মাঝারে, প্রেমের বাজারে, প্রেমের মাধুরী ক্ষরে,
প্রেম অনুরাগে, পীরিতি সোহাগে প্রেমের অমিয় ঝরে।
প্রেমের আলোকে প্রেমের ছায়া,
প্রেমের সংসারে প্রেমের মায়া,
প্রেমিক যে জন, বুঝিতে পারে!
প্রেমের কটাক্ষে প্রেমের আঁখি,
প্রেমের পিঞ্জরে প্রেমের পাখী,
প্রেমিক যে জন, ভুলায় তারে!
প্রেমের শয়নে প্রেমের সুখ,
প্রেমের স্বপনে প্রেমের মুখ,
প্রেমিক যে জন, স্মরণ করে!

প্রেমের কাননে প্রেমের ফুল,
প্রেমের তরুতে প্রেমের মূল,
প্রেমিক যে জন, হরণ করে !
প্রেমের নেশাতে প্রেমের ঘোর,
প্রেমের আবাসে প্রেমের চোর,
প্রেমিক যে জন, পলায় পরে !
প্রেমের শিকলে প্রেমের ফাঁদ,
প্রেমের আকাশে প্রেমের চাঁদ,
প্রেমিক যে জন, সদাই ধরে !
প্রেমের কণ্ঠেতে প্রেমের তান,
প্রেমের সঙ্গীতে প্রেমের গান,
প্রেমিক যে জন, আলাপ করে !
প্রেমের পাগলে প্রেমের ছিট,
প্রেমের অনলে প্রেমের কীট,
প্রেমিক যে জন, পুড়িয়ে মরে !
প্রেমের অধরে প্রেমের হাসি,
প্রেমের কুহকে প্রেমের ফাঁসী,
প্রেমিক যে জন, গলায় পরে !
প্রেমের তরঙ্গে প্রেমের জল,
প্রেমের সাগরে প্রেমের তল,
প্রেমিক যে জন, ডুবিয়ে মরে !

অপ্সরীগণের এই প্রেমের গান শেষ হইলেই শচীপতি সিংহাসন হইতে উঠিলেন। দেবরাজ দেবসভার দিন সংক্ষেপ দেখিয়া সভাতল সুসজ্জিত করিতে সদাই ব্যস্ত; সুন্দরীসমূহের সঙ্গীত-সুধা পানে সময়াতিবাহিত না করিয়া সত্বর সিংহদ্বারে আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, দেবর্ষি নারদ হাস্যমুখে অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়াই দেবেন্দ্র কহিলেন, "কোথা হইতে কখন আসিয়াছ নারদ ?" দেবর্ষি তখন আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত বাসবকে বর্ণন পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দেবেন্দ্র তাঁহাকে কিছুকাল বিশ্রামের জন্য

অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "জানি, তুমি যোগবলে আত্মামাত্র অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্তে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে কোন ক্লেশই অনুভব কর না, কিন্তু ক্ষণকাল বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক নহে কি?" নারদ কহিলেন, "আবশ্যক বা অনাবশ্যক অবশ্য কিছুই বুঝি না; তবে বোধ হয় বিধাতা বিরাম-সুখ ভোগ এই ভাগ্যে লিখেন নাই!" ইন্দ্র আর তাঁহাকে বাধা না দিয়া বিদায় দিলেন। নারদও হাসিতে হাসিতে তথা হইতে বাহির হইলেন।

স্বর্লোকে আসিয়া ইতিপূর্ব্বেই পবন স্বভবনে গমন করিয়াছেন, নারদ পবনভবনে গিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্লোকবাসী সকলকে সভার বিষয় বলিলেন; পরে এই স্বর্লোকে সূর্য্যের উত্তরদিকস্থ দেব-পথ দিয়া সেই পথের উত্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডলে গমন করিলেন। পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে আমরা যে সাতটী নক্ষত্র একত্র বদ্ধ দেখিতে পাই, তাঁহারাই মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও ভৃগু এই সপ্ত-ঋষি! তাঁহারা একত্র একস্থানে আছেন বলিয়া এই স্থানকে সপ্তর্ষি-মণ্ডল কহে। নারদ এই সপ্তর্ষির সহিত সাক্ষাত করিয়া সমস্ত জানাইয়া ইহার উপরিস্থ ধ্রুবলোকে গমন করিলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্দ্ধেই ধ্রুবলোক! মহাত্মা মনুর পৌত্র ধ্রুব বিমাতৃতাড়নায় পিতা উত্তানপাদের ক্রোড়চ্যুত হইয়া শৈশবে যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যফলেই পরম পুরুষ স্বর্গেরও ঊর্দ্ধে উত্তরভাগে ধ্রুবের জন্য এই ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ধ্রুবলোকের সুষমাশোভা স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ! এই শ্রেষ্ঠ লোকে শোভাময় সিংহাসনে মহাত্মা ধ্রুব বিরাজিত আছেন। নারদ তথায় উপস্থিত হইলে, ধ্রুব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; তাঁহার সেই বাল্যবয়সের দীক্ষা গুরু, যে গুরু হইতে তিনি জগৎ-গুরু পাইয়াছেন, সেই গুরুদেবকে সমুচিত পূজা করিলেন। ধ্রুব নির্দ্দিষ্ট দিনে সভাস্থলে উপস্থিত হইবেন বলিলে নারদ তথা হইতে দক্ষিণ দিকে মহর্লোকে আগমন করিলেন।

স্বর্লোকের বা স্বর্গের ঠিক উপরেই মহর্লোক! কিন্তু ইহার উত্তরাংশের ঊর্দ্ধে ধ্রুবলোক! উত্তরভাগে ধ্রুবলোকের নিম্ন পর্য্যন্তই স্বর্লোকের সীমা। সপ্তর্ষিমণ্ডল স্বর্লোকেরই অন্তর্গত; ইহার সর্ব্বোত্তরাংশে অবস্থিত মাত্র। সপ্তর্ষির উপরেই ধ্রুবলোক; সুতরাং ধ্রুবলোকের সমদক্ষিণেই স্বর্লোকের উপর মহর্লোক! এই লোকই ভূলোক হইতে ঊর্দ্ধের সপ্তলোকের মধ্যস্থল! ইহার নিম্নে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই তিন লোক এবং ঊর্দ্ধেও জন, তপ, সত্য এই তিনলোক! নিম্নের তিন লোক নশ্বর, এবং ঊর্দ্ধের তিন লোক অবিনশ্বর;

কিন্তু মধ্যস্থলের এই মহর্লোকে নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা দুই ভাবই আছে। নিম্নস্থ ত্রিলোকের কল্পে কল্পে লয় হয়—উপরিস্থ তিন লোকের নাশ প্রতি কল্পে হয় না ; কিন্তু কল্পান্তকালে অনন্তদেব বা সেই সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিতে যখন স্বর্লোক দগ্ধ হয়, তখন তদুপরিস্থ মহর্লোক অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ায় তথাকার অধিবাসীগণ পলাইয়া জনলোকে আশ্রয় লয়। মহর্লোক নামক এই স্থানটী একেবারে ধ্বংশ হয় না বটে, কিন্তু ইহা জনশূন্য ও অন্ধকারময় হইয়া যায় ; তাই এই লোকে মর এবং অমর দুই ভাবই বর্ত্তমান আছে। এই লোকে সপ্তর্ষির ভৃগু আদি কোন কোন ঋষি এবং অন্যান্য অনেক মহর্ষিগণ এখন তপস্যাচরণ করেন ; নারদ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতপূর্ব্বক ব্যক্তব্য বিষয় বলিয়া বিষ্ণুপদের পথাবলম্বনে জনলোকে চলিলেন।

ভগবান বামনাবতারে বলিকে ছলিবার জন্য যখন বিরাট-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তিনটী চরণ বাহির করিয়াছিলেন, তখন নূতন চরণখানি বলির মস্তকে—দক্ষিণ চরণ 'ভূর্ভুবঃ স্ব' এই ত্রিলোকে এবং বামচরণখানি স্বর্লোকের সর্ব্বোত্তরস্থ সপ্তর্ষির ঊর্দ্ধ হইতে মহর্লোক এবং তদুপরিস্থ জন, তপ ও সত্য এই তিন লোকের সর্ব্বোত্তর সীমা দিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনাতীত সেই বৈকুণ্ঠের নিম্ন পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেইজন্য এই স্থানের নাম বিষ্ণুপদ! আধুনিক ভূলোকের মানচিত্রে রুসিয়া দেশ যেমন এসিয়া এবং ইয়ুরোপ দুই মহাদেশেরই উত্তরভাগে দেখা যায়, সেইরূপ বিষ্ণুপদ নামক স্থানটী সপ্তর্ষির ঊর্দ্ধ হইতে মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক এই চারিলোকেরই উত্তরাংশে অবস্থিত। ধ্রুবলোক মহর্লোকেরই অন্তর্গত থাকিয়া এই চারি লোকের উত্তর সীমান্ত বিষ্ণুপদমধ্যেই স্থান পাইয়াছে। এই বিষ্ণুপদ নামক স্থানেই বিষ্ণুপদে সুরধনীর উৎপত্তি হইয়াছিল ; তাই গঙ্গার এক নাম বিষ্ণুপদী! নারদও এখন এই বিষ্ণুপদস্থ পথ দিয়াই জনলোকে উঠিলেন। সনক সনন্দাদি মহর্ষিগণ জনলোকে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। নারদ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করিয়া কার্য্যসমাধাপূর্ব্বক জনলোকের ঊর্দ্ধে তপলোকে আগমন করিলেন। এখানে বৈরাজ নামক দেবতাগণ বাস করেন। তপলোকে তপঃপ্রভাবে তাঁহাদের তেজঃপুঞ্জ দেবদেহ অনলাদি দ্বারাও দগ্ধ হয় না ; তপলোকে তপোবলে তাঁহাদের কোন তাপই লাগে না। এই সকল দেবগণের সহিত সভাসম্বন্ধে কথোপকথন হইলে নারদ তদুপরিস্থ সত্যলোকে উঠিলেন।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন-সমন্বিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব-উর্দ্ধের শেষ সীমাই সত্য-লোক! যে সকল পুণ্যাত্মা পুরুষগণ মুক্তি মোক্ষ পাইয়াছেন, তাঁহারাই এখানে মুক্তাবস্থায় আছেন। জন, তপ ও সত্য এই তিনলোকবাসীগণই অমৃত পান করিয়া থাকেন—তাই তাঁহারা অমর! এই তিন লোকই ভগবানের অমৃত-প্লাবনে প্লাবিত—তাই এই তিন লোকই অবিনশ্বর! কল্পে কল্পে ইহাদের সৃষ্টি বা লয় হয় না। জনলোক ভগবানের গুহ্যলোক—তপলোক গুহ্যতর—সত্যলোক গুহ্যতম! জনলোকে যে অমৃত আছে, তাহার নাম শুধুই 'অমৃত'! ইহাতে মরণ নিবারণ করে; তপলোকে যে অমৃত আছে, তাহার নাম 'ক্ষেম'! ক্ষেমামৃতে মরণ, রোগ ও শোক তাপাদি থাকে না; সত্যলোকে যে সুধা আছে, তাহার নাম 'অভয়'! অভয়ামৃতে মরণ, রোগ, শোক, তাপ, ক্ষতির ভয় ও ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অপরাধ কিছুই হয় না। সেইজন্য এই তিন লোক সর্ব্বশঙ্কাশূন্য ও অমর! কিন্তু দুই পরার্দ্ধ বৎসরের অবসানে ব্রহ্মার লয়ে, এই সত্যলোকেরও লয় হয়; তখন ব্রহ্মার সহিত অত্রস্থ মুক্তিপ্রাপ্ত যোগীগণ ঈশ্বরে মিশিয়া সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি পাইয়া থাকেন; আবার ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলে সত্যলোকও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয়। তাই সত্যলোকের আর এক নাম ব্রহ্মলোক! নারদ এই সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকের সর্ব্বত্র ভ্রমণপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের বাহিরে সত্যলোকেরও ঊর্দ্ধে সেই সর্ব্বোচ্চ ধাম গোলোকধাম বা বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

বৈকুণ্ঠের চারিপার্শ্ব বিরজা নদীতে পরিবেষ্টিত এবং দক্ষিণ দিকে অনতি নিম্নভাগেই ক্ষীরোদ বা কারণ সমুদ্র! সেইজন্য ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই! ব্রহ্মার লয় হইলেও এই বৈকুণ্ঠ বা তন্মধ্যবর্ত্তী গোলোকের ধ্বংস হয় না; এই ধামই ভগবানের অতি গুহ্যতম আবাস স্থান! এই ধামই প্রকৃত নিত্য ও অবিনশ্বর! নারদ এখানে আসিয়া প্রথমেই স্থূলদেহ সেই পুরুষ প্রকৃতি লক্ষ্মী নারায়ণ সন্দর্শন করিয়া কহিলেন "ঠাকুর! আমাকে আর ছলনা কেন? ওরূপ ত এখনই এখানে গোলোকধামে দেখিব এবং ক্ষীরোদার্ণবেও দেখিয়া আসিয়াছি; একবার সেই সর্ব্বমূলাধার নিরাকার চৈতন্যময় পরমব্রহ্ম রূপটি আমাকে দেখান; এখানে ত আপনি এখন সেইরূপেই বিরাজমান্!" ভগবান তখন সেই যুগলরূপের স্থূল কলেবর লুকাইয়া স্বীয় সূক্ষ্মরূপে চিরভক্ত নারদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন; নারদ

পরম পুলকে পুলকিত হইয়া পরমব্রহ্ম ধ্যান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠমধ্যস্থ গোলোকধামে আগমন করিলেন। ভগবান কৃষ্ণাবতারে বৃন্দাবনে যেরূপ লীলা করিয়াছিলেন, আদিতে এই গোলোকেই তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। গোলোকের আদর্শেই গোকুল হইয়াছিল! মর্ত্ত্যে বৃন্দাবন প্রয়োজন হইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রথমে তাহার বৈকুণ্ঠে সৃষ্টি হইয়াছিল; সেই বৈকুণ্ঠস্থ বৃন্দাবনধামের নামই—গোলোক! রাধারাণী গোপগোপিনী, সখীসখা সকলই তাঁহার অংশে দেবরূপে গোলোকে ছিল; গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলাদি সকল ব্রজলীলাই প্রথমে গোলোকে হইয়াছিল; এখন সেই ব্রজের লীলা ধুলাখেলার ন্যায় কোথায় কোন্‌কালে ফুরাইয়া গিয়াছে! কিন্তু সেই পূর্ব্বের লীলা গোলোকের লীলাই বিরাজমান! অন্ধকারময় বৈকুণ্ঠে সেই নিরাকার চৈতন্যময় পরমব্রহ্ম ইহার যেখানে প্রথমে সাকাররূপে আলোক প্রকাশ করেন, সেই স্থানই গোলোক! এই গোলোকেই প্রথম পুরুষ প্রকৃতি! এখানেই প্রথম রাধা লক্ষ্মী, সাবিত্রী সরস্বতী ও শিবশক্তি! সেই পরম পুরুষের নিরাকার চৈতন্যময় শক্তিই এখানে মূর্ত্তিমতী শক্তি হইয়া পঞ্চপ্রকৃতিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; শক্তির সেই পাঁচরূপই পরমব্রহ্মের প্রতি বিভূতিতে লিপ্ত হইয়া বিশ্বকার্য্যে নিয়োজিত আছেন। শিবের সহিত দুর্গা—ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রী—বিষ্ণুর সহিত রাধা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী! এই পঞ্চপ্রকৃতি বা পঞ্চরূপই সেই এক শক্তি মাত্র! এই পাঁচ প্রকৃতি, কেহ কাহারও অংশ নহে; স্থলবিশেষে বিশ্বকার্য্য সাধনের জন্য এক শক্তির এই পাঁচটি রূপ ধারণ মাত্র! পরমব্রহ্মের অর্দ্ধ পুরুষরূপের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ যেমন একেই তিন—তিনেই এক! সেইরূপ তাঁহার এই অর্দ্ধ প্রকৃতিরূপেরও একেই পাঁচ—পাঁচেই এক! কেবল কার্য্যানুরোধে পুরুষ প্রকৃতির মূর্ত্তিও উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন! তবে এই পঞ্চরূপের আদিরূপ সেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীরূপ! তাই তিনি আদ্যাশক্তি! ভগবানের এই শক্তিই ভগবতী! এই শক্তিপ্রসূত অণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড! এই অণ্ড হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত বস্তুরই একত্রীভূত বিষ্ণুর বিরাটরূপ! এই বিরাটমূর্ত্তির নাভি-পদ্ম হইতেই ব্রহ্মা! এই ব্রহ্মার ললাট হইতেই রুদ্র বা আদিদেব মহাদেব! পরমব্রহ্মের এই পঞ্চরূপা শক্তি হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর! যিনিই জননী—তিনিই রমণী! ভগবানের ইহা বড়ই অদ্ভুত রহস্য! এই রহস্যপূর্ণ সৃষ্টির অভিলাষেই সেই পরম ব্রহ্ম প্রথমে এই গোলোকধামে,

রাসমণ্ডপে তাঁহার নিজের এই শক্তিকেই নিজে পূজা করিয়াছিলেন। এই পঞ্চরূপা শক্তির-পঞ্চপ্রকৃতিরূপের অলোকসামান্য উজ্জ্বলালোকেই গোলোক আলোকিত! তাই বৈকুণ্ঠের যে স্থানে রত্নাসনে লক্ষ্মীনারায়ণ বা রাধাশ্যাম, সেই স্থানেই সর্ব্বোচ্চধাম—গোলোকধাম! তাই আদি অন্ধকারময় বৈকুণ্ঠের যে স্থানে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল এই জ্যোতির্ম্ময় আলোক, সেই স্থানই চতুর্দ্দশ লোকাতীত সর্ব্বলোকের সারলোক—গোলোক!

অষ্টম অধ্যায়।

শিবলোক।

নারদ ভগবানের সূক্ষ্ম এবং স্থূল রূপ অবলোকন করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে বিদায় হইলেন; গোলোকের জ্যোতির্ম্ময় আলোকে গোলোক-বিহারী শ্রীহরির শ্রীচরণ দর্শনমাত্র করিয়াই আনন্দিত মনে চলিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সভাসম্বন্ধে কোন কথাই হইল না বলিয়া নারদও সেই ক্ষীরোদ-শায়ী কর্ম্মময় হরির আদেশে এই নিষ্কাম গোলোকবিহারী হরিকে কিছুই বলিলেন না; কেবল পুরুষ প্রকৃতির অপরূপ রূপ বিলোকন করিয়াই বিদায় হইলেন। এখানে ভগবানও নারদের আগমনের কারণ জানেন বলিয়াই সে বিষয় কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। গোলোক হইতে বাহির হইয়া পিতা মাতাকে দেখিবার জন্য নারদের চিত্ত চঞ্চল হইল; তিনি তথা হইতে পিতৃ মাতৃ-সন্নিধানে চলিলেন।

জম্বুদ্বীপ যেমন লবণসাগরে বেষ্টিত, সুমেরু পর্ব্বত সেইরূপ জম্বুদ্বীপে পরিবেষ্টিত! জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগেই সুমেরুগিরি—এই পর্ব্বতের অধিকাংশ শৃঙ্গই তুষাররাশী সমাচ্ছন্ন। ভারতবর্ষ ব্যতীত জম্বুদ্বীপের অন্যান্য অষ্টবর্ষের অধিকাংশই এই পার্ব্বতীয় তুষারাবৃত; তাই আধুনিক ভূগোল দেখিয়া এই সুমেরু বা জম্বুদ্বীপের অস্তিত্ব নির্ণয় করা কঠিন। আধুনিক ভৌগলিকগণ পৃথিবীর উত্তর প্রান্তকেই সুমেরু বলিয়া থাকেন, এই সুমেরু পর্ব্বত হইতেই তাহার নামকরণ হইয়াছে; পর্ব্বতের শ্রেণী যে কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে, তাহা সহজে বুঝা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই পর্ব্বতের অভ্রভেদী

শৃঙ্গসমূহ সত্যলোকেরও ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়াছে! এই সুমেরুর সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত ভগবান ব্রহ্মার এক সুবর্ণময় আলয় অবস্থিত আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সেই সদনে সাবিত্রী সহিত সদাই বিরাজিত! বেদাদি শাস্ত্র প্রসবিনী এই সাবিত্রী—ইনিই বেদমাতা গায়ত্রী! ভগবানের পঞ্চরূপাশক্তির একরূপ এই সাবিত্রী! তাই অনেকে ইঁহাকেও ভগবতী বলিয়া থাকেন।

নারদ এই ব্রহ্মার আলয়ে আসিয়া "পিতা", "পিতা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; সেই সম্বোধনে ব্রহ্মা বাহিরে আসিয়া তাঁহার পুত্রপ্রধান নারদকে দেখিতে পাইলেন এবং কহিলেন "বাহির হইতে ডাকিতেছ কেন—নারদ?" নারদ বহুদিন পরে পিতার আলয়ে পিতৃদর্শন পাইয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিলেন "পিতঃ! আপনার চরণ দর্শনে আসিয়াছি—সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন! বিশেষ কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত বলিয়া বাহির হইতেই ডাকিতেছি"। তখন ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিয়া পুত্রের মুখে সভার বিষয় সমস্ত অবগত হইলেন। ব্রহ্মা নারদের পিতা বটে, কিন্তু তিনি লোক-পিতামহ। ব্রহ্মা হইতে মনুর উদ্ভব—মনু হইতে মানব! তাই তিনি সর্ব্বলোকের পিতামহ! প্রতি কল্পেই যে ব্রহ্মা এক মনু সৃষ্টি করিয়াছিলেন বা করিবেন, তাহা নহে। সপ্তবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগচতুষ্টয়ে এক মনুরই সৃষ্টি হয়; পরে আবার দ্বিতীয় মনুর উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ সাতবার যুগচতুষ্টয়ের সৃষ্টি ও লয় পর্য্যন্ত এক এক মনুর রাজত্ব এবং তাহা হইতে মানবজাতির উৎপত্তি। এইরূপ এক এক মনুর এক এক নাম;—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এবং বৈবস্বত এই সপ্তম মনু এ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন। এক এক মনুর সৃষ্টি ও লয় পর্য্যন্ত সময়ের নাম মন্বন্তর। বর্ত্তমান মনুর নাম বৈবস্বত মনু; ইঁহারই পুত্র ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি হইতে বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরে সূর্য্য চন্দ্রবংশের এবং মানবজাতির উৎপত্তি! আদি মনুর নাম স্বায়ম্ভুব মনু; ব্রহ্মা দ্বিখণ্ডিত হইয়া আদি মনু ও তাঁহার শতরূপানাম্নী পত্নীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই শতরূপা ও স্বায়ম্ভুব মনুর ধ্রুবপিতা উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত নামক দুই পুত্র এবং আকুতি, দেবহুতি ও সতীমাতা প্রসূতি নাম্নী তিন কন্যা হয়, তাঁহাদেরই বংশাবলী জগতের প্রথম মানবজাতি! এই স্বায়ম্ভুব বা আদি মনু লইয়া ছয় মন্বন্তর অতিবাহিত হইলে এই এখনকার বর্ত্তমান বৈবস্বত মনু আবির্ভূত হইয়াছেন; ইঁহারই বংশাবলী আমরা এখন ধরাধামে বাস করিতেছি। এবং এই মনুর "মন্ব-

সংহিতাই” এক্ষণে আমাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যবস্থা-পুস্তক। পরেও আবার এইরূপ নূতন সপ্ত মনুর সৃষ্টি হইবে। তাঁহাদের তিন জনের নাম ভৌত্য, রৌচ্য ও সাবর্ণি হইবে এবং বাঁকী চারি জনের মেরুসাবর্ণ নামক এক নাম হইবে। চতুর্দ্দশ মনুই ব্রহ্মার সংখ্যা! এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কাটিয়া গেলে যে কোন্ মন্বন্তর হইবে, কিম্বা সৃষ্টিই বা কিরূপ হইবে, তাহা এখন অনির্দ্দিষ্ট! ব্রহ্মার সৃষ্ট এই সকল মনু হইতে মানবের উৎপত্তি বলিয়াই তিনি—লোকপিতামহ! নারদ ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর ব্যক্তব্য বিষয় বিবৃত করিয়া এবং সেই মুক্ত-পুরুষ আমাদের আদি-পুরুষ বৈবস্বত মনুকে এখানেই দেখা পাইয়া নিমন্ত্রণপূর্ব্বক বিদায় হইলেন; পরে পিতৃভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নেহপরায়ণা আনন্দময়ী মায়ের চরণ দর্শনে চলিলেন।

সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণেই গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাশ! অতুলনীয় স্বভাব-সৌন্দর্য্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই কৈলাস পর্ব্বত! চারিধারে সুরধনী—করে কল কল ধ্বনি! মধ্যভাগে চারুশোভা—জগজ্জন মনোলোভা! উর্দ্ধে অলকানন্দা—পার্শ্বে তার বহে নন্দা! মুকুলিত তরুকুল—লতায় ফুটন্ত ফুল! স্থানে স্থানে সরোবর—বারি বহে থরে থর! ফুটে আছে পদ্মফুল—বেড়ায় মরালকুল! ভ্রমর খুঁজিছে মধু—মধু বর্ষে পিকবঁধু! ময়ুরেরা কেকারবে—ডাকে মাকে ‘মা’ ‘মা’ রবে! বিদ্যাধরী বিদ্যাধর—মুনিজন মনোহর! অতুল শোভার মূল—নাহি তার সমতুল! অপ্সরী কিন্নরী পরি—গান গায় নৃত্য করি! মরি মরি কি মাধুরী—চারিদিকে কি চাতুরী! ভূত প্রেত দানবাদি—ভাবিছে অনাদি আদি! যক্ষসহ যক্ষনারী—আছে তারা সারি সারি! বিরাজে বসন্তকাল—নাহি তার কালাকাল! কালান্তক যেন কাল—ফিরিছে প্রহরীপাল! চারি দ্বারে চারি দ্বারী—প্রবেশিতে মারামারি! নারদের তাড়াতাড়ি—নাহি দিল দ্বার ছাড়ি! বাধাইল হুড়োহুড়ী—বাড়াইল বাড়াবাড়ি!

দ্বারবানের ‘মার’ ‘মার’ শব্দ শুনিয়া শেষে মুনিবর বার বার ভাবিলেন—কতবার কৈলাসে আসিয়াছেন, চিরকালই ত চরণদর্শনে অবারিত দ্বার! তবে এবার কেন এত গুরুভার? কিরূপে বাঁচাইবেন মান—সহে না যে অপমান! নারদ বাস্তবিকই বিষম বিপদে পড়িয়া বড়ই বিমর্ষ হইলেন; বড় আশা করিয়াই মায়ের চরণদর্শনে পিতৃভবন হইতে মাতৃসন্নিধানে আসিয়াছেন; কিন্তু বিধির একি বিড়ম্বনা? কৈলাসে ত কখনও কোন প্রকার প্রহরী বা দ্বারী দেখেন নাই! আবার সেই দ্বারী দ্বারা এত অপ-

মানিত কথনও হয়েন নাই! এই দ্বারী-অপমানরূপ অনুকূল বায়ুতে নারদের ক্রোধাগ্নি এক এক বার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে; আবার ইহারা রুদ্রানুচর ভাবিয়া ক্ষমাগুণে সে আগুন তিনি নিজেই নির্ব্বাণ করেন। আহা! ভিতরে ভক্তিভাণ্ড—বাহিরে বিষম কাণ্ড! বক্ষে ভবদারা তারা—চক্ষে ধারাকারে জলধারা! প্রাণে অদম্য পিপাসা—নয়নে দর্শন-লালসা! অন্তরে অনন্ত আশা—চক্রান্তে নিতান্ত নিরাশা! আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, সেই কৈলাস-দ্বারে গঙ্গার ধারে বসিয়া তাঁহার সাধনার সার সামগ্রী সুর-লয়-সংযোগে সুকণ্ঠে দীপক রাগালাপে কেবল 'মা' 'মা' শব্দে মেদিনী কাঁপাইতে লাগাইলেন। সেই মূর্ত্তিমান রাগ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; তখন তিনি তাহা সম্বরণপূর্ব্বক মেঘ-মল্লারে গাহিতে লাগিলেন—

কই মা কোথা মা দেখা দে মা একবার,
নতুবা ত্যজিব তনু এখনি আমার!
আসা মম আশা কোরে, হেরিতে নয়ন ভোরে,
বিরূপাক্ষ বক্ষোপরে বাহার যাহার,
মুনি মনোহর সেই চরণ তোমার!
যতনে যাতনা যেন, আশাতে নিরাশা কেন,
মানে অপমান হেন, পেতেছি এবার,
দারুণ দুর্গম দেখি দয়ার দুয়ার!
ভাসিয়ে নয়ন-জলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে,
কুতুহলে যা'ব চ'লে দয়ায় তাঁহার,
দ্বারী না করিবে দেরি, ছাড়িবে সে দ্বার!

এদিকে পুরীমধ্যে মণিময় সিংহাসনে নানাবর্ণে চিত্রিত মৃগচর্ম্মোপরি হরপার্ব্বতী উপবিষ্ট হইয়া সমাগত শমনের সহিত সংহারসম্বন্ধে শত শত বিষয়ের বাদানুবাদ করিতেছেন। উপস্থিত দেবসভায় উপস্থিত থাকিয়া শমনকে শাসনসম্বন্ধে সকল বিষয় জানাইতে ও দেখাইতে হইবে—তাঁহার ও চিত্রগুপ্তের বিচিত্র বিচারের পরীক্ষা হইবে—তাঁহাদের ন্যায় অন্যায় কার্য্যের পর্য্যালোচনা হইবে; তাই আজ মূর্ত্তিমান মৃত্যুপতি, মৃত্যুঞ্জয় মহেশের মত জানিতে আসিয়াছেন—মূর্ত্তিমান সংহার আসিয়া সংহারকর্ত্তা শিবসন্নিধানে

সংহারতত্ত্ব সমালোচনা করিতেছেন এবং সভায় সে সম্বন্ধে কিরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে হইবে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এ সকল বিষয় অতি গোপনীয় বলিয়া শিবের আদেশেই শিবলোকের সর্ব্বস্থানে আজ প্রহরী—চারিদ্বারেই চারি দ্বারী! তাই দ্বারবান্ অদ্য দেবর্ষিকেও দ্বার ছাড়িয়া দিতেছে না; তাই মহাদেব আজ দেবীসহ পুরীমধ্যে নিভৃতে বসিয়া যমের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। কেবল চিরভক্ত নন্দি ভৃঙ্গি দাসদ্বয় তাঁহাদের অনতিদূরে দুই পার্শ্বে ত্রিশূলমাত্র ভর করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান আছে; আর দেবীর দুহিতা-প্রতিম জয়া বিজয়া সখী দুটী সিংহাসনের দুই দিকে দাঁড়াইয়া উভয়কে চামর ব্যজন করিতেছে। সম্মুখে একটু দূরে পৃথক্ একখানি উচ্চাসনে যমরাজা বসিয়া আছেন। শমনের সহিত অনেক কথার পর শিব কহিলেন, "তোমাকে এবিষয়ে অধিক আর কি বলিব? মর্ত্ত্যে যুগধর্ম্মে যাহা যাহা ঘটিতেছে এবং তাহার অতিরিক্তও যে সকল কাণ্ড হইতেছে, সে সমস্তই তুমি প্রকৃতরূপে সভামধ্যে যথাযথ বর্ণন করিবে, আর চিত্রগুপ্তকেও চিত্র বা তালিকা দেখাইতে কহিবে; তাহার পর কিরূপ স্থির হয়—দেখা যাউক। কি বল, পার্ব্বতি! এই যুক্তিই ঠিক নয় কি?" এই বলিয়া মহাদেব যেমন পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিবেন, অমনি দেখিলেন, দেবী ছল ছল নয়নে অনন্যমনা হইয়া কি যেন ভাবিতেছেন; তাঁহার বিকসিত বদনকমলে বিষাদের কালিমা পড়িয়াছে—আঁখি দুটী যেন জলের উপর ভাসিতেছে! শঙ্কর সহসা শিবানীর এ ভাব দেখিয়াই কহিলেন—

"কাঁদ কাঁদ মুখখানি ছল ছল আঁখি,
কাজল ভিজিয়ে দেখি মুখে মাখামাখি!
ও মুখে দেখিলে কালী, মনে পড়ে সেই কালী,
ভয়ঙ্করী ভীমারূপ ভোলা কি লো ভুলে,
অজিনে মুছাই মুখ, চাহ মুখ তুলে!"

এই বলিয়া শিব তাঁহার পরিধেয় ব্যাঘ্রাজিনের এক প্রান্ত দিয়া পার্ব্বতীর মুখের কালী ও চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন এবং চিবুক ধরিয়া সোহাগভরে আবার কহিলেন—

"একাসনে দুইজনে হেন প্রেমালাপ,
সহসা হেরিলো কেন আলাপে প্রলাপ!
ভাব দেখে ভয় পাই, দেহে যেন প্রাণ নাই,
শিবের সর্ব্বস্ব ধন শঙ্করী আমার,
বিষাদে বিনত কেন বদন তোমার?"

পার্ব্বতী। কেন বা মুছাও মুখ মম মহেশ্বর,
হেরিলে আমার ভাব কিবা তব ডর?
শিরোমণি সুরধনী, করে কল কল ধ্বনি,
সদানন্দ সদাসুখী সে ধনীর গুণে,
কি ভাবে এ ভাব মম, কিবা কাজ শুনে?
কেমন করে যে মন, কেন মন উচাটন,
দেখি গো স্বপন যেন জাগিয়ে জাগিয়ে,
কি জানি কাঁদিছে মন কাহার লাগিয়ে?

হর। কত কত চারি যুগ গিয়েছে কাটিয়ে,
তব মায়া মহামায়া না পাই ভাবিয়ে!
সংসারে সপত্নী-দ্বেষ, দৃষ্টান্ত দেও লো বেশ,
মানবী-মায়ার ন্যায় মাঝে মাঝে রঙ্গ,
আজো কি আতঙ্গ দেখি গঙ্গার তরঙ্গ?
সদাদ্বন্দ্বে সদানন্দ, পায় মনে মহানন্দ,
তাই লো আনন্দময়ি দ্বন্দ্ব ছাড়া নও,
দ্বন্দ্বেতে দাম্পত্য-প্রেম দ্বিগুণ বাড়াও!
মায়াতে সকলি ফাঁকি, কি তব জানিতে বাকী?
জান না কি জগদম্বে জগত-জননি,
যে জন্য জাহ্নবী মম জটাবিহারিনী?
গুরু মম হৃষিকেশ, তাই সদা ব্যোমকেশ,
কেশমাঝে রাখিয়াছে কেশব-চরণ,
যে পদে উদ্ভব গঙ্গা জাহ্নবী-জীবন!

সুপবিত্র গঙ্গাজলে, পাপ তাপ যায় চ'লে,
সুরধনী শিরোমণি সেই সে কারণ,
সকলি ত জান তুমি, তুমিই কারণ!

পার্ব্বতী। জানাতে হবে না নাথ, আর ভালবাসা,
যুগে যুগে জানিয়াছি, আরো কি বা আশা?
জানি জানি সব জানি, তুমি হে পিণাক-পাণি,
যে গুণের গুণমণি নাহিক তুলনা,
ভোলানাথ ভুলে যেন আমারে ভুলো না!
সমুদ্র-মন্থন শেষে, নারায়ণ নারীবেশে,
হেসে হেসে সুধারাশি করেন বণ্টন,
বাধাতে বিষম বাদ বিপদ-ভঞ্জন!
সুরাসুর দৈত্যদল, ক'রেছিল কোলাহল,
হেরিয়ে মোহিনীরূপ ভরিয়ে নয়ন,
তুমি কিন্তু ভোলানাথ হ'লে অচেতন!
রহিলে আমায় ভুলি, আমি কিন্তু ধ'রে তুলি,
বলি বলি পুনঃ বলি এই কলিকালে,
পতিপ্রেম কিবা রূপ আছে মম ভালে!

হর। বলিতে হবে না আর ছলিতে আমায়,
মিছে মায়া মহামায়া ভুলি না মায়ায়!
ক্ষ্যাপা'লেও আর তবু, ক্ষ্যাপে না লো ক্ষ্যাপা কভু!
ক্ষ্যাপার প্রেমেতে পড়ি ক্ষেপী দিগম্বরী,
ক্ষেপীর প্রেমের তরে শঙ্কর ভিখারী!
যুগে যুগে যোগধ্যানে, কত লীলা কত স্থানে,
ক'রেছি বিশ্বের তরে কি কহি কথায়,
কবে বল ভোলানাথ ভুলেছে তোমায়?

তুমি প্রেম-আদরিণী, তুমি শিব-সোহাগিনী,
বুকে ধোরে আছি তব পদ কোকনদ,
শিবের সম্বল শুধু সেই সে সম্পদ!
একাম্রটী পীঠস্থানে, আছি সদা সেই ধ্যানে,
ভয়াল ভৈরব হ'য়ে তব পাশে পাশে,
মহামায়া মায়াচক্র বুঝিবার আশে।
তুমি সর্ব্ব-মূলাধার, তুমি সে সারাৎসার,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-প্রসবিনী মহেশ-জননী,
শতাষ্ট জনমে মম প্রকৃত রমণী!
এক এক দেহ ত্যাগে, অস্থি রাখি অনুরাগে,
গাঁথিয়া হাড়ের হার প'রেছি গলায়,
সাক্ষীরূপে অস্থিমালা কিবা শোভা পা'য়।

যমরাজের সম্মুখে মহাদেবের এই প্রকার প্রেমানুরাগের কথাগুলি শুনিয়া দেবী কিছু লজ্জিতা হইয়া কহিলেন—

"শমন সম্মুখে কেন লজ্জা দেও হর,
তবে নাকি ক্ষ্যাপ না গো ক্ষ্যাপা দিগম্বর?
বিশ্ব-কার্য্য সাধিবারে, শিব স্বামী বারে বারে,
আদি সৃষ্টিকালে দেব, তিন দেব মাঝে,
বাছিয়া ল'য়েছি বর আমার যা সাজে,
লীলাক্ষেত্রে জন্ম ল'য়ে, জন্ম জন্ম মেয়ে হ'য়ে,
হর পূজি হরবর পেয়েছি সংসারে,
ভেসেছি ভবের সেই প্রেমের পাথারে!
সবাই মায়াতে মত্ত, কে বুঝে সে প্রেমতত্ত্ব?
পিতা মুখে পতি নিন্দা হ'লে উচ্চারণ,
সে বাণী শিবানী শুনে ত্যজেছে জীবন!"

তখন নিজ ভুজলতা দ্বারা মহাদেবের গলদেশে বেষ্টন করিয়া পঞ্চাননের

পঞ্চমুখের সম্মুখে স্বীয় মুখখানি রাখিয়া প্রেম-পুলকিত প্রাণে প্রেমামৃত বর্ষণ-পূর্ব্বক পার্ব্বতী পুনরায় কহিলেন—

"তুমি মম মনপ্রাণ, তোমাতে সঁপেছি প্রাণ,
প্রাণের বল্লভ তুমি প্রাণের ঈশ্বর,
পেয়েছি সাধনাফলে শঙ্কর সুন্দর!

রমণী স্বভাবে মোর, রঙ্গরসে হই ভোর,
ক্ষণে ক্ষণে দুই জনে করি যে কৌতুক,
দ্বন্দ্বপ্রিয় তুমি তাই দ্বন্দ্বই যৌতুক!"

পার্ব্বতীর প্রাণের সঙ্গিনী বিজয়া আর নীরবে থাকিতে পারিল না; সে অমনি বলিয়া উঠিল—

"তাই কি কৌতুক সখি এই কলিকালে?
মিলেছে মুখরা মেয়ে মহেশের ভালে!
এই দেখি আঁখি রাঙ্গা, মন যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
সহসা হেরিনু যেন কেমন অসুখ,
কলহ করিতে কিন্তু নহে ত বিমুখ?

বিজয়ার বাক্য আবার জয়া সহ্য করিতে পারিল না; সে সরোষে তাহার উত্তর দিয়া বিজয়াকে বলিল—

"শিবশক্তি প্রেমলীলা অতুল কেমন,
কি তুই বুঝিবি ওলো 'নিতুই নূতন!'
দুই দেহ আধা আধি, প্রেম-ডোরে বাঁধা বাঁধি,
সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি নিরবধি তায়,
শ্রীহরি যে প'ড়েছেন শ্রীরাধার পায়!
দেবতা-প্রেমের রীতি, কত ভাব নিতি নিতি,
সুনীতি সুভাব তাহে আছে মনোহরা,
মিছে কেন মাকে তুই বলিস্ মুখরা?

হেরিলে শঙ্কর মুখ, অসুখেও কত সুখ,
তাই দেবী রঙ্গময়ী রঙ্গ ছাড়া নয়,
অসুখেও সুখ তাঁর সকল সময়!

জয়ার কথা শুনিয়া পার্ব্বতী তাহাদিগকে কহিলেন—

ভাল কথা বলে জয়া, শোন্‌লো বিজয়া,
কি মম অসুখ সুখ, যদি থাকে শিবদয়া!
হ'য়েছে চঞ্চল মন, টলিয়াছে সিংহাসন,
দ্বারদেশে দ্যাখ্ জয়া, দ্যাখ্‌লো বিজয়া,
কে বুঝি ডাকিছে মোরে কে মাগিছে দয়া?"

পার্ব্বতীর এই অনুমতি পাইয়া জয়া বিজয়া দুই জনেই সিংহদ্বারাভিমুখে শক্তি-ভক্তের অনুসন্ধানে গমন করিল। এই কথায় শঙ্করও সুস্থির হইলেন এবং সময় পাইয়া সানন্দে কহিলেন—

"তাই বুঝি হেন ভাব হেরিলো নয়নে,
অধীরা হ'য়েছ তুমি ভক্তসম্ভাষণে?
ভাবিয়ে না আগে পাই, এ ভাবের ভাব তাই,
পাগলের প্রায় ছিল তোমার পাগল,
নিবিল এখন যেন চিন্তার অনল!
ভক্ততরে আঁখি ঝরে, হেরিতে সে ভক্তবরে,
কে বুঝে তোমার মায়া, তুমি মায়াময়ী,
দয়া মায়া এত তাই—দীনদয়াময়ী!"

শিবের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই জয়া বিজয়াসহ নারদ তথায় আসিয়া পড়িলেন এবং হরপার্ব্বতীকে প্রণামপূর্ব্বক দুঃখ, ক্ষোভ ও মৃদু-রোষভরে শিবের শেষ কথার সহিত সংলগ্ন করিয়াই গান ধরিলেন—

দীনদয়াময়ী কে বলে তোমায়?
নিদয়া নিঠুরা কথায় কথায়!
বলিয়ে উচিত কথা, দিব আজ প্রাণে ব্যথা,
ব্যথা দিয়ে মম ব্যথা, ঘুচা'ব হেথায়!

জানি জানি যত জারি, সকলি বলিতে পারি,
তুমি ভিখারির নারী, আমোদ ভিক্ষায় !
তুমি পাষাণের মেয়ে, পাষাণে গঠিত হিয়ে,
তব কাছে দয়া চেয়ে কিবা ফলোদয় ?
পিতা ত পাষাণ তব, পতি যে পাগল ভব,
পুত্র-রূপ কিবা ক'ব, গজমুখ তায় !
ভূত প্রেত দৈত্য দানা, দাস দাসী আছে নানা,
পুরে যেতে করে মানা, দুয়ারে দাঁড়ায় !
থাকিলে দয়ার বিন্দু, উথলিত প্রেম-সিন্ধু,
দেখাদিত সুখ-ইন্দু, তোমার দয়ায় !
তোমার কৃপার কথা, কেবল কথার কথা,
এ মম মনের ব্যথা, জানা'ব কাহায় ?

পার্ব্বতী মৃদু হাসিয়া কহিলেন "এত অভিমান কেন নারদ ? কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃই কিয়ৎকালের জন্য কৈলাসে কাহারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না ; তুমি আসিয়া যে ভক্তিভরে আমাকে আহ্বান করিতে ছিলে, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম ! কারণ আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল ; আমার ভাব দেখিয়া ভোলানাথও আত্মভোলা হইয়াছিলেন"। নারদ এই কথা শুনিয়া কিছু লজ্জিত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিলেন "বুঝিয়াছি যে জন্য আজ দ্বারে দ্বারবান—বুঝিয়াছি কেন আজ আমার এত অপমান ? বুঝিয়াছি যমরাজের গুপ্তমন্ত্রনা—বুঝিয়াছি ভোলানাথের সকলই ছলনা ! নহিলে কি স্নেহময়ী মা আমার সন্তান-সম্ভাষণে সুস্থির থাকিতে পারেন ?" যমরাজ কহিলেন "আমার মন্ত্রনা আপনি কি বুঝিলেন ? নারদ আবার কহিলেন "নহে ত কি ? আপনি ধর্ম্মরাজ, যথাধর্ম্ম যাহা করিয়াছেন, সমস্তই সভামধ্যে সবিস্তারে বলিয়া যাইবেন ; তাহার জন্য আবার স্বয়ং সংহারকর্ত্তার নিকট কি যুক্তি জানিতে আসিয়াছেন ? ধর্ম্মরাজ যে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া কলিতে মর্ত্ত্যের রাজত্বে অধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাতে কি তাহাই বুঝাইতেছে না ? সংহারকর্ত্তার সহিত সংহার সম্বন্ধে সৎযুক্তি, সদুপদেশ বা আদেশ লওয়াই আপনার কার্য্য ও

কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এত গোপনে চারিদিকে প্রহরী ও দ্বারী রাখিয়া পরামর্শ কেন? যদি অন্যায় কার্য্যই না হয়—তবে কেন এত ভয়?" নারদের এই কথায় শিব সহাস্যে কহিলেন "ভয় কি" সাধে হয়? ভয় করিলেই ভয়! যাহাকে বেশী ভয়, তাহারই সহসা উদয়!" নারদ কহিলেন "কেন প্রভু! ইহা ত দক্ষযজ্ঞ নয় যে, সতীর জন্য পদে পদে ভয়? কিম্বা আমা কর্ত্তৃক কোন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিবার ভয়?" শিব উত্তর করিলেন "জানি কি? যদি বিশ্বের মঙ্গলতরে অন্তরে অন্তরে আবার কোন ভয়ঙ্কর কাণ্ডেরই কল্পনা করিয়া থাক—তোমাকে বিশ্বাস কি?" নারদ বলিলেন "আমার সকল কার্য্যেই বিশ্বের মঙ্গল জন্য বলিয়া বিশ্বাস হইলে, আর অবিশ্বাস বা আপত্তিই কি?" শিব পুনরায় কহিলেন "আপত্তি আর কি? তবে কেবল আমাদের এমন সুখশান্তিময় প্রেম-রাজ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটে!" নারদ তখন হাসিতে হাসিতে কহিলেন "দেব! এবার আর আপনার সে ভয় কিছুই নাই; তবে এই প্রেম-পিপাসু পথিকের প্রার্থনা যে, একবার সেই অর্দ্ধহর অর্দ্ধগৌরী রূপের মিশামিশি মধুময় সন্মিলন নয়ন ভরিয়া দর্শন করি!" শিব "তথাস্তু" বলিয়া সত্বরই সেই আসনে সিংহাসনে সেই মধুভরা মাধুরী—আধহর আধগৌরী রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই অপরূপ রূপ প্রাণভরিয়া নারদ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যমরাজকে কহিলেন "ধর্ম্মরাজ! হরদেহার্দ্ধে মায়ের আমার এই বিশ্ব-বিমোহিনীরূপ দেখিবার জন্যই তাড়াতাড়ি বড় আশা করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু সহসা দ্বারদেশে বাধা পাইয়াই বিলম্ব হইয়া গেল, তাই হৃদয়ের অদম্য উচ্ছ্বাসে আপনাকে যেসকল কথা বলিয়াছিলাম, তাহার জন্য যেন ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না"। যম কহিলেন "আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির বাক্যে কে ক্রোধ করে?" এই বলিয়া বিলম্ব না করিয়া—বিদায় লইয়া হরপার্ব্বতীর পদপ্রান্তে প্রণাম পূর্ব্বক শমন স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নারদ কিন্তু অনিমিষ নয়নে সেই শিব-শক্তি-মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেনই বা না করিবেন, এমন অতুলনীয় প্রেম পরিপূর্ণ দুয়ে এক মূর্ত্তি আর কি কোথাও আছে? মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই হর পার্ব্বতীকে বন্দনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, যেমন বাক্যের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ যে কোন একটী বাক্য হইলেই তাহার একটী

অর্থ সঙ্গে সঙ্গেই আছে বুঝা যায়, সেইরূপ হর হইলেই পার্ব্বতী—পার্ব্বতী হইলেই হর যেন উভয়ে নিত্য সম্বন্ধে সম্মিলিতই আছেন। পৃথিবীর জীব! যদি তুমি অপার্থিব প্রেমের পরিস্ফুট প্রভা দেখিতে চাও, তবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দৃষ্টি কর—এই শিবলোক! যদি এই দেব দেবীর দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ দর্শন করিয়া স্ত্রী পুরুষের পুণ্যময় প্রেমের ভাব বুঝিতে চাও, তবে অবলোকন কর—এই শিবলোক! প্রেমের ভরে পতিতরে সতী মরে—সতীতরে পতি মরে, সে ভাব শিবলোক ব্যতীত আর কোথাও নাই।

আবার তুমি সংসারী মানব! যদি সংসারের মায়াজালে জড়ীভূত হইয়াও ধর্ম্মের কঠোর সাধনা করিতে চাও অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া সংসার এবং ধর্ম্ম দুইটীকেই বজায় রাখিতে চাও, তবেও দেখিবে—এই শিবলোক! শ্মশানে যে যোগীশ্বর যোগধ্যানে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া থাকেন—যে ভাবেভোলা ভোলানাথ আপনাকে ভুলিয়াও ভগবদ্ভাবনায় বিভোর থাকেন, কৈলাসের মণিময় ভবনে ভগবতীসহ তিনিই আবার দাসদাসী ও পুত্র পরিজন প্রভৃতি লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; লিপ্ত অথচ নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকিয়া কি করিয়া সংসার-ধর্ম্মের সাধনা করিতে হয়, মর্ত্ত্যের মানুষকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই তিনি সদনে সংসারী—শ্মশানে সন্ন্যাসী! আবার যদি দেবতার নিকট বর প্রার্থনা করিয়া শীঘ্র অভিষ্ট ফললাভের বাসনা থাকে, তবেও ভেবে দেখ—এই শিবলোক! এক বিল্বদলে শিব সন্তোষ—তাই তিনি আশুতোষ! ভক্তিভরে স্তব করিলে সত্বরই তুষ্ট হইয়া বর দিয়া থাকেন; পরিণামে বিশ্বের দশা বা নিজের অবস্থা না ভাবিয়াও ভক্তবরের জন্য কোন বর দিতেই কুণ্ঠিত নহেন। জম্ভাসুরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তিনি নিজেই তাহার পুত্র হইবেন বলিয়া বর দেন; পরে সেই জম্ভাসুরের ঔরসে মহিষ-যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মহেশই মহিষাসুর হইয়াছিলেন; আবার এই মহেশ্বরীই তখন মহিষাসুর বধ করিয়া মহেশকে উদ্ধার পূর্ব্বক মহিষ-মর্দ্দিনী রূপ ধারণ করেন! এ সমস্ত বৃত্তান্ত তন্ত্রের অতি নিগূঢ় রহস্য!

মহাবিষ্ণু যেমন বিবিধ অবতারে বিশ্বের বিবিধ কার্য্য করিয়াছিলেন, মহাদেব সেইরূপ স্বরূপেই সমস্ত সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং লিঙ্গরূপেও অনেক স্থানে বিরাজিত; তাঁহার অবতারের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকে হনুমানাদিকে রুদ্রাবতার বলিয়া থাকেন; কিন্তু শাস্ত্রের

প্রকৃত তত্ত্বে তাহারা রুদ্র বলে বলীয়ান বা সেই তেজে তেজীয়ান হইলেও অবতার কদাচই নহে। তবে প্রেমময়ী পার্ব্বতীর এই প্রশান্ত মূর্ত্তি অশান্ত হইয়া অসুর নাশার্থে অনেকবার অনেক অনেক ভয়ানক রূপ ধরিতে হইয়াছে। মহিষাসুর বধে মহিষমর্দ্দিনী ও দুর্গাসুর বধে দুর্গা এই দুই রূপ! পরে করাল বধে কালী—উর্দ্ধশিথ নাশে তারা—উর্দ্ধত বধে ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী—আরোদন বধে ভুবনেশ্বরী—দ্বীপমুখ বধে ভৈরবী—অঘোর নাশে ছিন্নমস্তা—ধূম্রাসুর নাশে ধূমাবতী—লোহিতাক্ষ বিনাশে বগলা—কালিকাসুর বধে মাতঙ্গী—কূর্ম্মপৃষ্ঠ বধে কমলা বা মহালক্ষ্মী! এই দশ অসুর নাশে দশ মহাবিদ্যারূপে প্রকাশ। দক্ষালয়ে গমনকালে সতীর এই দশ মূর্ত্তি দেখিয়াই ভীত হইয়া মহাদেব মহাযজ্ঞে মহামায়াকে পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল ব্যতীত মায়ের অষ্টশক্তি, অষ্টনায়িকা, পঞ্চরূপ, নবদুর্গা, নবকালী ও জগদ্ধাত্রী লইয়া এই চল্লিশ মূর্ত্তি এবং অন্নপূর্ণা, কাত্যায়ণী ও প্রাচীনা রূপ চামুণ্ডা চণ্ডী প্রভৃতি আরও কত মূর্ত্তি যে কতবার ধারণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। দশ মহাবিদ্যায় আদি মূর্ত্তি সেই মুণ্ডমালী কালী! অসুর নাশিনী দেবী রণরঙ্গিনী উলঙ্গিনী হইয়া নৃত্য করিতে করিতে উন্মাদিনী হইলে এই কালীর পাদপদ্মই বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর বিশ্ব রক্ষা করিয়াছিলেন; আবার ছিন্ন মস্তার ন্যায় ভয়ঙ্করী ভীমা মূর্ত্তিও আর নাই! অঘোর অসুর বধে উন্মত্তা দেবী রক্তপিপাসু হইয়া বিশ্ব বিনাশে উদ্যত হইলে দেবগণ যুক্তি করিয়া মদনকে পাঠাইয়াও সর্ব্বগ্রাসীর সর্ব্বগ্রাস হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে পারেন নাই; তথন স্তবে তুষ্ট করিলে দেবী নিজের ক্ষুধানল নিজেই নির্ব্বাণ করিলেন—আপন মুণ্ড আপনি কাটিয়া সেই ছিন্ন মুণ্ডে আপন রক্ত আপনিই পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিলেন! মহামায়ার এই মায়াচক্রে কে বলিতে পারে যে, এই সরলা বালিকা—সেই ভৈরবী কালিকা! এই গৌরী শুভঙ্করী—সেই ভীমা ভয়ঙ্করী! আবার মহাবিষ্ণু কৃষ্ণাবতারে যথন মথুরায় কংস-কারাগারে জন্ম গ্রহণ করেন, তথন এই জগন্মাতাই যশোদার গর্ভে কন্যারূপে জন্মাইয়া কংস ভয়ে গোকুল হইতে কৃষ্ণের সহিত মথুরায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন এবং মশানে বিনষ্ট হইবার সময় "তোমারে মারিবে যে—গোকুলে বাড়িছে সে" এই বলিয়া কংসকে ভয় দেখাইয়া কাত্যায়ণী শঙ্খচিলরূপে শূন্যে উঠিয়া-

ছিলেন। ঠিক্ এই এক সময়েই আবার শিবানী শিবারূপে ভাদ্রের অসিত অষ্টমীর মেঘান্ধকার রাত্রে কৃষ্ণক্রোড়ে বসুদেবকে যমুনা পারের ভয় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। ইনিই রাজপুত্র সুদর্শনের দেবী ভগবতী—ইনিই বণিক পুত্র শ্রীমন্তের কমলেকামিনী! ইনিই ধনপতিজায়া খুল্লনার অঞ্চলের নিধি শ্রীমন্তকে সিংহলপতি শালবানের মশান হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পিতাকে কারামুক্ত করেন এবং সেই রাজকন্যা বিবাহ দেন। ইনিই দুর্গাভক্ত সুদর্শনকে দর্শন দিয়া তাহার ঐহিক রাজ্য ঐশ্বর্য্য এবং পারলৌকিক সুখমোক্ষ প্রদান করেন; দেবী ভাগবতে দেবী ভগবতীর ইহা একটী অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! এইরূপ কত ভক্তের কত মনোরথই যে মা সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই! মায়ের নামেরও সংখ্যা নাই—লীলাক্ষেত্রে কার্য্যানুরোধে মায়ের মূর্ত্তিপরিগ্রহেরও সীমা নাই! প্রথমে বসন্তকালে গোলোকনাথ গোলোকে এই মায়ের পূজা করিয়াছিলেন; পরে ব্রহ্মা সৃষ্টি অভিলাষে স্বমুণ্ড বলিদান দিয়া দেবীর দশভুজামূর্ত্তির পূজা করেন; পরে রাবণ এই দশভুজা পূজাপূর্ব্বক ত্রিভুবনজয়ী হইয়া মর্ত্ত্যে বাসন্তী পূজার প্রচার করেন; কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র মহিষাসুর বধের জন্য অকালে বোধন করিয়া শরৎকালেই দেবীর পূজা করেন; তাহা দেখিয়া সুরথ রাজাও শরৎকালে শত্রু বিনাশ এবং রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য লক্ষ বলি দিয়া দশভুজাকে প্রীত করিয়াছিলেন! তাহার পর ত্রেতায় শতাষ্ট কমল মিল করিবার জন্য কমললোচন রাম স্বীয় লোচনকমল দিতে উদ্যত হইয়াও রাবণ বধের জন্য জগজ্জননীকে এই অকালে আরাধনা করিয়াছিলেন; দ্বাপরেও ব্রজাঙ্গনাগণ এই শরতে কৃষ্ণকামনায় কাত্যায়ণী ব্রত করিয়া কাত্যায়ণী পূজা করিয়াছিল, সেই অবধি মর্ত্ত্যে বা ভারতের সর্ব্বত্রই শারদীয়া মহাপূজার প্রচার! এখনও এই কলিকালে যে পূজায় দেশ আনন্দনীরে ভাসে—যে পূজায় মর্ত্ত্যভূমি টলমল করে!

দেবর্ষি নারদ মায়ের এই অর্দ্ধহর অর্দ্ধগৌরীরূপ প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া তাঁহার কৌমারকলেবর হইতে অসুরনাশিনী মূর্ত্তি সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং এই মহামায়ার দুর্ভেদ্য মায়াচক্র ভেদ করিতে না পারিয়া কহিলেন "মা মহামায়া! আমি কি বুঝিব মা তোমার মায়া? ব্রহ্মময়ি! তুমিই ত মা সেই পরমব্রহ্ম! তুমিই ত মা সেই নিরাকার পরম পুরুষের নিরাকারা চিৎশক্তিরূপিনী প্রকৃতি! তুমিই ত মা সেই সাকার

পত্তির সাকারা' সতী! 'যে হর—সেই হরি! যে রাধা—সেই গৌরী! যে পালনকর্ত্তা—সেই সংহারকর্ত্তা! যে সীতা—সেই অসীতা! লক্ষ্মীর অবতার সীতাদেবীই অসীতা হইয়া রুটস্তীরূপে শতস্কন্ধ রাবণ বধ করিয়া ত ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন; তবে কেন যে ভবের জীব ভেদ জ্ঞান করে, তাহা বলা যায় না। ভগবান নিজেই কতবার বলিয়াছেন যে, ভেদ-জ্ঞান করিলে ইহ পরকাল দুই কালই যায়! আহা! এই পরমার্থতত্ত্ব নির্ণয় করা বড়ই দুঃসাধ্য!"

নারদের এই কথা শেষ হইলে হরপার্ব্বতী তাঁহার হৃদয়ের ব্রহ্মজ্ঞান বিলক্ষণ বুঝিলেন এবং "কেমন নারদ! মনস্কাম সিদ্ধ হইয়াছে ত?" এই বলিয়াই উভয়ে আবার পৃথক হইয়া একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। নারদও চরণে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় লইয়া গৃহান্তরে গিয়া গণপতি গজানন ও শিখীবাহন ষড়াননের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক সভার সমস্তই বলিলেন। পরে ভাণ্ডারমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নারদ ভাণ্ডারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; শিবের ভাণ্ডারে কুবের ভাণ্ডারী! শিবসেবক ভক্তপ্রধান যক্ষপতি কুবের-কেও সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া নারদ শিবের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছুই নাই, যাহা শিবের ভাণ্ডারে নাই; কত কত মণি মাণিক্য—কত কত রত্নরাজী যে বিরাজিত, সে সকলের সংখ্যা কে করে? যাহার এমন অতুল ঐশ্বর্য্য, তাহার কেন ভিখারীবেশ? যাহার ভাণ্ডারে এরূপ দেব-দুর্ল্লভ দ্রব্য সামগ্রী, তাহার কেন এমন দৈন্তদশা? অন্নপূর্ণাই স্বয়ং যে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী, তাঁহারই নিকট আবার শিব কেনই বা ভিখারী? সহজে এ রহস্যের বিষয় বুঝা যায় না বটে, কিন্তু বেশ দেখা যাইতেছে যে, জগতের জীবমধ্যে যাহারা অলীক বিলাসে বিলাসী হইয়া অসার গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়, বোধ হয় তাহাদেরই শিক্ষার জন্যই যেন দেবাদি-দেবের এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন! রাশি রাশি অনিত্য ধন থাকিলেও যে কেমন করিয়া নির্ধনের ন্যায় নীচ হইয়া থাকিতে হয়—বিপুল বহ্বাড়ম্বরময় বৈভব থাকিলেও কেমন করিয়া যে অন্তর পবিত্র ও কোমল করিতে হয়, তাহা এই শিবের ভাবেই বুঝা যায়। তাই শিব সর্ব্বেশ্বর হইয়াও সর্ব্বত্যাগী—বিশেষ অনুরাগী হইয়াও বিষম বিরাগী! তাই শিবের স্বর্গশ্মশান বা উচ্চ নীচ সকলই সমান! তাই সর্ব্বপরিত্যক্ত বসন ভূষণ ও বাহনাদি লইয়াই শিবের ব্যবহার! নিতান্ত নীচ এবং অত্যন্ত দীনভাব বলিয়াই শিব

দেবাদিদেব—মহাদেব! বিনত না হইলে উন্নত, লঘু না হইলে গুরু বা নীচ না হইলে উচ্চ কি কখনও হওয়া যায়? তাই বলি, নীচতাই যে উচ্চতার মূলাধার, ইহা যদি দেখিতে চাও, তবে বিশেষরূপে বিলোকন কর এই জ্ঞানালোকময়—**শিবলোক!**

নবম অধ্যায়।

সভাস্থল।

মানুষ, মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইলে—বড় আশায় নিরাশ হইলে—বিষম শোক সাগরে ভাসিলে—দারুণ দুর্গমে পড়িলে সকল দুর্গতি দূর করিবার জন্য যে বদন ভরা দুর্গানামে প্রাণ জুড়ায়, নারদও বদন ভরিয়া সেই 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া শিবলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহির হইবার সময় গঙ্গা দেবীকে কহিলেন "মা ভীষ্মজননি! ভাগ্যবান ভগীরথ ভাগ্যফলে ভবের নিকট ভিক্ষা করিয়া তোমাকে ভবে লইয়া গিয়াছিলেন, ভূলোক ভ্রমণকালে সেখানেই সাক্ষাৎ পূর্ব্বক সভার বিষয় সমস্ত বলিয়া আসিয়াছি; এখানে শিব-শিরে ও শিবলোকের চারিদিকে তোমাকে দেখিয়া আবার বলিতেছি সভাস্থলে উপস্থিত হইতে যেন ভুলিও না মা! কারণ বসুমতীবক্ষে বিরাজ করিয়া এই কলিযুগে তুমিই তাহার প্রধান ভরসাস্থল! তুমিই বসুমতীর এই বিষম বিপদের বিশেষ সাক্ষীস্বরূপা।" গঙ্গা কহিলেন "নারদ! বসুমতী যে আমার বড় আদরের ধন! তাহার সহিত যে আমার বড় নিকট সম্বন্ধ! তাহার বিপদে যে আমারও বিপদ! আমি যাঁহার চরণে উদ্ভূত হইয়া যাঁহার কমণ্ডলু মধ্যে বিরাজিত ছিলাম এবং পরে যাঁহার জটামধ্যে স্থান পাইয়াছিলাম, সেই বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সম্মুখে সভাস্থলে নিজ দুঃখের সহিত বসুমতীর বিপদবার্ত্তা বিশেষরূপে বর্ণন করিব। তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই; নারদ! এক্ষণে তুমি কতদূর ভ্রমণ করিলে এবং এখন কোথায় যাইবে?" নারদ উত্তর করিলেন "আমি চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিয়া গোলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, সকলই সন্দর্শনপূর্ব্বক এক্ষণে পুনরায় স্বর্লোকে যাইতেছি। সভার দিন সংক্ষেপ বলিয়া আর ক্ষীরোদার্ণবের কূলে ফিরিয়া না গিয়া স্বর্গধামে সভাস্থলেই চলিলাম। সেখানে এখনও অনেকের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে বাকি আছে; প্রথম ভ্রমণকালে স্বর্গবাসী অনেক দেবদেবী-গণ বিশ্বকার্য্যে নিয়োজিত থাকায় বিলম্ব করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, এক্ষণে অবকাশমতে অপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক সভার বিষয় বলিয়া সভাস্থলে সমাগত সকলের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিব।"

এই বলিয়া নারদ পুনরায় স্বর্লোকে বা স্বর্গধামে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই যেখানে গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থিতি, প্রথমে সেই দিকেই গমন করিলেন। গ্রহনক্ষত্রাদিগণ গতিশীল ভাবে সর্ব্বদাই সঞ্চরণ করিয়া বিশ্বকার্য্যে নিয়োজিত আছে; এই জন্যই তখন তাড়াতাড়ি অনেকের সহিত সাক্ষাত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এক এক জনের সহিত দেখা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া তাঁহার সেই সপ্তাশ্বসংযোজিত প্রকাণ্ড রথের প্রধান সারথী অরুণের দেখা পাইলেন; এই সারথীর রথ চালনা কৌশলেই সূর্য্য সর্ব্বস্থানেই শীঘ্র শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারেন। অরুণকে বলা হইলে স্বয়ং আদিত্যের নিকট গিয়া তপনি-তাপে সাতিশয় তাপিত হইলেন। তপনের এই তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার স্ত্রী সংজ্ঞাদেবীও মায়াবলে সবর্ণানাম্নী স্বীয় ছায়ামূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যের নিকট রাখিয়াছিল এবং নিজে পিতৃভবনে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যের অসহ্য তেজ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। সংজ্ঞার পিতা স্বর্গ-শিল্পি বিশ্বকর্ম্মা তাহাকে সর্ব্বদা স্বামীসকাশে গমন করিতে বলিলে তথা হইতে সংজ্ঞা ঘোটকীরূপে বনে গিয়া তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আদিত্য অশ্বিনীর অনুসন্ধান পাইলে সেই অশ্বিনীরূপিণী সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা স্বর্গবৈদ্য! সমুদ্র মন্থনোদ্ভব ধন্বন্তরীর নিকট ইঁহারা সর্ব্বদাই থাকিতেন। নারদ এখানে সকলেরই সাক্ষাত পাইয়া স্বকার্য্য সুসিদ্ধ করিলেন। পরে ভগবানের সেই শিশুমার-রূপী মূর্ত্তির দিকে গিয়া তাহাতে দৃঢ়সংলগ্ন মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রের সহিত সাক্ষাতপূর্ব্বক শনির নিকট আসিলেন। সূর্য্যের ঔরসে সেই ছায়া-রূপিণী সংজ্ঞা অর্থাৎ সবর্ণার গর্ভে শনির জন্ম হয়। শনিগ্রহ বড়ই ভয়ানক গ্রহ! ইনিই গণপতির গজমুণ্ডের কারণ—ইনিই মহারাজা নল এবং শ্রীবৎসের নানা ক্লেশদায়ক ইঁহারই চক্রে পড়িয়া মর্ত্ত্যের মানুষ জ্বালাতন হইয়া যায়। ইঁহার এবং অন্যান্য গ্রহগণের সহিত মানুষের রাশীচক্রের

অতি নিকট সম্বন্ধ! মর্ত্ত্যপর্ব্বে জ্যোতিষাধ্যায়ে পাঠক সে সকল দেখিতে পাইবেন।

শনির নিকট হইতে নারদ রাহু এবং অন্ধকেতুর সহিত দেখা করিয়া চন্দ্রলোকে আগমন করিলেন। সূর্য্যের আলোকে সকল লোকই আলোকিত! চন্দ্রলোকও সূর্য্যালোকে বিমল বিভায় বিভাসিত! এই আলোক দ্বারা চন্দ্রদেবও স্নিগ্ধভাবে বিশ্ব আলোকিত করেন এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে মাস বিভাগ করেন। চন্দ্রের পত্নীরূপিণী অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণের নিকটও নারদ গমন করিলেন। পরে চন্দ্রদেবকে বলিয়া চন্দ্রলোক ছাড়িয়া অন্যদিকে অন্য এক দিব্য অট্টালীকামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন একটী অসামান্যা সুন্দরী নারী একাকিনী বসিয়া আছেন বটে, কিন্তু কোথায়ও কেহ নাই, অথচ যেন কাহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। নারদ প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলেন; পরে বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "বুঝিয়াছি দেবি! হরকোপানলে ভস্মীভূত হইলে তোমার স্বামী তোমারই করুণক্রন্দনে এবং সাধনার ফলে অঙ্গশূন্য হইয়া অনঙ্গ নাম পাইয়াছিল; তাই তুমি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছ, অথচ আমি প্রথমে দেখিতে না পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম। যাহা হউক রতি দেবি! আমার প্রথম ভ্রমণকালে তোমাদের সাক্ষাত পাই নাই কেন? বোধ হয় তোমরা তখন মর্ত্ত্যে ছিলে। তোমার স্বামী একবার শিক্ষা পাইয়াও এই কলিযুগে মর্ত্ত্যের মানুষকে কুপথে লইয়া গিয়া বসুমতীর পাপের ভার আরও বাড়াইতেছে কেন? অনঙ্গের অতুল পরাক্রমেই ত অনেকে এখন পাত্রাপাত্র জ্ঞান ও সম্বন্ধ বিচারশূন্য! অনঙ্গের অমোঘ অস্ত্রাঘাতে অস্থির হইয়াই ত অনেক অপরিণামদর্শি নরনারী পরিণামে পতিহত্যা, স্ত্রীহত্যা, নরহত্যা ও ভ্রূণহত্যায় বসুমতীকে কলঙ্কিত করে। এই সকলের সম্যক্ সমালোচনা সভাস্থলে সম্পন্ন হইবে; তোমাদের উভয়কেই উপস্থিত থাকিতে হইবে।" অনঙ্গ অলক্ষ্যে সমস্ত শুনিয়া কহিলেন "উপস্থিত নিশ্চয়ই থাকিব, কিন্তু আমরা সর্ব্বাপরাধশূন্য! যুগধর্ম্মে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অনেক কারণেই সংসারে এইরূপ ঘটিতেছে"। নারদ তখন "যাহা হউক, সভাস্থলে সমস্তই জানিতে পারিব" বলিয়া মদনালয় হইতে বাহির হইয়া একটী উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই উদ্যান-মধ্যস্থ একটী প্রকাণ্ড জলাশয়ের চারিপার্শ্বেই পদ্মবন! বিকসিত শতদলের সুরভিতে দিগন্ত আমোদিত!

জলাশয়ের মধ্যস্থলে একটী সুদীর্ঘ মৃণালাসনে একটী সহস্রদল শুভ্র শতদলোপরি শুভ্রবর্ণা এক বামাকে দেখিয়া নারদ কহিলেন—

বসিয়ে বিরলে ছাড়ি কোলাহলে
কে তুমি গো বামা র'য়েছ একা,
কলিতে এমন মলিন বদন
কেন বা তোমার যায় গো দেখা ?

নেহা'র যখন খেলে দুনয়ন
সফরী যেমন সরসী জলে,
কে তুমি মা রমা গুণে অনুপমা
আছ গো বসিয়ে কমলদলে !

শ্বেত শতদল পূর্ণ পরিমল
র'য়েছে তোমার চরণতলে,
চিন্তা-মেঘে ম্লান ও চাঁদ বয়ান
বনফুল-মালা কেন মা গলে ?

জনমি গোলোকে বিদ্যার আলোকে
আলোকিত তুমি ক'রেছ সবে,
সতী শ্বেতাঙ্গিনী সরোজবাসিনী
কেন গো আছিস্ নীরব রবে ?

চিকুর চাঁচর হেন মনোহর
কেন বা এলা'য়ে প'ড়েছে আজ,
দেবী বীণাপাণি বিনা বীণাখানি
কেন মা হেন পাগলিনী সাজ ?

দেবী কহিলেন "নারদ ! তুমি ত সকলই জান, তোমায় আর কি পরিচয় দিব ? লক্ষ্মীর সহিত স্বপত্নী সম্বন্ধ বলিয়া তিনি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; আমি যেখানে থাকি, তিনি সেখানে একেবারেই থাকিতে পারেন না। আমার বরপুত্রগণও কমলার কৃপায় বঞ্চিত; এদুঃখ আমার

রাখিবার স্থান নাই! সেই দুঃখে আমিও প্রায় লক্ষ্মীর সহবাস পরিত্যাগ করিয়াছি—গোলোকে প্রভুর পার্শ্ব হইতেও দূরে রহিয়াছি। আমার বরপুত্রগণ সারাজীবন কবিত্ব-কাননে ভ্রমণ করিয়া—বিবিধ বনফুলে আমার পূজা করিয়া 'হা অন্ন!' 'হা অন্ন!' করিয়া মরিয়াছে, তবুও তাঁহার দয়া হয় নাই! এখন আমি এখানে আনিয়া তাহাদিগকে অমৃত পান করিতে দিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছি। যদি দেখিতে চাও, তবে এই উদ্যানের আরও কিছুদূর গিয়া দেখ—আমার বরপুত্রগণের এখন কেমন জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দেহ! কবিত্বকিরণের কেমন সুচারু ছটা! নারদ! আমার আরও দুঃখ এই যে, কলিকালে সকলে বিদ্যা-চর্চ্চা ছাড়িয়া ক্রমশঃ কেবল লক্ষ্মীর চরণেই প্রাণ-মন উৎসর্গ করিতেছে! শুনিয়া হাসি পায়—এখনকার বিদ্যা-লাভ না কি অর্থের জন্য? অর্থকরী বিদ্যায় বহুব্যক্তিই বিদ্বান্! আবার কলিতে কত কুলাঙ্গার কদর্য্য পুস্তক প্রকাশপূর্ব্বক কবি নামের অপব্যবহার করিতেছে—পুস্তক প্রকাশকগণ সেই সকলের সহিত ঘড়ী ঘোড়া, ফুলের তোড়া উপহার দিব বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছে—পুস্তক পাঠ করিয়া অর্থলাভ করিতে পারা যায় বলিয়া বিবিধ প্রলোভনে কলির অর্থলোলুপ মানবমন ভুলাইতেছে! বিদ্যার বাজারে বিষম ব্যাপার বিলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। সম্প্রতি মর্ত্ত্যে গিয়া সাহিত্যের অবস্থা দেখিয়া দুঃখে বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে! সেই কবি-হৃদয়ের লুক্কায়িত প্রতিভা—সেই কল্পনা-কাননের কনক-কুসুম—সেই ভাব-সাগরের প্রবল তরঙ্গ—সেই কবিত্ব-কৌমুদীর জগতভরা জ্যোৎস্না—সেই অনন্ত চিন্তার বসন্তবায়ু—সেই স্বভাব-সতীর সুচারু সৌন্দর্য্য—সেই রঙ্গরসময়ী ভাষা-রাণীর মধুর মাধুর্য্য এখন কয়জন বুঝে এবং কয়জনই বা সে সকল প্রকাশ করে? সেই জন্যই সে সকলের সমাদর সর্ব্বত্রই নাই! বৃথা বাক্য-বিন্যাসের ঘটা—অলীক উপ-হারের ছটাই কেবল এখন দেখিতে পাওয়া যায়! দেখদেখি নারদ! আমার কত দুঃখ?"

নারদ কহিলেন "কে বা লক্ষ্মী—কেইবা তুমি? তোমাদের লীলা—তোমাদের খেলা—তোমাদের মায়া—তোমাদের কায়া কিছুই বুঝা যায় না। তবে কলিতে বিদ্যার বাজারে বিষম বিভ্রাট বটে; কিন্তু সেই সকলের উপায় বিধান করিবার জন্যই ত বসুমতীর স্বর্গে আগমন! আবার দেখিতে পাই বারাঙ্গনা ভবনেই তোমার পূজার বেশী আয়োজন; বোধ হয় তাহা-

দের গীতবাদ্য শিখিবারই বেশী প্রয়োজন! যাহা হউক, সভায় সমস্ত বিষয়েরই মীমাংসা হইবে।” এই বলিয়া নারদ তথা হইতে স্বর্গের আর যে যে স্থানে বলিতে বাকী ছিল, সকল স্থলেই গিয়া শেষে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দেবধামে ইন্দ্রালয় সম্মুখে সেই বহুদূরবিস্তৃত সুচারু শোভাস্থল—**সভাস্থল!**

একাদশ অধ্যায়।

স্বর্গ-পর্ব্ব শেষ।

স্বর্লোকে বা স্বর্গধামে স্বর্গশিল্পি বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত এই সভাস্থলের সুচারু শোভার বিষয় বর্ণন করিতে বর্ণের সংকুলান হয় না। স্বর্গধামে শচীপতির আদেশে বিশ্বকর্ম্মা এই সভা-প্রাঙ্গন প্রস্তুত করিয়াছেন। চারিদিকে সুচিত্রিত স্ফটিকস্তম্ভ! তদুপরে বৈদূর্য্যাদি মণিমণ্ডিত বিবিধ খিলানচক্র! সভার সম্মুখ হইতে পশ্চাত পর্য্যন্ত চারিপার্শ্বে চারুচক্রে বিঘূর্ণিত স্বর্ণময় সোপানশ্রেণী! ভিতরভাগে হেমময় প্রাচীর-গাত্র বিবিধ ভূষণে বিভূষিত! সভামণ্ডপের স্থানে স্থানে শোভাময় তরুরাজি সারি সারি শোভা পাইতেছে। স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর রত্নময় পত্র সকল সভাতল সমুজ্জ্বল করিয়া অন্ধকারকে চিরদিনের জন্য এখান হইতে বিদায় দিয়াছে। নীলকান্ত, অয়স্কান্ত ও সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণিমণ্ডিত চারুচন্দ্রাতপের স্নিগ্ধজ্যোঃতিতে সুধাংশুদেবের অংশুমালাও মলিন-ভাব ধারণ করিয়াছে! স্বর্গই ত শোভার সাগর! স্বর্গের এই সভাস্থল যে আরও সুন্দর-শোভায় সুশোভিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এই শোভাময় সভাস্থলের এক এক দিকে এক এক দলের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সকলে সভাস্থলে সমবেত হইয়া স্ব স্ব স্থানে আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। ক্রমে সভার নিরূপিত দিন আসিলে সকলেরই সমাগমে সভাস্থল শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া গেল। চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে যেখানে যাঁহাকে নারদ বলিয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই এই

বসুমতীর নিয়ম রহস্য বিশেষ উৎসুকের সহিত জানিতে আসিয়াছেন। একদিকে ভগবানের অংশ সম্ভূত সমস্ত দেবগণ এবং সেই পঞ্চরূপাশক্তির অংশসম্ভূতা সমুদায় দেবীগণ—একদিকে নরলোকের সাধু সন্ন্যাসী ও ঋষি তপস্বীগণ—একদিকে চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রগণ—একদিকে মুক্তিমোক্ষপ্রাপ্ত দিব্যপুরুষগণ—একদিকে সিদ্ধবিদ্যাধর, অপ্সর, কিন্নর এবং সাধু দানবাসুরগণ—একদিকে রাক্ষসানুচরসহ রাক্ষস রাজর্ষি বিভীষণ—একদিকে পুণ্যাত্মা যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ—একদিকে তুলসী ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষরূপী দেবদেবীগণ! এইরূপ এক এক দল এক এক দিকে বসিয়াছেন। মধ্যস্থলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উচ্চাসন! ইহার সম্মুখেই যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের আসন!

দেব-জগতের এই বিরাট-সভা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার! সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ! এমন অসাধারণ অনির্ব্বচনীয় ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেবধামেও যেন আর কখন দেখা যায় নাই। আজ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কি এক সমহান্ পরিবর্ত্তন সংশোধিত হইবে—যেন মহাপ্রলয় অপেক্ষাও কি এক মহাকাণ্ড ঘটিবে!

ক্ষণকাল পরে ভগবানের সেই পুরুষরূপের তিনেই এক—একেই তিন মূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং প্রকৃতিরূপের পাঁচেই এক—একেই পাঁচ মূর্ত্তি দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই অষ্ট মূর্ত্তি একত্রিত হইয়া সভাস্থলে পদার্পণ করিলেন। এই অষ্ট মূর্ত্তিই সেই একমাত্র পরম ব্রহ্ম! এই অষ্টরূপী ভগবানের অংশ হইতেই অন্যান্য কোটী কোটী দেবদেবীর সৃষ্টি! তাঁহারা সকলেই আজ সভাস্থলে সমবেত হইয়াছেন। ভগবানের আগমনে সভাস্থ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; সেই ধ্বনিতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত হইল এবং বিশ্ব কম্পিত হইল! পরক্ষণেই আবার সকলে বসিয়া নীরবে রহিলেন। সভার মধ্যস্থলে সেই সুবিস্তৃত উচ্চাসনে সকলেই সারি সারি বসিলেন; প্রথমে ব্রহ্মা ও সাবিত্রী, পরে বিষ্ণু, রাধা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; তৎপরে হরপার্ব্বতী! ইহাদের বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বৃদ্ধাসতী বসুমতী—দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইলেন দেবর্ষি! সম্মুখে অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত উপবিষ্ট! চতুর্দ্দিকে অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণ! কেমন অপূর্ব্ব বিরাট মিলন—কেমন অদ্ভুত মধুর সংযোগ—কেমন অভূতপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য—কেমন প্রশান্ত গভীর নিস্তব্ধতা!

এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমেই মহাবিষ্ণু কহিলেন "বসুমতি! তুমি ক্ষীরোদের কূলে আমার নিকট পাপের অত্যাচার ও শমনের শাসন-সম্বন্ধে যে দারুণ দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিলে, সে সমস্তই সভা-সমক্ষে সবিস্তারে পুনরায় বর্ণন কর।" বসুমতী অশ্রুপূর্ণনয়নে আর্ত্তস্বরে স্বীয় নিদারুণ মনকষ্টের কথা সর্ব্বসমক্ষে বলিয়া আপন মর্ম্মভেদী অন্তর্জ্বালার অনেক শান্তি করিলেন। সভাস্থ সকলেই শুনিয়া স্তম্ভীত হইয়া রহিলেন। মহাবিষ্ণু কহিলেন "গ্রাম্য দেবদেবীগণ! এ সম্বন্ধে তোমরা কি বল?" তাঁহারা সকলেই একবাক্যে কহিলেন "আমরা আর কি বলিব? কলিতে মর্ত্ত্যে এইরূপ ঘটনাই ঘটিতেছে; আমরা মর্ত্ত্যে আপনার আদেশে বিরাজ করি বটে, কিন্তু আমাদিগকে কেহই আর গ্রাহ্য করে না; কেবল বিধর্ম্মীগণের ন্যায় বিদ্রুপ করিয়া বলে—হিন্দুর লোকসংখ্যা অপেক্ষা দেবতার সংখ্যাই বেশী! কে কখন্ কাহাকে পূজা করিবে?" ইহা শুনিয়া নারদ কহিলেন "আহা! মায়ার জীব মানব পাপের কুহকে পড়িয়া এইরূপই হতবুদ্ধি হইয়াছে বটে, তাহারা কি জানে না যে অসংখ্য কর্ম্ম লইয়াই মানব-জীবন গঠিত! কর্ম্মক্ষেত্র মর্ত্ত্যধামে নিয়ত কর্ম্মে রত থাকিবার জন্যই ত মনুষ্যের সংসারযাত্রা! নতুবা সংসারে আসিবার প্রয়োজন কি? সেই অসংখ্য কর্ম্ম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া সুশৃঙ্খলার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়! এই কর্ম্ম-ফলেই তাহাদের সুখদুঃখ বা স্বর্গ নরকের ফলভোগ হয়! সেই জন্যই ত তেত্রিশ কোটী দেবতার সৃষ্টি! অসংখ্য কর্ম্মের জন্য অসংখ্য দেবতার আবির্ভাব! কর্ম্মময় মানুষ কর্ম্মবিশেষে এক এক দেবতার অর্চ্চনা করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেই পরিণামে পরলোকে পরমেশপদ প্রাপ্ত হয়। মানুষ কি এ সকল একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে?" গ্রাম্য দেবদেবীগণ কহিলেন "ভুলিয়াছে বই কি! ধর্ম্মকথা যাহাদের তর্কমাত্রে পর্য্যবসিত—উপাসনা যাহাদের অক্ষর সমষ্টি—স্বেচ্ছাচার যাহাদের মূলমন্ত্র—ম্লেচ্ছপাদলেহন যাহাদের মজ্জাগত বৃত্তি—পূজা পরিবর্জ্জনই যাহাদের সভ্যতার পরিচয়—অনধিকার চর্চ্চাই যাহাদের বিদ্যাবত্তার চিহ্ন! তাহাদের কি আর দেবভক্তি থাকিতে পারে? যে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপী ত্রিশক্তি সম্পন্ন ত্রিদণ্ডীধারক মূর্ত্তিমান দেবতাস্বরূপ, এখন তাহারাই সন্ধ্যাহ্নিকবিবর্জ্জিত হইয়া কুপ্রবৃত্তির দাসানুদাসরূপে নরকের কীট-ক্রীড়ায় ব্যাপৃত আছে; যাহারা মুক্তিপথের প্রথম

পথপ্রদর্শক, যাহারা ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা, তাহারাই যখন অজ্ঞানান্ধকারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর অন্যের কথা কি কহিব? জানি, যুগধর্ম্মে এ সকল ঘটিবে; কিন্তু ধ্বংসের অনেক বাকী থাকিতেও এখন এত অধিক মাত্রায় পাপের অত্যাচার কেন? এখন কি উপায়ে এই সকল বিদূরিত হইয়া বসুমতীর পাপের ভার লাঘব হয়?" মহাবিষ্ণু যেন জানিয়াও জানেন না, এই ভাবে কহিলেন "আমি যদিও কলিতে স্বয়ং অবতাররূপে মর্ত্ত্যে যাই নাই বটে, কিন্তু কলির প্রথমেই আমার এক অংশাবতার বুদ্ধদেব শাক্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ত কলির জীবের মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছিল; তাহার পরিণামফল কি হইল?" এই সময়ে সেই শঙ্করাচার্য্যের মুক্তাত্মা দাঁড়াইয়া কহিলেন "তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল; লোকে তাঁহার সেই 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' ও 'নির্ব্বাণতত্ত্ব' না বুঝিয়া নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছিল। তখন আপনার আদেশে আমিই অনেক চেষ্টায় সেই নাস্তিকতা দূর করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার পূর্ব্বক মুক্তিপথ আবিষ্কার করিলাম।" ভগবান আবার কহিলেন "বেশী দিনের কথা নহে, আমার অন্য এক অংশাবতার গৌরাঙ্গ নবদ্বীপধাম আলোকিত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াই বা কি করিয়াছেন? তাঁহাকেও ত আমি কলির পাপীগণের উদ্ধার জন্য পাঠাইয়াছিলাম"। তখন বৈষ্ণবচূড়ামণি দেবর্ষি নারদ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রসঙ্গে কহিলেন "গৌরাঙ্গ যে নিয়মে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন—যে প্রেমোচ্ছ্বাসে ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা যদি সকলে বুঝিতে পারিয়া সেই ধর্ম্মাচরণে রত থাকিত, তাহা হইলে কি বসুমতীর এই দুর্গতি ঘটে? তাহা হইলে এত দিন হরিনামের সুধাস্রোতে সমগ্র সংসার ভাসিয়া যাইত—ধরাধাম স্বর্গধাম বলিয়াই বোধ হইত! কিন্তু তাঁহার সেই সাধের সন্ন্যাসধর্ম্ম এক্ষণে বিকৃত হইয়া এমন ভাব ধারণ করিয়াছে, যে তাহা দেখিলে এখন দারুণ ঘৃণার উদয় হয়। যত পাষণ্ড কুলাঙ্গার কুপ্রবৃত্তির বশে তাঁহার এমন ধর্ম্মকে অধর্ম্মের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে—যত অন্তজ অধম ব্যক্তি বৈষ্ণব নাম ধরিয়া বারুণী বারাঙ্গনায় বিভোর হইয়া আছে—যত ইতর অভদ্র লোক 'ভেক' লইয়া নামমাত্র 'ভেকধারী' হইয়া ভেকের ন্যায় ভবধামে ভ্রমণ করিতেছে—যত নরনারী আখ্‌ড়াধারী হইয়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বা ন্যাড়া নেড়ী নাম ধরিয়া মহাপ্রভুর নামোজ্জ্বল করিতেছে! ইহারা এখন বিষ্ঠাজীবি কৃমি কীটের

ন্যায় ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য।" চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মনিরত প্রেমোন্মাদকারী হরিনামে উন্মত্ত বৈষ্ণব এখন—অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।"

তখন ভগবান অন্যান্য মর্ত্ত্যবিষয়ে অভিজ্ঞ সাধুদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে পাপের প্রবল অত্যাচার ও শমন-রাজার কঠোর শাসনের বিষয় বিবৃত করিলেন। বাক্‌শক্তি-প্রদায়িনী বাগ্বাণীই বা বাক্যযুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিবেন কেন? তিনিও এখন প্রভুর পার্শ্বে বসিয়াই বিদ্যার বাজারের বিষম ব্যাপার বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন। রতিদেবীও স্বীয় স্বামীর নির্দ্দোষিতার প্রমাণস্বরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবীও আর নীরবে না থাকিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন। "ভগীরথের সহিত আমাকে যখন মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছিলেন, তখন আপনিই বলিয়াছিলেন যে, আমার জলে পাপাত্মাগণ অবগাহন করিলে তাহাদের পাপরাশী আমি গ্রহণ পূর্ব্বক কলুষিত হইব; কিন্তু আবার পুণ্যাত্মাগণের স্পর্শ মাত্র আমার সে সকল কলুষ দূর হইবে! এখন তাহাই বা আর কোথায়? পুণ্যাত্মার পাদস্পর্শও প্রায় আর আমার অদৃষ্টে ঘটে না! এক্ষণে অধিকক্ষণ অধিকদিনই আমাকে কলুষিত থাকিতে হয়। আবার মর্ত্ত্যের মানবরাজ্যের বিধর্ম্মী রাজপুরুষগণ নানা স্থানে আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছেন। বসুমতীর সহিত আমিও পাপের ভার বহন করিতেছি এবং দারুণ বন্ধন-জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি! সূর্য্যকুলমণি শিশু ভগীরথের কঠোর তপস্যায় সগরবংশ উদ্ধারের জন্য সাগরে গিয়া দুঃখের সাগরে এখন ভাসিতেছি। আমা হইতে কলিতে পাপীর উদ্ধার হওয়া ত এখন অসম্ভব! কারণ এখন আমি তাহাদের নিকট কেবল স্রোতের নির্ম্মল জল মাত্র—অভক্তি অশ্রদ্ধায় তাহারা মলমূত্র পরিত্যাগেও পবিত্র করে আমার গাত্র—কেমন করিয়া আর তাহারা মুক্তির উপযুক্ত পাত্র? মুক্তি তরে সেই ভক্তিভরে যুক্ত করে স্তবপাঠসহ গঙ্গাস্নান কি আর এখন আছে? যোগে-যাগে জলমধ্যে যত জনতা হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ভক্তিহীন! তাহারা গঙ্গাস্নানে পাপ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরক্ষণেই পুনরায় প্রভূত পাপ সঞ্চয় করে; ইহাতে আমা হইতে আর মুক্তির উপায় কি হইতে পারে? পাপেরও যেমন প্রাদুর্ভাব—শমনেরও সেইরূপ নির্দ্দয় স্বভাব! অত্যধিক অকালমৃত্যুজনিত রোদনের রোলে বসুমতী যেমন বধীর হইয়াছে, আমিও সেইরূপ জ্বালাতন হইয়াছি। আমারই তীরস্থিত শ্মশানে কত লোকে

কত আশার ধন জন্মের মতন বিসর্জ্জন দিয়া যাইতেছে; কত কামিনী অনাথিনী হইয়া সর্ব্বস্ব ধনের সহিত শাঁখাসাড়ী ও সিঁতার সিঁদুর সলিলে সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য কাঁদিতেছে! আহা! আধফুটন্ত ফুল ফুটিতে না ফুটিতে—তাহার কোন সাধ মিটিতে না মিটিতে সংসারের সকলই ফুরাইতেছে! কত পিতা মাতার একটী আঁখি—বড় সাধের তোতা পাখী, ফাঁকি দিয়া পলাইতেছে; বড় আশার বংশধর—সর্ব্বাংশেই গুণধর—বংশ উজ্জ্বল করিতে গিয়া অকালেই ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; সুখের সঙ্গিনী সহধর্ম্মিনী কত সুখের ঘরবসত ও স্বামী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, যেন অতৃপ্ত প্রাণে কত আশা—কত সাধ রাখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বামী পুত্রকে শেষ দেখা দেখিয়া জন্মের শোধ বিদায় লইতেছে! এই ভব-সাগরে সুবাতাসে সুখের পাইল ভরে কত লোকের সংসারতরণী সুখে চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু কোথা হইতে কাল সহসা প্রবল ঝটীকারূপে আসিয়া কাণ্ডারীসহ সেই সুখেরতরি অগাধ-জলে ডুবাইয়া দিতেছে! এই সকল পুত্রহারা পিতা মাতা, পতিহারা সাধ্বী সতী, সতী হারা প্রাণপতি হতাশ প্রাণে উদাস হৃদয়ে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া আমারই কূলে কূলে বিচরণ করে। আহা! তাহাদের সেই নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিশুষ্ক বদনের দিকে চাহিলে পাষাণও গলিয়া যায়; কিন্তু শমনের কি এতই নিদয় হৃদয়? ওহে শমন-দমন মধুসূদন! ভয়ভঞ্জন বিপদবারণ! আমার সহিত বসুমতীর বিপদ ও ভয় দূর করিতে হইলে, প্রথমে শমনের শাসন সমালোচনা করুন; পরে ন্যায় অন্যায় দেখিয়া বিচারপূর্ব্বক শমনকে দমন করুন।”

গঙ্গাদেবীর কথা শেষ হইলে মহাবিষ্ণু যমও চিত্রগুপ্তের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন; সূর্য্যদেব ভগবানের ভীষণ ভ্রূকুটী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন “হায়! কোথায় আজ পুত্রের সুনাম শুনিয়া সুতৃপ্ত হইব, তৎপরিবর্ত্তে কি না দারুণ দুর্নাম? প্রথমে সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু নামক আমার পুত্র, বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরে মানবজাতির আদিপুরুষ হইয়া জন্মিয়াছে, সেও ত এখানে উপস্থিত! তাহার নিন্দা ত কেহ করিতেছে না! তাহার পর সংজ্ঞার গর্ভজাত যমজরূপে যম ও যমুনানামে আমার একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়। ইনিই সেই নিন্দার্হ পাষণ্ড পুত্র! সংজ্ঞার ছায়া-রূপিণী সবর্ণা ইহার অপেক্ষা স্বীয় গর্ভজাত সাবর্ণ ও শনি নামক আমার পুত্র দুইটীর প্রতি বেশী স্নেহ করিত বলিয়া ক্রোধে এই ছায়ারূপিণী মাতৃবক্ষে

ইনিই পদাঘাত করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই যখন ইঁহার এইরূপ মতি গতি, তখন কেন যে ইঁহার নাম ধর্ম্মরাজ হইল, তাহা জানি না; বরং যেরূপ কলঙ্কের বোঝা ইঁহার মাথায় আছে, তাহাতে অধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।'' বিশ্বকর্ম্মা নিজ দৌহিত্রের নিন্দা শুনিয়া কহিলেন "যমের দোষ কি? যুগধর্ম্মে এবং অন্যান্য যে যে কারণে এই সকল ঘটিতেছে, তাহা যমকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে।'' সভাস্থ সকলেই সেই মতে মত দিলেন; মহাবিষ্ণুও সেই কথানুসারে মর্ত্ত্যাধিপতি যমকে তাঁহার শাসনসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিতে বলিলেন। যমরাজ যেমন বলিতে যাইবেন, অমনি চিত্রগুপ্ত তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন "ঠাকুর! আমি থাকিতে ধর্ম্মরাজকে আর কেন কষ্ট দেন? যমরাজের কষ্ট দূর করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বীয় কায় হইতে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; আমি তাঁহার কায়-স্থ বলিয়াই আমা হইতে মর্ত্ত্যের কায়স্থ জাতির উৎপত্তি! আমিই আপনাদের আদেশে মর্ত্ত্যের পারলৌকিক বিচার ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা করিতেছি। যমরাজা ত কেবল রাজা মাত্র! কার্য্য সমস্তই আমার হস্তে, যমালয়ের নিগূঢ়তত্ত্বই আমার নিকট আছে; মর্ত্ত্যের শাসনবৃত্তান্ত আমিই বিবৃত করিতেছি। কলিতে মর্ত্ত্যের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়াও মর্ত্ত্যের অবস্থা সমস্ত জানিয়াছি। আমার গুপ্ত ভ্রমণের গুপ্ত-রহস্যগুলি নিজ তালিকা মধ্যেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। বিবিধ গুপ্ত-কথাসকল চিত্রপটের ন্যায় চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছি; এই গুপ্তচিত্র দেখিলেই সমুদায় গুপ্ত কথা জানিতে পারিবেন। পাপের প্রশ্রয়—অকাল মৃত্যুর পরিচয়, যমের রাজত্ব—আমার প্রভুত্ব, সরস্বতীর সাহিত্য—অনঙ্গের আদ্যন্ত সমস্তই আমার এই গুপ্তকথায় বুঝিতে পারিবেন; জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া দেখিয়া পরে বিচার করিবেন।'' মহাবিষ্ণু "ইহাই উত্তম প্রস্তাব'' বলিয়া চিত্রগুপ্তকে তাঁহার সেই তালিকাভুক্ত গুপ্তকথাসমূহ প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন।

অনুমতি পাইয়া চিত্রগুপ্ত গুপ্তচিত্র দেখাইয়া সানন্দে সোৎসাহে সভা সমক্ষে স্বীয় গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতে উদ্যত হইলেন। সভাস্থ সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "এই যুক্তিই বেশ!'' আমাদেরও এই স্থানেই—**স্বর্গপর্ব্ব শেষ!!**

চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা

বা

যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব।

(মর্ত্ত্যপর্ব্ব)

প্রথম অধ্যায়।

ভবের হাট।

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয়তদিদং ভ্রাতঃ॥"

দেবতাচয় এবং সাধু সমুদায় সকলেই ত স্বর্গধামে দেবসভায়! কিন্তু আমরা কোথায়? আমরা কোথা হইতে কোথায় আসিয়া কাহার সহিত কি লইয়া কি খেলা খেলিতেছি? তাহার কথা কখনও কিছু ভাবিতেছি কি? আমরা এ কোন্ দেশে—কেমন দেশে আসিয়া পড়িয়াছি এবং কি কার্য্য লইয়া কিরূপে কাল কাটাইতেছি? তাহার কথা কিছু জানিতেছি কি? কিছুই না—কিছুই না! আমরা এদেশে আসিয়া—একটু মাত্র স্থান পাইয়া কেবল বাস্তু দেবতা সহায় করিয়া বাস্তু ভূমিতে বসবাস করিতেছি আর ক্ষণকালের জন্য লম্ফ ঝম্ফ দিয়া মায়ার আগুনে পড়িয়া পতঙ্গবৎ পুড়িয়া মরিতেছি! ভাবি কেবল 'আমিই' সার—জানি কেবল 'আমার আমার'! মায়ার কুহকে স্বার্থের জালে পড়িয়া এ দেশের সহিত চিরসম্বন্ধ আছে ভাবিয়াই মহানন্দে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াই। দুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়া দৈব-

বশে যে দেশে আসিয়া পড়িয়াছি, সে যে কেমন দেশ—কেমন স্থান, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি ? সে দেশের শিরোদেশে মণিমাণিক্যখচিত নীল চন্দ্রাতপ—সে দেশের তলদেশে শ্যামল দুর্ব্বাদলরূপ মখমলমণ্ডিত বিচিত্র আসন—সে দেশের মধ্যদেশে সমুন্নত শৈলশ্রেণীরূপ অভ্রভেদী স্তম্ভরাজী—সে দেশের গলদেশে সুমন্দবাহিনী স্রোতস্বিনী স্বরূপ কত কত রজতমালা ! সে দেশের সকল স্থলই সুশ্যামলবর্ণে সুন্দর শোভায় সুশোভিত—সে দেশের চারিদিকই সুগভীর সমুদ্ররূপ সুনীল পরিখা পরিবেষ্টিত ! কেবল দুই দিকে দুইটী মাত্র দ্বার ! একটী দ্বারে সর্ব্বদাই আনন্দের কোলাহল ! দিবানিশি এই দ্বার শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি প্রভৃতি বিবিধ আনন্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত ! লক্ষ লক্ষ জীব প্রথমে এই দ্বার দিয়াই এদেশে প্রবেশ করিতেছে। দ্বিতীয় দ্বারে শুধুই শোকের উচ্ছ্বাস—কেবলই হা হুতাশ ! এই দ্বার অবিরল রোদনের রোল এবং হাহাকার শব্দে সদাই শব্দিত ! লক্ষ লক্ষ জীব জন্মের মত এই দ্বার দিয়াই আবার বাহির হইয়া যাইতেছে ; যাহারা যে ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা সেই ধর্ম্মানুষায়ী ঈশ্বরের নাম লইয়া এবং হিন্দু নরনারীগণও "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" এই নামামৃত মাত্র শেষের সম্বল করিয়া লইয়া এই দ্বার দিয়াই দিবারাত্র কোথায় চলিয়া যাই-তেছে ! প্রথম প্রবেশ-দ্বারের নাম 'জনম দুয়ার'—শেষের বাহির হইবার দ্বারের নাম 'মরণ দুয়ার' ! এই দুই দ্বারবিশিষ্ট চারিদিকে পরিখা পরিবেষ্টিত এই দেশের নামই ভবধাম বা মর্ত্ত্যধাম ! এই ধামেই জীবগণ কিছুকাল ধুলা খেলা করিয়া পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফলানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া কালে বা অকালে মরণদুয়ার দিয়া চলিয়া যায় ; এই মর্ত্ত্যধামের কথাই এই মর্ত্ত্যপর্ব্বে আলো-চিত হইতেছে ! এই মর্ত্ত্যধাম যেন একটী সুবৃহৎ হাট স্বরূপ ! এই ভবের হাটে মানুষ, কেহ বা কুটীরে কেহ বা প্রাসাদে বসিয়া যেন

দোকান পাতিয়া আছে ; এবং সকলেই পরস্পর ক্রয় বিক্রয় পূর্ব্বক 'হা অর্থ হা অর্থ' করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সারা জীবন ছুটিয়া বেড়াইতেছে। একবার ভ্রমেও ভবের বা ভবধবের ভাবনা ভাবে না ; তা যদি ভাবিত, তবে আর তাহাদের এই সাধের ধুলাখেলা সত্বর শেষ হইত না, কিম্বা কত আশার খেলাঘর অকালে ভাঙ্গিয়া যাইত না।

এই ভবের হাটে পৃথিবীর প্রাণীরূপ পথিকে পথিকে পরস্পর মিলন হয়! পিতা পুত্র, পতি পত্নী, মাতা কন্যা ও আত্মীয় স্বজন সকলের সহিতই সাক্ষাৎ হয়! এক জন অন্যের মিলনে সুখলাভ করে, আবার অন্য জন একের বিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করে। এই হাটে যখনই যাহার কেনা বেচা শেষ হইবে, তখনই সে চলিয়া যাইবে ; এমন কি হাটে পদার্পণ করিবা মাত্রই কত সদ্যজাত শিশু সূতিকা গৃহ হইতেই ফাঁকী দিয়া পলাইয়া যায়! এই সকল জানিয়াও মানুষ শোকে অধীর হয়—দুঃখে কাতর হয়! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও মানুষ অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া পুণ্য পথ হারাইয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়! মর্ত্ত্যের ইহাই বড় বিচিত্র রহস্য! আবার কলিকালে এখন যে মর্ত্ত্যের অবস্থা আরও কিরূপ দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইতেছে, সভাস্থলে দেবগণকে তাহাই জানাইবার জন্য চিত্রগুপ্ত তাঁহার সংগৃহীত চিত্র সকল ও তালিকাখানি দেখাইতেছেন এবং স্বীয় ব্যক্তব্য বিষয় বিবৃত করিতেছেন।

নারদ কিন্তু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন "নারায়ণের নিকট আমার একটী দুঃখের কথা বলিবার আছে ; প্রভুর কি এত কালেও আমার উপর পরীক্ষা শেষ হয় নাই! তাই এই কলিকালেও আমার অদৃষ্টে নরকভোগ? আমার কিরূপ তমোভাব দেখিয়াই বা প্রভু তীব্র দুর্গন্ধে আমায় অস্থির করিয়াছিলেন? নারায়ণ এ কথায় কিছু উত্তর না দিয়া নীরবে রহিলেন ; তখন তমঃগুণাধার মহাদেব কহিলেন "তমোভাব না হইলেই বা তোমার সেরূপ অবস্থা হইবে

কেন? তোমার তমঃ এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। কই নারদ! আমার সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিয়াও ত আমাদের একত্রে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে নারায়ণের আদেশ-বাক্য বা সভার বিষয় কিছুই প্রকাশ কর নাই; দক্ষযজ্ঞের কালে দক্ষের বিনানুমতিতেও বলিতে আসিয়াছিলে, আর এখন আদেশ পাইয়াও সভার কথা কিছুই না বলিয়া কেবল সাক্ষাৎ পূর্ব্বক চলিয়া আসিয়াছ।"

নারদ। তাহা নাই বলিলাম; তখন বিনা নিমন্ত্রনেও নিমন্ত্রন করিবার প্রয়োজন ছিল, আর এখন নিমন্ত্রনের আদেশ পাইয়াও না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আপনি ও ভগবান কি পৃথক্? আমাকে আদেশ করিবার পূর্ব্বে নারায়ণের মনে এই ভাব উঠিলেই আপনি সমস্ত জানিয়াছিলেন; আবার আমি গিয়াও দেখিলাম যে আপনি শমনের সহিত সেই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন; তখন আর আপনাকে বলিবার প্রয়োজন কি?

মহাদেব। তবু চিরপ্রচলিত প্রথামত কার্য্য করা তোমার উচিত ছিল; তাহা না হইলে কি কার্য্য সিদ্ধ হয়? ভগবান কি বসুমতীর এখনকার অবস্থা অবগত নহেন? তবে ছলনা করিয়া এ সকল উদ্যোগ আয়োজনেরই বা প্রয়োজন কি? কার্য্যতঃ না দেখাইলে কোন কার্য্যেরই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

নারদ। প্রভো! তবে আমায় ক্ষমা করুন; নরকভোগ সম্বন্ধে আর আমি কিছুই বলিতেছি না—অদৃষ্টের বশে ভোগ করিয়াছি এবং এখনও হয় ত কতই করিতে হইবে। এক্ষণে বলুন, যমরাজ তখন পবনদেবের সহিত আগমন করেন নাই কেন? এবং আপনার নিকটেই বা গোপনে তাঁহার কি পরামর্শ হইতেছিল?

মহাদেব। সংহার সম্বন্ধে সকল কথাই গোপনে হয়, কেবল এ কথা

বলিয়া কেন নারদ? তাহাতে কোন দোষ বা সন্দেহের কারণ নাই। আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সভায় আসিবেন বলিয়াই শমন তখন পবনদেবের সহিত আসিতে পারেন নাই।

নারদ। এক্ষণে আমার আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে; পাতাল হইতে ভূলোকে উঠিতে যমালয়ের পথে আমি যে বিভীষিকাগুলি দেখিয়াছিলাম, সেগুলি কিরূপ? আর সে সকলের বৃত্তান্তই বা কি?

এই বলিয়া নারদ সেই বিভীষিকাগুলি সমস্তই সভাসমক্ষে বর্ণন করিলেন; তখন নারায়ণ যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের দিকে একবার ভ্রূকুটী করিলেন। ভগবানের সেই ভ্রূকুটীর ভাব বুঝিতে পারিয়া চিত্রগুপ্ত কহিলেন "সে সমস্ত বৃত্তান্ত আমি সর্ব্বসমক্ষে বর্ণন করিব; তাহার জন্য আর চিন্তা কি? সেই জন্যই আমার সংগৃহীত চিত্রগুলি ও তালিকাখানি দেখাইবার এবং আমার ব্যক্তব্য বিষয় বলিবার পূর্ব্বেই আমি একখানি কলির মানবের লিখিত কলির পুস্তক পাঠ করিব। ছদ্মবেশে মর্ত্ত্য ভ্রমণকালে এই পুস্তকখানি আমি সেখানে সংগ্রহ করিয়া অতি গোপনে রাখিয়াছিলাম। কলিতে মর্ত্ত্যের অবস্থার কথা ইহাতে মর্ত্ত্যের আধুনিক উপন্যাস বা নবন্যাস ভাবেই লিখিত আছে। এই সত্য ঘটনামূলক কলিযুগের অদ্ভুত ইতিহাসখানি শ্রবণ করিলেই মর্ত্ত্যের এখনকার অবস্থা সমস্তই সকলে জানিতে পারিবেন এবং দেবর্ষির দেখা বিভীষিকার বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে আমার সেই সংগৃহীত গুপ্ত পুস্তক অগ্রে পাঠ করি; শেষে আমার গুপ্ত চিত্রগুলি ও গুপ্তালিকাখানি দেখাইব এবং আমার নিজের ব্যক্তব্য বিষয়ও বর্ণন করিব। এই পুস্তকের লিখিত ঘটনাগুলি আমি ভূলোক ভ্রমণকালে গোপনে স্বচক্ষে দেখিয়াছি—ইহাতেই মর্ত্ত্যের অনেক গুপ্তকথা লিপিবদ্ধ আছে। পরে এই পুস্তকে লিখিত ঘটনাগুলি এবং আমার ব্যক্তব্য বিষয়

শুনিয়া গ্রাম্য দেবদেবী বা গঙ্গা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহার সত্যাসত্য সকলে জানিতে পারিবেন।”

তখন সকলেই সেই প্রস্তাবে মত দিলেন; চিত্রগুপ্তের প্রতি কলিতে মর্ত্ত্যের এই আধুনিক নবন্যাসখানিই পাঠ করিবার অনুমতি হইল। চিত্রগুপ্তও স্বীয় সংগৃহীত গুপ্ত পুস্তকখানি পাঠপূর্ব্বক গুপ্তকথা আরম্ভ করিলেন। সকলেই সোৎসুকে শুনিতে লাগিলেন চিত্রগুপ্তের পুস্তক পাঠ—ভাবিতে লাগিলেন কলিতে কিরূপ—

ভবের হাট !

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পদ্মার ঘাট।

জ্ঞানদা গৃহস্থের বধূ—গৃহকার্য্যেই সুনিপুণা। না জানে নাটক পড়িতে—না জানে কার্পেট বুনিতে; না জানে প্রেম-পত্র লিখিতে, না জানে স্বাবলম্বন শিখিতে; না জানে বিরহানলে দহিতে—না জানে গহনা-বস্ত্র চাহিতে; জানে কেবল নিতান্ত হাবা মেয়ের মত ঘরের কাজে গাধা খাটুনি খাটিতে! আজকালের চাল্ চলন্—ধরণ ধারণ, হাব্ ভাব্—রীতিস্বভাব, কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি নাই। প্রবৃত্তি কেবল বাঁদীবৃত্তিতে, মনের সকল বৃত্তি অপেক্ষা বাঁদীবৃত্তিকেই জ্ঞানদা শ্রেষ্ঠ মনে করে। রাজরাণীর পরিবর্ত্তে চাকরাণী হইতেই সে ভালবাসে। সংসারের সকল কার্য্যের সহিত বৃদ্ধা শাশুড়ীকে জ্ঞানদা পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননী-জ্ঞানে সেবা-শুশ্রূষা করে এবং অকাল-বৈধব্য-পীড়িতা হতভাগিনী ননদকেও স্নেহের ভগিনী-জ্ঞানে যত্ন করেন। শাশুড়ী মনে করেন যে, তিনি পূর্ব্বজন্মের অনেক পুণ্যফলে এমন পুরী-আলোকরা পুত্রবধূ পাইয়াছেন এবং জ্ঞানদাকে সর্ব্বদাই তিনি স্নেহের “মা, মা” বুলিতে ডাকিয়া থাকেন। বিধবা ননদ কামিনীও জ্ঞানদার অকৃত্রিম যত্নে সকল দুঃখ, সকল শোক ভুলিয়া গিয়া সদাই ভাবে, বিধাতা যেন তাহার দুঃখময় জীবনের একমাত্র জুড়াইবার স্থল করিয়াই জ্ঞানদাকে তাহাদের বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন; কামিনী দিন-যামিনী

জ্ঞানদাকে 'বউ' বলিতে যেন অজ্ঞান হয়। অধিক কি, প্রতিবেশীগণও বলে যে "এমন ভাল মানুষের মেয়ে ত আমরা কখন দেখি নাই ; কলিকালে গৃহস্থের ঘরে এমন বউ কি আর পাওয়া যায় ?"

জগতের মন ভুলাইতে শিখিয়াও জ্ঞানদা অভাগিনী! সংসারের সকলেই তাহাকে আদর করে বটে, কিন্তু যার আদরে আদরিণী ও যার সোহাগে সোহাগিনী হইলে রমণী অমনি সুখের সমুদ্র সম্মুখে দেখিতে পায়, তারই আদর—তারই সোহাগে সে বঞ্চিতা! প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, যত্ন প্রভৃতি দূরে থাকুক্, যাহার মুখের মিষ্টকথাটী মাত্র পাইলেই সতীসাধ্বী স্বর্গসুখানুভব করে, জ্ঞানদার ভাগ্যে তাহাই দুর্ল্লভ। তাই জ্ঞানদা ভুবনমোহিনী হইয়াও অভাগিনী। জ্ঞানদার গুণে সবাই মুগ্ধ, কেবল নারীজাতির একমাত্র উপাস্য দেবতা—সেই সুখ-মোক্ষদাতা হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা-পুরুষ স্বামী গঙ্গেশচন্দ্রই জ্ঞানদাকে অন্তর হইতে নিরন্তর অন্তরে রাখিয়াছেন—তাহাকে আদৌ দেখিতে পারেন না।

জ্ঞানদার কপালের ফলাফল কপালেই লেখা আছে ; কিন্তু সে সর্ব্ব-লোক-বিমোহিনী হইয়াও কেন যে পতিপ্রেমে প্রবঞ্চিতা হইল, তাহার বিধি-লিপির এ নিগূঢ় রহস্য কেহ বুঝিয়াছেন কি ? জ্ঞানদা যদি লজ্জাবতী বঙ্গ-বালার বদলে 'বেহায়া' বিবি হইত—কুলের কুলবধূ না হইয়া কুলকলঙ্কিনী কুলটা হইত—যদি গৃহের গৃহলক্ষ্মী না হইয়া আসরের ঢপওয়ালী হইত—যদি সত্যবানের সাবিত্রী না হইয়া সুন্দরের বিদ্যা হইত—চিরসঙ্গিনী সহধর্ম্মিনী না হইয়া গৃহে স্ত্রী, সমাজে ভগিনী হইত—যদি বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়ে' বুদ্ধিমতী না হইয়া বেথুনের বিদুষীবালা হইত—অবগুণ্ঠনবতী অন্তঃপুর-বাসিনী না হইয়া সোণার কমল 'কমলিনী' "মডেল ভগিনী" হইত, তা হইলেও বা একদিন গঙ্গেশের হৃদয়ে স্থান পাইত। জ্ঞানদাকে অখাদ্য আহার করাইবার জন্য—বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত করমর্দ্দন (সেক্‌হাণ্ড) করিয়া স্বাধীনভাবে কথা কহিবার জন্য—জননী ও ভগিনীর সম্মুখে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য, প্রবাসে প্রেম-পত্র লিখিবার জন্য—ঘোম্‌টা খুলিয়া বাহিরে বেড়াইবার জন্য, গঙ্গেশচন্দ্র কতই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। উপরোধ—অনুরোধ—শেষে বিরোধ করিয়াও অবরোধ হইতে জ্ঞানদাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। গঙ্গেশ বাবু উপসংহারে সংহারমূর্ত্তিতে প্রচুর প্রহার উপহার দিয়া আহার ব্যবহারেও

বঞ্চিতা করিতে ত্রুটী করেন নাই। অনাহারে অনিদ্রায় সতী পতিপদাঘাত বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াও কুলমান ও লজ্জাধর্ম্ম মাথায় করিয়া রাখিয়াছে। এত যাতনা পাইয়াও সতীর মতি পতিপদে—গতি পুণ্যপথে!

জ্ঞানদার উপর দারুণ রাগ গঙ্গেশের হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় মিশাইয়া আছে? কোন একটী নূতন কারণ ঘটিলেই আবার সেই অস্থিমজ্জাগত ক্রোধাগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্জ্বলিত হয়। গতরাত্রে গঙ্গেশের একজন বন্ধু আসিয়াছিলেন; বন্ধুকে সাদরে সম্ভাষণ করিবার জন্য গঙ্গেশ বাবু যৎপরোনাস্তি জ্বালাতন করিয়াছিলেন। কিন্তু সতীসাধ্বী লজ্জাবতী লজ্জায় জড়সড় হইয়া ঘোমটায় মুখ লুকাইয়া পতির পদাঘাত, মুষ্টাঘাত, চপেটাঘাত সকলই সহ্য করিয়া নীরবে সারারাত্রী কাটাইয়াছে। অবশেষে বন্ধু ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া যাওয়াতে এবং স্বয়ং স্ত্রী-স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারায় গঙ্গেশ উন্মত্তের ন্যায় উল্লম্ফন দিয়া মহারোষে জন্মের মত জ্ঞানদার জীবননাশে উদ্যত হইয়াছিলেন; জ্ঞানদা মৃতাপ্রায় হইয়া আসিলে গঙ্গেশের চৈতন্য হইল। ভাবিলেন ইংরাজের রাজ্যে একাজ ত বড় সোজা নয়, অন্য উপায়ে ইহাকে কৌশলেই গৃহ-বহিস্কৃতা করিতে হইবে। এ পাপ, গৃহে থাকিলে তাঁহার সুখের আশা যে সমূলে বিনষ্ট হইবে, ইহাই তাঁহার আজিকার ধারণা! জ্ঞানদাকে গৃহের বাহির না করিলে তাঁহার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইবে বিবেচনা করিয়া সমস্ত রাত্রি তাহারই কৌশল স্থির করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানদা মৃতপ্রায় হইয়াও প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াছিল, সর্ব্বশরীরে যেরূপ দারুণ বেদনা, অন্য মেয়ে হইলে সে দিন উঠিতেই পারিত না; কিন্তু অঙ্গের বেদনা অঙ্গে রাখিয়া অতি কষ্টে জ্ঞানদা গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়াছিল। কামিনী তাহার তখনকার আকার-প্রকার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বউ! তোমার শরীর কি অসুস্থ আছে?" জ্ঞানদা উত্তর করিল "কি জানি ভাই! কাল্ রাত্রে সর্ব্বাঙ্গে যেন কেমন বেদনা হ'য়েছে!" কামিনী তাহাই বুঝিয়া বলিল "বোধ হয় শয়নের দোষেই হ'য়েছে, বিছানা বালিস্‌গুলি মনে কোরে আজ রোদে দিও—তা হ'লে সেরে যাবে।" জ্ঞানদা মেঘভাঙ্গা মৃদু জ্যোৎস্নার ন্যায় মৃদু হাসিয়া বলিল "যে অভদ্রা বর্ষা! রোদ কোথায় বল দেখি?" কামিনী কহিল "তাইত ভাই! পোড়া দেবতার আর যেন ধরণ নাই!" জ্ঞানদা বলিল "দেবতাকে আর পোড়া বলিও না—আমার কপালই পোড়া!"

জ্ঞানদার পোড়া কপালই বটে ; আহা! সতী-লক্ষ্মী এয়োরাণী মনের কষ্ট মনে রাখিয়াও কামিনীর সহিত কেমন হাসিয়া হাসিয়া গল্প গুজব করিতেছে! কিন্তু তাহার অদৃষ্টচক্র ঘুরিয়া যে আজ কোন্ পথে যাইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। জ্ঞানদার আজিকার দিনের অদৃষ্টের ফলাফল কেহই জানে না ; জানেন কেবল সেই অন্তর্য্যামী, আর তাহার স্বামী! যে মহাপুরুষের নিয়তিচক্র, আর যে মহাপুরুষের কৌশল-চক্র! বেলা দ্বিপ্রহরের সময় গঙ্গেশচন্দ্র বাটীতে আসিয়া জননীকে বলিলেন "মা! আমার শ্বশুরের বড় ব্যায়রাম ; তাই তোমার আদরের বউকে পাঠাইবার জন্য সেখান হইতে পত্র আসিয়াছে, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আমাকেই সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।" এ সংবাদে কি আর জননী তাঁহার বধূমাতাকে পাঠাইতে অস্বীকৃতা হইতে পারেন? কামিনীও বড়ই চিন্তিতা হইল ; একে বউয়ের বিচ্ছেদে সে তিলার্দ্ধ থাকিতে পারে না, তাহাতে আবার সেই ভালবাসার পাত্রীরই পিতার অসুস্থ সংবাদ! জ্ঞানদা পিতার পীড়ার সংবাদে যে বিশেষ মনঃপীড়া পাইল ও সত্বরেই যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

সন্ধ্যার গাড়ীতেই জ্ঞানদা স্বামীর সহিত পিত্রালয়ে চলিল ; গঙ্গেশচন্দ্র জ্ঞানদাকে স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া নিজে পার্শ্বস্থ অপর গাড়ীতে উঠিলেন। জ্ঞানদা আজ পিত্রালয়ে কি যমালয়ে যাইতেছে, গাড়ীতে উঠিলেই এই কথাটী মুহূর্ত্তের জন্য একবার তাহার মনে উদয় হইল। কিন্তু নানা চিন্তায় পরক্ষণেই আবার তাহা ভুলিয়া গিয়া পিতার পীড়ার কথা ভাবিতে লাগিল। গাড়ীতে উঠিলে সাধারণতঃই ঘুম পায়, তাহাতে আবার গতরাত্রে জ্ঞানদা প্রহার-যন্ত্রণায় অজ্ঞানা হইয়াছিল, এই সকল নানা কারণে ভাবিতে ভাবিতে তাহার ঘুম আসিয়া পড়িল। জ্ঞানদার নিদ্রা-কালমধ্যে রেলের গাড়ী কতদূর চলিয়া গেল ; ঘুম ভাঙ্গিলেও দেখিল গাড়ী চলিতেছে, কিন্তু কতদূর যে আসিয়াছে—তাহার বাপের বাড়ীর ষ্টেসন ফেলিয়া আসিয়াছে, কি এখনও যাইতে বাকী আছে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে একটী অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া বলিল "তুমি গাড়ী হইতে নামিয়া বাহিরে এস, তোমার স্বামী টিকিট দিয়া বাহিরে গেলেন এবং আমাকে তোমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন!" জ্ঞানদার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—মস্তক ঘুরিতে লাগিল!

একি সর্ব্বনাশ! কুলবধূর একি বিড়ম্বনা! স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের নিকট জ্ঞানদা যে দাঁড়াইতেই পারে না—তা তাহার সহিত যাইবে কি? আর কথাই বা কহিবে কি? আর উপায় না দেখিয়া নিরুপায়ের উপায় ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সেই অপরিচিত পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, আর ভাবিল, বুঝি প্রকৃতই পিত্রালয়ের পরিবর্ত্তে যমালয়ে যাইতে হয়।

অপরিচিত পুরুষটী অদূরে পদ্মারধারে একখানি বাষ্পীয় পোত বা ষ্টীমারে জ্ঞানদাকে উঠাইল। বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে এতক্ষণ জ্ঞানদা কিছুই দেখিতে পায় নাই; নদীতীরবর্ত্তী আলোক সহায়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া সে আকুল হইল। এত বড় নদী ও এমন কলের জাহাজ ত সে কখন দেখে নাই! মনে মনে বলিল, "কোথায় আসিলাম? 'তিনি' কই?" পুরুষটী জ্ঞানদাকে ষ্টীমার মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান দেখাইয়া তথায় বসিতে বলিল। ষ্টীমার তখনও ছাড়ে নাই, জ্ঞানদা অবসর বুঝিয়া অনেকের অলক্ষিতে "আর উপায় নাই—যমালয়েই যাইতে হইল! কোথায় দ্রোপদীর লজ্জানিবারণ শ্রীহরি!" বলিয়াই জাহাজ হইতে পদ্মার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। একে পদ্মার স্রোত—তাহাতে বর্ষাকাল! প্রবল স্রোতে জ্ঞানদা ভাসিল; সেই অপরিচিত পুরুষটীও তাড়াতাড়ি ষ্টীমার হইতে নামিয়া একখানি নৌকা ভাড়াপূর্ব্বক সেই অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া স্রোতাভিমুখে জ্ঞানদার অনুধাবন করিল। ক্রমে বহুলোকই এই ঘটনা জানিতে পারায় জনকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল—**পদ্মার ঘাট!**

তৃতীয় অধ্যায়।

দৈববাণী।

রজনী গভীরা! নভোমণ্ডল ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন! চতুর্দ্দিক অন্ধকার। ধরাতল নিবিড় তমসাচ্ছন্ন! একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহাতে আবার আকাশে প্রাবৃটের করাল কৃষ্ণমেঘ; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রকৃতি দেবীর নিতান্ত হীনাবস্থা। দুর্দ্দিন দুঃসময় পড়িলে সকল সহচরই একে একে অদৃশ্য হয়; প্রকৃতিদেবীরও আজি তাহাই ঘটিয়াছে। চিরবান্ধব নক্ষত্রগণ পরিত্যাগ করিয়াছে—পরম সখা তরুরাজি লুক্কায়িত হইয়াছে—

সহচরী লতিকা সুন্দরীগণ অদৃশ্য ভাবে স্ব স্ব স্বামীর গলদেশ জড়াইয়া রহি-য়াছে—গায়ক ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঝিল্লিরব বন্ধ করিয়াছে—নর্ত্তক বৃক্ষশাখা নৃত্য বন্ধ করিয়া গোপনে প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে—ভৃত্য পবন, বন উপবন, গ্রাম নগর, প্রাসাদ কুটীর, পর্ব্বত পুলিন, কিছুরই আর সেবা করিতেছে না—পরিচারিকা তরঙ্গিনী কুল কুল স্বরে আর দেবীর পদধৌত করিতেছে না—প্রহরী ফেরুপাল ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া করিয়া জগৎ জাগাইতেছে না—বিদূষক (মোসাহেব) কোকিল দুঃসময় পড়িবে জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে; এমন কি, পশুপক্ষী মানব প্রভৃতি কোটী কোটী সন্তানগণও প্রকৃতিদেবীর এই দুর্দ্দশার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না; তাহারা সকলেই জননীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু জননী প্রকৃতিদেবীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দুহিতা কুসুম সুন্দরীগণ নিজ নিজ কক্ষে বসিয়া কাঁদিতেছে; উদ্যানকক্ষে বসিয়া গোলাপ, যুথিকা, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ, সেফালিকা, রঙ্গন, রজনীগন্ধ, চামেলি, জাতি, করবী, টগর, সূর্য্যমুখী, কৃষ্ণকালী প্রভৃতি অবিবাহিতা ভগ্নীগণ কাঁদিতেছে; ভগ্নোদ্যান, পথিপার্শ্ব বা গৃহ-প্রাঙ্গনকক্ষে বসিয়া বক, বকুল, বাকস, পলাশ, কাঞ্চন, চাঁপা, অশোক, প্রভৃতি বিধবা কন্যাগণ এক এক স্থানে এক এক জন কাঁদিতেছে—সরোবরকক্ষে বসিয়া, পতি থাকিতেও বিধবা অর্থাৎ বিরহিণী সরোজিনী ও কুমুদিনী বিষণ্ণভাবে গ্রীবাদেশ নত করিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে—আর মঞ্চ প্রাচীর বা সুদীর্ঘ তরু প্রভৃতি কক্ষে বসিয়া তরুলতা ও অপরাজিতা দুইটী নবোঢ়া বালিকাও কাঁদিতেছে।

প্রকৃতিদেবীর এই দুর্দ্দিনে জ্ঞানদাও তাহার দুর্দ্দিন দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জলে ঝাঁপ দিয়াছে। জ্ঞানদা জানিত যে আত্মহত্যা করা মহাপাপ, কিন্তু কোনরূপে সেই অপরিচিত পুরুষটীর হাত হইতে উদ্ধার হইবার জন্যই জলে পড়িয়াছিল! প্রাণ পরিত্যাগ করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিলে যে ভয়ানক নরক-যন্ত্রণা সহিতে হয়, তাহা সে জানিত। তাই জ্ঞানদা বিশেষ সন্তরণ কৌশলে এবং স্রোতের অনুকুল গতিতে ভাসিতে ভাসিতে নিকটস্থ একটী চড়ায় গিয়া উঠিল। উঠিয়া বসিবার বা দাঁড়াইবার ক্ষমতা আর তাহার নাই; নিতান্ত অবসন্ন দেহে নদীকুলে সেই চড়ার উপর পড়িয়া রহিল। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, অদৃষ্টচক্র কখন যে কোন্ পথে

ঘুরিয়া যায় তাহা কে জানে? অদ্য পরমুহূর্ত্তেই যে কপালে কি ঘটনা ঘটিবে, তাহা কি কেহ বলিতে পারে? তবে মানুষ নাকি আশার দাস, তাই দিনরাত মায়া-বন্ধনে ভবের ঘোরে ঘুরিয়া মরে! যে সরলা যুবতী ক্ষুদ্র হরিণ শিশুটীর ন্যায় গৃহ-তপোবনে ফুল্লপ্রাণে কত ক্রীড়া ·চাতুর্য্য দেখাইবে, যে পরিমলময় যুথিকা কুসুম সোহাগ শাখায় আদরবৃন্তে হাসিতে হাসিতে আপন মনে ফুটিবে—ধীর বাতাসে দুলিবে, তাহার আজ এত শাস্তি কেন? সকলই কি সেই নিয়তিচক্রের পরিবর্ত্তনের ফল নহে?

সেই ঘোরতর অন্ধকারে গভীর রজনীতে জ্ঞানদা নদীরকূলে পড়িয়া শুনিতে পাইল, কে যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—"যে লজ্জানিবারণের নাম করিয়া জলে পড়িয়া আজ লজ্জা রক্ষা করিয়াছ, তাঁহাকেই একবার কাতর-কণ্ঠে বিপদ-বারণ মধুসূদন বলিয়া ডাকিলে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে।" একি! এই দারুণ আঁধারময়ী রজনীতে এই ভয়ানক অবস্থায়, এই ভয়ানক নির্জ্জন স্থানে এমন কথা কে বলিল? জ্ঞানদা কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ইহাকে দৈববাণী বিবেচনা করিল; কিন্তু বড় বেশীক্ষণ আর তাহার বিবেচনা করিবার শক্তি থাকিল না—অবসন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকায় শীঘ্রই জ্ঞানদার জ্ঞান চৈতন্য তিরোহিত হইল! আর এখন কেমন করিয়া সে বুঝিবে যে ইহা মনুষ্য কণ্ঠস্বর কিম্বা—দৈববাণী?

চতুর্থ অধ্যায়।

বলাই মামা।

অনেক দিন পরে বলাই মামা কাশী হইতে আসিয়া নদীয়া জেলান্তর্গত গণেশপুর নামক গণ্ডগ্রাম খানির একটী প্রাচীন অট্টালিকার দ্বারদেশে ছল-ছল নেত্রে দাঁড়াইয়া আছেন। এক একবার এক এক দিকে চাহিতেছেন আর মনে মনে বলিতেছেন—"মা ভবানীর ভেল্কীবাজী আজিও মানুষ বুঝিতে পারিল না, তাই সবাই মনে করে চিরদিনই বুঝি সমান যাইবে! কি দেখিয়াছিলাম, আর কি দেখিতেছি? মা ব্রহ্মময়ি! কবে বুঝিব মা, তোর এই ভবের বাজার কেমন মজার? না জানি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশের কি দশা ছিল?"

মনে মনে বলাই মামার এইরূপ বলিবার বিশেষ কারণ আছে। যে বাটীর দরজায় তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা এই গ্রামের জমিদার হরপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সুবিস্তৃত অট্টালিকা! বড় অধিক দিন নয়, এই চৌধুরীদিগের প্রতাপে একদিন বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল—বাঘে মানুষে একত্রে এক ঘাটে জল পান করিত! ইহাঁদের সুবিস্তৃত জমিদারীর সুশৃঙ্খলা দেখিয়া কেহ কখন কল্পনাও করিতে পারিত না যে, কালে আবার ইহার ভগ্ন দশা দেখিতে হইবে। ইহাঁরা নূতন জমিদার ছিলেন না—বনিয়াদী ঘর! বিপুল বিষয় সম্পত্তি বরাবরই পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এইবার হতভাগ্য হরপ্রসন্নের অদৃষ্টে চঞ্চলা কমলা ঠাকুরুণ বড়ই বিমুখ হইয়াছেন। না হইবেনই বা কেন? মামলা মোকদ্দমা যে কাহাকে বলে, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা জানিতেন না; কোন বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে দশের সালিশী ভিন্ন নালিশের দিকে তাঁহারা কখনই যাইতেন না—তাঁহারা হতশ্রী হইবেন কেন? জমিদার হরপ্রসন্ন রায় এখন উকীল মোক্তার—হাকিম ধর্ম্মাবতার, জজ ম্যাজিষ্টার—এটর্ণী ব্যারিষ্টার প্রভৃতি বুঝিয়া মামলা মোকদ্দমা—দাঙ্গা হাঙ্গমা এবং মিথ্যা সাক্ষীদান—উৎকোচ দানাদিতে দক্ষ হইয়াছিলেন—কেন শ্রী তাঁহাকে ত্যাগ না করিবেন। যে কারণে বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশ জমিদারই আজ জমিশূন্য, সেই কারণেই হরপ্রসন্ন রায়েরও এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সামান্য একটী বিষয়ের জন্য জেদাজেদি সূত্রে বিলাত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইয়া দুর্ভেদ্য ঋণজালে জড়িত হইয়া হরপ্রসন্ন রায় সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন।

বলাই মামা হরপ্রসন্ন রায়ের মাতুল বলিয়া বালক বৃদ্ধ সবাই তাঁহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিত—তিনি যেন সকলেরই সরকারী 'মামা' স্বরূপ ছিলেন। জমিদার ভাগিনেয়র সংসারে বলাই মামা বরাবরই সুখে কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু হরপ্রসন্ন রায় মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার সময় বলাই মামা বারম্বার তাঁহাকে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন; তাহাতে ভাগিনের ক্রুদ্ধ হইয়া মামাকে নানা কটুবাক্য বলায় মনের দুঃখে তিনি কাশী চলিয়া গিয়াছিলেন। মায়ার টান্—বড় টান্। চিরদিন এ সংসারে থাকায় সকলের উপর তাঁহার কেমন এক প্রকার মায়া জন্মিয়াছিল; বিশেষতঃ হরপ্রসন্ন রায়ের জ্ঞানদা নাম্নী কন্যাটীকে বলাই মামা প্রাণের অধিক জ্ঞানে স্নেহ করিতেন। তাহারই মায়ায় পড়িয়া—তাহাকেই দেখিবার জন্য ছয়

বৎসর পরে আবার তিনি এই গণেশপুরে আসিয়াছেন। হরপ্রসন্ন রায়ের প্রভাসচন্দ্র নামক একটী পুত্র এবং জ্ঞানদা নাম্নী একটী কন্যা ভিন্ন আর কোন সন্তানাদি ছিল না। পুত্রটী কলিকাতায় থাকিয়া কালেজে পড়িয়া সাহেবী চালচলন শিখিতেছিল বলিয়া বলাই মামা তাহাকে বড় দেখিতে পারিতেন না; কিন্তু কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরীকে তাহার জন্মাবধি আট বৎসর কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা কোলে পিঠে করিয়া রাখিতেন এবং বরাবরই 'খুকি দিদি' বলিয়া ডাকিতেন। বলাই মামা খুকিদিদিকে প্রাণ ভরিয়া আদর করিতেন; কখন তাহার মুখচুম্বন করিতেন—কখন তাহার সহিত লুকাচুরী খেলিতেন—কখন খুকিদিদির খেলা ঘরে গিয়া কৃত্রিম ভাবে ধুলার ভাত খাইতে বসিতেন—কখন তাহাকে উপকথাদি শুনাইতেন—কখন কোন কুব্জ পৃষ্ঠ বা কদাকার মানুষ অথবা বৃষ বানর ও কুক্কুরাদির সহিতই খুকি-দিদির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেন—আবার কখন বা নিজেই তাহার সহিত মালা বদল করিতেন। জ্ঞানদাও ঠাকুর দাদার নিকট থাকিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত। ভাগিনেয়র উপর রাগ করিয়া মামা সেই অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, এত আদরের খুকিদিদিকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন; ছয় বৎসরে সে কত বড় হইয়াছে—কেমন ঘরে, বরে পড়িয়াছে—কেমন পতি-প্রেম পাই-য়াছে—কেমন ঘরণী গৃহিণী হইয়াছে, এবং যে খুকিদিদি তাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, সে এখন তাঁহাকে ভুলিয়া কেমন ভাবে আছে, এই সকল দেখিবার জন্যই তাঁহার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। দরজার নিকট যে মনোহর কুসুম-কাননে একদিন জ্ঞানদার হাত ধরিয়া কুসুম চয়ন করিতেন এবং সেই কুসুমের মালা গাঁথিয়া জ্ঞানদার গলায় পরাইয়া দিতেন, সেই পুষ্পোদ্যান এখন জঙ্গল পরিপূর্ণ হইয়াছে। উদ্যানপার্শ্বে একটী লতা-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; জ্ঞানদাকে কোলে লইয়া ফুলসাজে ফুলময়ী সাজাইয়া বলাই মামা সেই কুঞ্জমধ্যে সময়ে সময়ে বসিয়া থাকিতেন এবং নিজে গান গাহিয়া জ্ঞানদাকে গান শিখাইতেন—কখন কখন বা গল্প গুজব, শ্লোক ছড়া প্রভৃতিও বলিতেন। কুঞ্জটীর নাম রাখিয়াছিলেন—'জ্ঞানদা কুঞ্জ!' সেই লতা-কুঞ্জের দশা এখন কি হইয়াছে?

জ্ঞানদা-কুঞ্জ এখন কি জ্ঞানই বা দিতে পারে, দেখিবার জন্য বলাই মামা বড় ব্যাকুল হইলেন। একদিন জ্ঞানদাকে লইয়া জ্ঞানদা-কুঞ্জে বুড়া অনেক জ্ঞান পাইতেন; আর এখন বোধ হয় জ্ঞানদা-কুঞ্জ এই জ্ঞান দিবে—"চিরদিন

কখন সমান না যায়।” যাহা হউক, বলাই মামা ধীরে ধীরে সেই ভগ্নদশাপন্ন জঙ্গলাবৃত কুসুমোদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক জ্ঞানদা-কুঞ্জের দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যদেব অস্তে গিয়াছেন, প্রায় সন্ধ্যা হয়! গোধূলিগগণে দুই একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখা দিতেছে! সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে অন্ধকারময় লতিকা-কুঞ্জটীর নিকট গমন করিবামাত্র বলাই মামা মনুষ্য-কণ্ঠরব শুনিতে পাইলেন। লতায় পাতায় বেষ্টিত কুঞ্জটী বন-জঙ্গলাবৃত হওয়াতে আরও অন্ধকারময় গোপনীয় স্থানের ন্যায় হইয়াছে। তাঁহাদের সাধের কুঞ্জে আজ এমন সময় কাহারা কথা কহিতেছে শুনিবার জন্য বলাই মামা অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলেন একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক কি পরামর্শ করিতেছে; তাঁহার কৌতুহল আরও বাড়িল, বিশেষ মনোযোগ দিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।—

পুরুষ।—আর কিছুকাল পরে এই সুবৃহৎ অট্টালিকা আমারই হইবে; তুমি ইহার একমাত্র অধীশ্বরী হইবে। এখন আর অন্য মত করিও না।

স্ত্রী। সে এখন অনেক দূরের কথা! প্রভাস থাকিতে সে আশা তুমি স্বপ্নেও করিও না।

পুরুষ। প্রভাস না থাকিলে ত হইবে?

স্ত্রী। অবশ্য!

পুরুষ। বোধ হয় কল্যই শুনিতে পাইবে, প্রভাস আর এজগতে নাই।

স্ত্রী। সে কি কথা! তুমি জেগে স্বপন দেখ নাকি?

পুরুষ। স্বপন নহে সুন্দরি! গোলাম সর্দ্দারকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছি।

স্ত্রী। (ভয় ও বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে) কি সর্ব্বনাশ! গোলাম সর্দ্দার গিয়াছে?

পুরুষ। তুমি বল কি? সে যে এসকল বিষয়ে কেমন পটু, তাহা কি তোমার মনে নাই?

স্ত্রী। তাহা ত বিলক্ষণই জানি; তবে আর এবার রক্ষা নাই—তাহার হাতে কিছুতেই নিস্তার নাই, গণেশপুর প্রভাসশূন্য হইবে। আহা! বুড়াবুড়ি বড়ই কাঁদিবে। আর জ্ঞানদাও শুনিতে পাইলে শ্বশুর-বাড়ী বসিয়া তাহার দাদার জন্য কাঁদিয়া বুক ভাসাইবে।

পুরুষ। এখন সে সব কথা ভাবিবার সময় নহে? চল, দেখিগে গোলাম-সর্দ্দার আসিল কি না?

বলাই মামা আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। তাহারা কোথা দিয়া কখন যে চলিয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এই ভয়ানক গোপনীয় ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—বলাই মামা।

পঞ্চম অধ্যায়।

মায়ার টান্!

কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলাই মামা ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। চারিদিক অবলোকন করিয়া দূর হইতে দেখিলেন একটী নির্জ্জনকক্ষে বসিয়া দরিদ্র দম্পতী কথোপকথন করিতেছেন; সম্মুখে একটী মৃৎপ্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে! প্রদীপটীর অবস্থা হইতে বলাই হরপ্রসন্ন বাবুর অবস্থার কিছুই প্রভেদ দেখিলেন না। যে অন্দরমহল একদিন রমণী মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ ছিল—বালক বালিকা, দাসী পাচিকা, আত্মীয় কুটুম্বিনী, সম্পর্কীয়া দূরসম্পর্কীয়াগণের কলরবে কাণপাতা যাইত না, সে স্থানে এখন মূষিক মার্জ্জার ভিন্ন বলাই মামা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রভাতকালীন নক্ষত্রমালার ন্যায় অবস্থার সঙ্গে সকলই চলিয়া গিয়াছে! কেবল চিরজীবনের সহচরী, সুখ দুঃখের ভাগিনী অর্দ্ধাঙ্গী সহধর্ম্মিণীই এখন হরপ্রসন্নের শেষ ভরসাস্থল! তাই আজ এই বিজন অন্তঃপুর মধ্যে নিভৃতকক্ষে বসিয়া স্ত্রী পুরুষদ্বয় মুখামুখী হইয়া বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। সেই প্রদীপের মৃদু আলোকে উভয়েরই মুখ ঘোর বিষাদাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছে—যেন দারুণ চিন্তায় দম্পতীর অন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে—যেন নিদারুণ দুঃখের কাহিনীই দুই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে!

দেখিয়া শুনিয়া বলাই মামার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কি করিবেন, মনের কষ্ট মনে রাখিয়া ভাগিনেয়র সহিত দেখা করিলেন। বলাই মামাকে দেখিয়া দরিদ্র দম্পতীর দুঃখ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল; গৃহিণী মামাশ্বশুরকে দেখিয়া নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোম্‌টা দিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। হরপ্রসন্ন বাবুর চক্ষু ফাটিয়া প্রবলবেগে জলধারা বাহির হইতে

লাগিল; শতধারায় বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল! মাতুল কহিলেন "দুঃখ কি বাবা! এ সংসারের নিয়মই এই! সুখের পর দুঃখ, জোয়ারের পর ভাঁটা, পূর্ণিমার পর অমাবস্যা হইয়াই থাকে। প্রাণ ভরিয়া দিবানিশি দুর্গতিহারিণী দুর্গা নাম কর—সকল দুর্গতি ঘুচিয়া যাইবে।"

অনেক দিন পরে মামাকে পাইয়া হরপ্রসন্ন কত দিনের কত দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন এবং শেষে অনুতাপ করিয়া কহিলেন "মামা! কেন তখন তোমার কথা শুনি নাই? কেন তখন সে দুর্ম্মতি হইয়াছিল? তুমি মোকদ্দমা করিতে নিষেধ করিলেও কেন তখন মত্ত বারণের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া সে বারণ শুনি নাই? এখন দুর্ব্বিসহ যাতনায় প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে। কি করিব, কোথায় যাইব, কিছুই ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছি না। এখন তুমি আসিয়াছ মামা! উপায় বলিয়া দাও; আর তোমার অবাধ্য হইব না। একবার তোমার কথা না শুনিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি; এক্ষণে উপায় কি?" বলাই কহিলেন "উপায় পরে বলিব। এখন প্রভাস কোথায়?"

হর। তাহার কথা ছাড়িয়া দাও; সে সমাজচ্যুত ধর্ম্মচ্যুত পাষণ্ড পুত্রের আর নাম করিও না।

বলাই। কেন? তুমি যে এত কষ্টে তাহার লেখা পড়ার খরচ চালাইলে, মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিজে না খাইয়াও যে প্রভাসের কালেজের টাকা পাঠাইয়াছ, তাহার কি কিছুই সে এখন শোধ দিবে না? এমন অসময়ে হতভাগ্য মা বাপের দুঃখ কি বুঝিবে না?

হর। যদি এই বয়সে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া তাহার সহিত আমরা যোগদান করি, তা হ'লেও শোধ দেয় কি না সন্দেহ!

বলাই। আমার প্রাণের খুকিদিদির কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?

হর। কেমন করিয়া পাইব? জ্ঞানদাকে আমার দেখিয়া আসে এমন লোকই বা কোথায় পাইব? অপর লোক পাঠানও ঘটিয়া উঠে না—জামাই বাপাজীও কোন সংবাদ দেন না। মা আমার শ্বশুরবাড়ী বসিয়া হয়ত কতই কাঁদিয়া থাকেন; তবে জ্ঞানদা আমার বড়ই জ্ঞানবতী মেয়ে—তাই যা হোক্!

এতক্ষণের পর এইবার বুড়া বলাইয়ের চক্ষে জল আসিল; তিনি আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণের খুকিদিদির

কোন সংবাদ না পাইয়া নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। যে খুকিদিদিকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছেন—যে জ্ঞানদার জন্য তিনি জ্ঞানবাপী ত্যাগ করিয়া সদ্য মুক্তিদাতা বিশ্বেশ্বরের চরণ ছাড়িয়া আবার দেশে আসিলেন, তাহার কোন সংবাদ এখনও না পাইয়া তিনি অজস্রধারে রোদন করিতে লাগিলেন। ভাগিনেয় কহিলেন "মামা! কাঁদিয়া আর কি হইবে? কল্য জ্ঞানদার শ্বশুরবাড়ী তোমার খুকিদিদিকে দেখিতে যাইও। সে গ্রাম এখান হইতে ৮।১০ ক্রোশ দূর হইবে।" তখন বলাই মামা কিছু আশ্বস্ত হইলেন এবং সন্ধ্যাকালে প্রথম আসিয়াই সেই ভগ্নোদ্যান মধ্যে একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষের কণ্ঠস্বরে যে ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা ভাগিনেয়কে বলিতে লাগিলেন।

হরপ্রসন্ন বাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিয়া কহিলেন "মামা! এ সকল বৃত্তান্ত আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। সেই পুরুষটী আর কেহ নহে—আমার জ্ঞাতি ভ্রাতষ্পুত্র পাষণ্ড রমেশ! আর সেই স্ত্রীলোকটী এ গ্রামের মথুর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মোহিনী! বাল্যকাল হইতে ইহারা দৃঢ় প্রণয় বন্ধনে বাঁধা ছিল; রমেশ তাহার একান্ত ভালবাসার পাত্রী বাল্য-সখী মোহিনীকে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছিল। মোহিনীও তাহার ছেলে বেলাকার সাথী রমেশকেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু কালের গতিকে দেশাচারের অত্যাচার ও বল্লালের বিড়ম্বনা তাহাদের দুইজনকে পৃথক করিয়া দিয়াছিল। মথুর চাটুর্য্যে কুলভঙ্গের ভয়ে অন্যত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের কিছুদিন পরেই মোহিনীর স্বামীর মৃত্যু হয় এবং তাহার পিতা মথুর নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। এখন রমেশ সুবিধা পাইয়া বিধবা বিবাহের চেষ্টায় ফিরিতেছে এবং আমার সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিতেছে। রমেশ যুবক আর মোহিনী যুবতী! এখন উহাদের কোন পাপ কার্য্যেই ভয় নাই। বিধবা মোহিনী দ্বিতীয়বার বিবাহে অসম্মতা ছিল; কিন্তু রমেশের প্রলোভনে পড়িয়া তাহার সে ভাব দূর হইতেছে—সমাজের বন্ধনও তাহারা মানিতে চায় না। ঋণদায়ে আমার সম্পত্তি নীলামে উঠিলে অনেক জমাজমী ঐ পাষণ্ড রমেশ খরিদ করিয়াছে। এখন ইচ্ছা, আমাকে মারিয়া আমার প্রভাসকে মারিয়া এই বাড়ীখানি পর্য্যন্তও দখল করে। আমার দাসী শ্যামাবৈষ্ণবীর মুখে আমি এ সকল কথা শুনিয়াছি। শ্যামা প্রভাসকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে

বলিয়া তাহার প্রভাসের উপর বড়ই মায়া! সে এই সকল কথা গোপনে শুনিয়া আমাকে জানায় এবং তদ্দণ্ডেই কলিকাতায় প্রভাসকে সতর্ক করিতে গিয়াছে। শ্যামা যখন গিয়াছে, তখন আমি তাহাতে বেশ নিশ্চিন্ত আছি। শ্যামা থাকিতে প্রভাসের অঙ্গে আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগিবে না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ তোমার যেমন জ্ঞানদা—শ্যামার সেইরূপ প্রভাস।"

বলাই মামা কহিলেন "শ্যামা যথার্থই প্রভু-পরায়ণা বটে; তাহার তুল্য দাসী দেখিতে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, শ্যামা রমেশ মোহিনীর এত কথা জানিল কেমন করিয়া?"

হর। শ্যামা বড়ই চতুরা; সে অনেক কৌশল, অনেক চাতুরী জানে।

বলাই। গোলাম সর্দ্দার কে?

হর। সে একজন এখানকার প্রসিদ্ধ বদ্মায়েস্।

বলাই। কেহ রাজসরকারে ওরূপ বদ্মায়েস্‌কে ধরাইয়া দেয় না কেন?

হর। কেহ কি আর ধরিতে ছুঁইতে পায়? এত গোপনে দুষ্কার্য্য করে যে, কেহই জানিতে পারে না। আবার কেহ কখন তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেই তাহার সর্ব্বনাশ করে। সে কত লোককে খুন জখম এবং কত লোক পাগল করিয়া যে কাহারও পৌষ মাস কাহারও সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। শুনা যায়, মোহিনীর স্বামীর মৃত্যু এবং তাহার পিতার নিরুদ্দেশের কারণই গোলাম সর্দ্দার।

বলাই। ঠিক তাই বটে; কারণ পুরুষ কণ্ঠস্বরে গোলামের নামটী উচ্চারিত হইবামাত্রই স্ত্রীকণ্ঠস্বর যেন জড়িত ভাব ধারণ করিতে শুনিয়াছিলাম। তা, যাই হোক্ প্রভাসের কোন ভয় নাই ত?

হর। কিছু না; শ্যামা যখন গিয়াছে, তখন সহস্র গোলাম সর্দ্দার গেলেও প্রভাসের কিছুই করিতে পারিবে না।

বলাই। আগে আমি আমার খুকিদিদিকে দেখিয়া আসি; তার পর সকল উপায় করিব। রমেশের আশা, মোহিনীর ভরসা ভাল করিয়া মিটাইব—গোলামেরও বদ্মায়েসী একবার দেখিব।

হর। গোলাম সর্দ্দার এখন রমেশের অনুগত ভৃত্য। তাহারই নিকট বেতন পায়।

বলাই। তাহাতেই বা ভয় কি? দুর্গাপ্রসন্নের পুত্র রমেশ যে এমন পাষণ্ড

হইয়াছে, তাহা ত জানি না। যাই হোক্ বাবা! তোমার কোন ভয় নাই। আমি যখন আসিয়াছি, তখন তাহার বিহিত করিবই করিব। খুকিদিদিকে দেখিবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। কল্য প্রত্যূষে উঠিয়াই খুকিদিদির শ্বশুরবাড়ী যাইব। তাহার পর ৪।৫ দিনের মধ্যে আসিয়াই আমি সকল উপায় করিব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও না—শ্যামার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিও না—শীঘ্র আবার লোক পাঠাও। সেই লোক যেন শ্যামার সহিত প্রভাসকে বাটী লইয়া আসে। আমিও পারি ত, খুকিদিদিকে লইয়া আসিব।

তখন হরপ্রসন্ন মাতুলের কথানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একবার মাতুল বাক্য না শুনিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছেন, আর কি না শুনিয়া থাকিতে পারেন? পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই কলিকাতায় প্রভাসকে শ্যামার সহিত আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন এবং জ্ঞানদাকে একবার পিতৃভবনে আনিবার জন্য তাঁহার বৈবাহিককে ও জামাতাকে পত্র লিখিয়া মাতুলের হস্তে দিলেন। বলাই মামা পত্র লইয়া আনন্দিত মনে খুকিদিদিকে দেখিবার জন্য প্রাতঃকালেই জ্ঞানদার শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলেন। আহা! ইহাকেই বলে মায়ার সংসারে—**মায়ার টান্!**

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেবী কি পাগ্‌লী?

বলাই মামা ত জ্ঞানদাকে দেখিতে তাহার শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলেন; কিন্তু জ্ঞানদা কোথায়? সে আর কি সেখানে আছে? স্বয়ং স্বামীই যে সতীকে বনবাস দিয়া আসিয়াছেন। বড় আশায় বলাই মামার নিরাশ হইতে হইবে! তাঁহার বড় সাধের খুকিদিদি আজ অদৃষ্টচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় পড়িয়া আছে, তাহার ঠিক নাই! কোন্ কাননে সে কাঙ্গালিনী কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া আছে—কোন্ মরু মধ্যে সে কনক

কমল দিনকরের প্রখর করে শুকাইয়া যাইতেছে—কোন্ প্রান্তরে পড়িয়া সে সোনার অঙ্গ ধূলি ধূসরিত হইতেছে—কোন্ আগুনে পড়িয়া সে ননীর পুতলী গলিয়া যাইতেছে—কোন্ অকূল সমুদ্রে সে হতভাগিনী ভাসিয়া যাইতেছে, বলাই মামা তাহার কিছুই জানেন না; তিনি বড় আশা করিয়াই খুকিদিদিকে দেখিতে যাইতেছেন। বুড়া বলাইয়ের অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমরা জ্ঞানদার দশা দেখিতে যাই। জ্ঞানদা যে সেই বিশাল পদ্মানদীর চড়ায় পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া আছে;—দেখি তাহার কি অবস্থা হইল?

সেই অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থা হইতে জ্ঞানদা চেতনা লাভ করিয়া দেখিল, সে একজন পরমাসুন্দরী রমণীর ক্রোড়ে শুইয়া আছে। মনে ভাবিল, এই বিস্তৃত নদীগর্ভস্থ চড়ায় এমন ভয়াবহ নির্জ্জন স্থানে এমন রূপসী রমণী কোথা হইতে আসিল? ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "কে মা তুমি? এখানে কেমন করিয়া আসিলে? তুমি কি মা ভগবতী? তুমি কি দুর্গতিহারিণী দুর্গা? নহিলে মা, আমার ন্যায় অভাগিনীকে তিনি ভিন্ন আর কে শুশ্রূষা দ্বারা এমন অসময়ে রক্ষা করিবেন?" সুন্দরী উত্তর করিলেন "আমি দুর্গা নহি দিদি! আমি সেই জগজ্জননী দুর্গার সৃষ্ট জীবের মধ্যে একটী কীটাণুকীট!"

জ্ঞানদা। তুমি আমায় 'দিদি' বলিয়া কথা কহিলে কেন?

রমণী। আমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলই দেখিয়াছি সকল সাধই মিটিয়াছে; কিন্তু কখন ভগিনী দেখি নাই। আমার ভগিনী দেখিবার বড় সাধ ছিল, দুই ভগ্নীতে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া সুখ দুঃখের কথা কহিবার বড় বাসনা ছিল; কিন্তু জন্মাবধি তাহা পাই নাই। আজ যেন বিধাতা সদয় হইয়া তোমাকে আমার ভগিনী করিয়া পাঠাইয়াছেন; তাই তোমায় 'দিদি' বলিয়া মনের সাধ মিটাইতেছি।

জ্ঞানদা। দিদি! তোমার নাম কি? তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে?

রমণী। সে সকল কথা এখন বলিবার নহে; পরে জানিতে পারিবে। আমার নাম যাহাই হউক, লোকে আমায় পাগ্লী বলিয়া ডাকে।

জ্ঞানদা। পাগ্লী বলিয়া ডাকে কেন? তুমি কি পাগল?

রমণী। কি জানি দিদি? নিজে পাগল হইলে কি নিজে বুঝা যায়? সংসারের লোকের সহিত না মিলিলেই লোকে পাগল বলে।

জ্ঞানদা। তোমার সহিত কি সংসারের লোকের মিল নাই?

রমণী। তাই বা আমি কেমন করিয়া জানিব? তুমিই বুঝিতে পারিবে; কারণ তুমিও ত একজন সংসারের লোক।

জ্ঞানদা। দিদি! তুমি কতক্ষণ ধরিয়া আমাকে কোলে লইয়া আমার সেবা করিতেছ?

রমণী। আমি বরাবরই তোমার সঙ্গে আছি।

জ্ঞানদা। বলিতে লজ্জা করে দিদি! কিন্তু তোমায় না বলিলেও আমি স্থির হইতে পারিতেছি না। আমার স্বামীকে দেখিয়াছ কি? তিনি যে কোথায় গেলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে। তাঁহার জন্য আমি এত অধীর হইয়াছি যে, আমার এ প্রাণ বাহির করিতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু আত্মহত্যা করিলে মহাপাপ হয় জানি বলিয়া আর তোমা হেন রমণীরত্নকে আমি ভগ্নীরূপে পাইয়াছি বলিয়া আমার দেহে এখনও প্রাণ আছে।

রমণী। ছি বোন্! তুমি আবার সেই স্বামীর জন্য ব্যাকুল হইতেছ? সে স্বামীর নামও মুখে আনিতে নাই। যে পুরুষ তোমা হেন সতী-দেহে বিনাপরাধে দারুণ আঘাত করে—যে পুরুষ তোমাহেন সতী লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর-পুরুষের হস্তে সমর্পণ করে, সে পুরুষ কি আবার স্বামী নামের যোগ্য? যে স্বামী পর-পুরুষের সহিত কথা কহাইয়া সতীর লজ্জার মাথায় পদাঘাত করিতে উদ্যত হয় এবং তাহারই জন্য দারুণ প্রহারে এই কোমল অঙ্গে ব্যথা দিয়া ছল করিয়া গৃহবহিষ্কৃতা করে, তাহার জন্য আবার অধীর হইতে আছে?

জ্ঞানদা। ও কথা বলিও না দিদি! স্বামীর আমার কোন দোষ নাই। স্বামী নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। স্বামী আমার কোন দোষই করেন নাই। আমার কপালের ফলাফলের জন্যই আমার দুঃখ পাইতে হইতেছে—তাঁহার নিন্দা কেন কর দিদি? তিনি আমার দেবতা! বল দিদি? তিনি কোথায় আছেন?

রমণী। তিনি আবার কোথায় থাকিবেন? তিনি তোমাকে পর-পুরুষের হাতে দিয়া বাটী চলিয়া গিয়াছেন। পর-পুরুষটী আবার তাঁহারই

সেই বন্ধু, যাঁহার সহিত তোমাকে কথা কহিতে অনুরোধ করিয়া তিনি তোমার এ দশা করিয়াছেন। তোমার স্বামী বাটী গিয়াছেন, কিন্তু তুমি জাহাজ হইতে জলে ঝাঁপ দিলে সেই পরপুরুষটী যে নৌকাযোগে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, সে কোথায় গেল, তাহা জান কি ?

জ্ঞানদা। তুমি কেমন করিয়া এ সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে দিদি ? তুমি কি এই নিকটস্থ বনের বনদেবী ?

রমণী। না দিদি ! আমি বনদেবী নহি—আমি পাগ্‌লী !

জ্ঞানদা সবিস্ময়ে কহিল "কি জানি দিদি ! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—তুমি দেবী কি পাগ্‌লী ? এখন বল, সেই পরপুরুষই বা কোথায় গেল ? আমার বড়ই ভয় হইতেছে।" রমণী উত্তর করিলেন "সে সকল কথা পরে হইবে ; এখন আমি তোমার হাত ধরিয়া লইয়া যাই—তুমি ধীরে ধীরে আমার সহিত চল।" জ্ঞানদা স্বীকৃতা হইলে রমণী তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া সেই চড়ার মধ্যস্থলে এক জঙ্গলময় স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় একখানি পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া রমণী জ্ঞানদাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল আহার করিতে দিলেন। জ্ঞানদা কিছুতেই আহার করে না দেখিয়া রমণী কহিলেন "খাইতে কোন দোষ নাই দিদি ! আমি নীচ জাতি নহি।" জ্ঞানদা কহিল "সে ভয় নাই দিদি ! আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত কিছু খাইয়াছেন কি না ? তিনি কোথায় গেলেন ? সেই জন্যই আমার আহারে অনিচ্ছা হইতেছে।" রমণী একটু হাসিয়া কহিলেন "আমার কথায় কি এতই অবিশ্বাস ? আমি বলিলাম তিনি বাড়ী গিয়াছেন, ইহাতে কি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না ?" জ্ঞানদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেগুলি আহার করিল।

জ্ঞানদা আহার করিলে রমণী একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—একবার একখণ্ড প্রস্তর লইয়া তাহাকে জীবিত মানবের ন্যায় আদর করিতে লাগিল—একবার ছুটাছুটী করিয়া গান গাহিতে লাগিল—আবার আসিয়া জ্ঞানদাকে কোলে তুলিয়া লইল। জ্ঞানদা এখনও বুঝিল না, রমণী—**দেবী কি পাগ্‌লী ?**

সপ্তম অধ্যায়।

বালক-বালিকা!

কলিকাতা কম্বুলেটোলায় কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃহৎ বাটী। কাশীবাবু কমিসেরিয়েটে কাজ করিয়া পূর্ব্বে এই মনোহর অট্টালীকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কমিসেরিয়েট-ডিপার্টমেণ্টের অর্থাৎ সমরক্ষেত্রে গমনোদ্যোগী সৈনিকবিভাগের কেরাণী বা গোমস্তা হইলে যে পূর্ব্বে কিরূপ অর্থোপার্জ্জন হইত, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ইনিও বহুদিন হইতে বরাবর বিপুল ধন সঞ্চয় করিতেছিলেন; পরে মণিপুর যুদ্ধের সময় হতভাগ্য টিকেন্দ্রজিতের পতনের সহিত ইঁহারও অধঃপতন হয়—এমন সুখের চাকুরীটী মণিপুর যুদ্ধে গিয়াই কোন দোষের জন্য ইনি হারাইয়াছিলেন। তবুও চাকুরীর শেষে 'যাবার সময় খাবার মাছ' স্বরূপ সাধ মিটাইয়া দুই হাতে অর্থ কুড়াইয়া আনিয়া বাটিতে বসিয়াছেন। এখন সেই সমস্ত সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া—কিয়দংশে বন্ধকী কর্জ্জ দিয়া সুদ খাটাইয়া—কিয়দংশ কোন কারবারে দিয়া এবং কিয়দংশ নিজ হস্তে নগদ রাখিয়া স্ত্রী পুত্র ও কন্যা লইয়া সুখসচ্ছন্দে সময়াতিবাহিত করিতেছেন। বহির্ব্বাটীস্থ বৈঠকখানায় লোক-সমাগম হইয়া চাকুরী থাকার সময় পূর্ব্বে যেরূপ জনতা হইত এবং মধ্যে মধ্যে নাচ গান ও ভোজ ইত্যাদি চলিত, এখন আর তাহার কিছুই নাই—কদাচিৎ কোন লোক সমাগম হয়; ভৃত্যের সংখ্যাও আর এখন বেশী নাই—কেবল দরজায় শিবশরণ সিং নামক একজন দ্বারবান্!

সেই বৈঠকখানার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান! ফুলবাগানে দেশী বিলাতী নানা রকমের ফুলগাছ! চারি ধারে টবে বসান বিবিধ সুদৃশ্য ক্রোটন! উদ্যানের মধ্যস্থলে মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত একটী উচ্চতর বেদী! আধ্ ফুটন্ত ফুলের ন্যায় একটি বালিকা বেদীর উপর বসিয়া মালা গাঁথিতেছে! ফুটন্ত আধ্ ফুটন্ত ফুলকুলের মাঝে ফোটো ফোটো ফুলটী হইয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে—একটী বালিকা!

বেলা প্রায় পাঁচটা বাজিয়াছে; বর্ষার বেলা বলিয়া বেলা এখনও বেশী আছে; তবে আকাশে মেঘের ঘটা বলিয়া যেন সন্ধ্যা হয় হয় দেখাইতেছে!

দ্বারবান্‌জি রাত্রে রুটী ও অরহর দাইলই ‘দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের’ ব্যবস্থা করিয়া একখানি থালে দাইল লইয়া তাহা হইতে কাঁকরাদি বাছিয়া ফেলিতেছে এবং নিজ ভাষায় অর্থাৎ হিন্দিতে ঘুন্ ঘুন্ করিয়া গান গাহিতেছে।

এমন সময়ে একটী হ্যাট্‌কোট পরা—সাহেবী সাজে সাজা বাঙ্গালীবাবু সাহেবী ঢংয়ে—সাহেবী চালে চলিতে চলিতে দরজা দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শিবশরণ তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াই কিছু না বলিয়া আবার স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটী বরাবর বেদীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন “আশালতা! আজ যে বেশ সুন্দর মালা গেঁথেছ দেখ্‌ছি! কা’র গলায় পরাইবে বল দেখি?” বালিকার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যের রেখা দেখা দিল এবং একবার বাবুটীর দিকে চাহিয়াই আবার মালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটী কহিলেন “কই আশা! উত্তর দিলে না যে? কা’র গলায় এমন মালা দিবে?” এবার বলিব বলিব করিয়া বলিতে গিয়া বালিকার মুখ ফুটিল না। কিন্তু মনে মনে ভাবিল, এবার জিজ্ঞাসা করিলে সাহসে ভর করিয়া নিশ্চয়ই সে বলিয়া ফেলিবে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিল না। বাবুটী জিজ্ঞাসা করিলে সে সাহসের সহিত মুখ ফুটিয়া যেমন বলিতে যাইবে, অমনি যেন পোড়া লজ্জা আসিয়া তাহাতে বাধা দিল। বাবুটী বিমর্ষ হইয়া কিছু ধীরে ধীরে আবার কহিলেন “আমায় কি আজ বোল্‌বে না আশা! এই মালা কা’র গলায় পরাইবে? বালিকা এবার অস্ফুটস্বরে উত্তর করিল—“তো—মা—র!”

বালিকার অস্ফুটভাবে উচ্চারিত এই ‘তোমার’ কথাটী বাবুটীর কর্ণে যেন বীণা-ঝঙ্কারবৎ বোধ হইল। সেই মুহূর্ত্তে বাবু স্থির করিতে পারিলেন না যে, তিনি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে? বাবুটীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর! আমাদের দেশের মতে তিনি যুবক; কিন্তু যে দেশের বেশ ভূষায় তিনি ভূষিত—যে দেশের চাল্‌চলনে তিনি চালিত, সে দেশের মতে এখনও বাবুটি বালক! বিশেষতঃ তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি দেখিলে এখনও তাঁহাকে বালক বলিয়াই বোধ হয়। গোঁপ-দাড়ীর রেখা মাত্রও দেখা যায় না; সখের অপেরা বা থিয়েটারে এখনও বাবুটীর নাকে নলক এবং মাথায় পরচুলা দিয়া মেয়েমানুষ সাজাইলে বেশ মানায় এবং ফিমেল পার্ট প্লে করিতে অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোকের কথা বলিতে দিলে দিব্য মেয়েলী কোমল কণ্ঠের কচি সুর শুনিতে পাওয়া যায়। বালকস্বভাবসুলভ চপলতাও এখন তাঁহার অনেক আছে—তাঁহার আকৃতি

বা প্রকৃতি হইতে এখনও বালকের ভাব দূর হয় নাই! তাই এই নবনটবর নবীন নধর ফুটফুটে বাবুটী যুবক হইয়াও বালক! তাই এই অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক এখন যেন অষ্টাদশ বিযুক্ত অষ্ট বৎসরের বালক! বালক বলিল "কি বল্লে আশা! তুমি কা'র গলায় মালা দিবে?—আমার? এত সৌভাগ্য আমার?"

বালক আবার কহিল "আশা! প্রাণের আশা কি সফল হইবে?"

বালিকা। কেন হইবে না?

বালক। তোমার পিতা কি পাড়াগাঁয় কন্যার বিবাহ দিবেন?

বালিকা। তুমি ত সহরে বাস কোর্‌বে বোলেছ?

বালক। তা ত বোলেছি; আশাকে পাইলে মনের কত আশা যে মিটাইব, তাহার কি ঠিক আছে? কিন্তু এখন ত পাড়াগাঁ দেখিয়াই দিতে হইবে।

বালিকা আর কোন উত্তর করিতে পারিল না; তাহার দুই চক্ষুর দুই প্রান্তে দুইটী মুক্তাফলের ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। এই দুই অশ্রুমুক্তা যে কত মূল্যবান্, তাহা প্রকৃত প্রেমিক পুরুষ ব্যতীত কে বুঝিতে পারে? বালক ইহার কিছু কিছু বুঝিয়া কহিল "আশা! তুমি কাঁদিলে? যদি সংসারের সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াও তোমাকে লাভ করিতে হয় তাহা করিব; যদি আশাকে জীবনের চিরসহচরী করিতে না পারি, তবে আর এ পৃথিবীতে আমার স্থান হইবে না।" বালিকার দুই চক্ষের জল এবার শতধারায় দুই গণ্ড বহিয়া পড়িল। ওদিকে আকাশের মেঘ সকলও আশার দেখা দেখি শতধারায় বর্ষণ আরম্ভ করিল। তখন বালিকার হাত ধরিয়া বালক বৈঠকখানায় লইয়া আসিল এবং কহিল "কই? তোমার ভাইটী আজ এখনও যে পোড়তে এল না?" বালিকা বলিল "তার আজ অসুখ কোরেছে—সে আজ পোড়তে আসবে না।" বালক কহিল "তাই বুঝি ফাঁকতালে আজ মালা গাঁথতে বোসে ছিলে?" এই কথায় বালিকা সেই অজস্র অশ্রুবর্ষণের মধ্যেও মৃদু হাসি হাসিল এবং মালা ছড়াটী বালকের গলায় দিল; নয়নে জলরাশী—অধরে মৃদু হাসি! এক সঙ্গেই রৌদ্রবৃষ্টি! প্রকৃতি দেবীরও এইরূপ দৃষ্টি! বৃষ্টিও পড়িতেছে, আবার রৌদ্রও দেখা দিতেছে! সূর্য্যদেব অস্ত যাইবার সময় এই বৃষ্টির মধ্যেও জগৎকে আজিকার মতন শেষ দেখা দিবার জন্য তরুশির, মন্দিরচূড়া, অট্টালিকার ছাদ প্রভৃতি স্থানে স্বীয় কিরণ বিকীরণ করিতেছেন।

বৃষ্টির সময় রৌদ্র হওয়ায় সূর্য্যের বিপরীত দিকে অর্থাৎ এখন পূর্ব্ব-গগনে রামধনুর অনুপম শোভা হইয়াছে; এদিকে বালিকার হাসি—কান্নারূপ রৌদ্র—বৃষ্টিতে বিপরীত দিকে বালকের মুখেও রামধনুরূপ অনিন্দ্য আনন্দ-জ্যোতি বিভাসিত হইয়াছে।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বালক বলিল "আশা! আজ তুমিও ত কোন বই পোড়লে না?" বালিকা অমনি সেই ঘরেই একটী টিনের বাক্স হইতে 'শকুন্তলা' পুস্তক বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রেমানুরাগে উভয়ের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, বালক আজ তাহাকে তাহাই কেবল বুঝাইতে লাগিল; বালিকা একদৃষ্টে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া স্থিরচিত্তে সে সকল কথা শুনিল!

ক্ষণকাল পরে বালক আবার কহিল "আমাকে কয়েক দিনের জন্য একবার দেশে যাইতে হইবে, সম্ভবতঃ কল্যই যাইব।" বালিকা যেন চকিতের ন্যায় বিশেষ ব্যগ্রভাবে কহিল "কেন?" বালক বলিল "আমাদের বাড়ীর ঝি আমাকে ল'য়ে যেতে এসেছে। ঝি আমাকে বাল্যাবধি কোলে পিঠে কোরে মানুষ কোরেছে বোলে, আমার উপর তার ভারি মায়া! তাই সে নিজেই এসেছে।"

এইবার বালিকার মুখ শুকাইল; কেমন করিয়া কয়েক দিন সে বালককে না দেখিয়া থাকিবে, এই ভাবনায় আকুল হইয়া পড়িল! বালিকা আবার কাঁদিয়া ফেলিল; বালক তাহার চিবুক ধরিয়া যেমন মুখখানি মুছাইতে যাইবেন, অমনি বালিকার মুখ বালকের বক্ষে ঢলিয়া পড়িল; আমরি! মরি! কেমন মনোহর দৃশ্য! এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে, ভিতরে গৃহের মধ্যে একখানি চৌকির উপর বসিয়া—এই বালক বালিকা! বালকের বক্ষে আবার বালিকার মুখ! বালক বালিকার এই প্রণয়-সুখ—কৌমার মিলনের এই অপূর্ব্বভাব দেখিলে বোধ হয় যে, ভালবাসায় যদি সুখ থাকে, তবে এই—ভালবাসায় যদি অমৃত থাকে, তবে এই—ভালবাসায় যদি সরলতা থাকে, তবে এই—ভালবাসায় যদি পবিত্রতা থাকে, তবে এই—ভালবাসায় যদি পারিজাত পরিমল থাকে, তবে এই—ভালবাসায় যদি রত্ন থাকে, তবে এই!

উপবন সংলগ্ন এই গৃহটীর ভিতর এই যে আধ কোমল আধ কঠোর, আধ লজ্জা, আধ মুক্তকণ্ঠতা; এই যে আধহাসি, আধকান্না, আধমেঘ, আধ-

বিদ্যুৎ; এই যে আধবসন্ত আধকোকিল, আধভয় আধসাহসময় ভাববিশিষ্ট পবিত্রতাময় সুখের কৌমারমিলন, ভালবাসা রত্নের অনন্ত জ্যোতি! এজগতে পবিত্রপ্রণয় প্রফুল্লতার রঙ্গভূমি—সরলতার আকর—পবিত্রতার জন্মভূমি—নির্ম্মলতার আধার—সৌন্দর্য্যের কল্পবৃক্ষ! এমন পবিত্র প্রণয়পূর্ণ কুমার কুমারীর অপূর্ব্ব মিলন কি মধুর!

কিছার সংসার! কিছার জীবন! কিছার ঐশ্বর্য্য! কিছার মান! কিছার প্রাণ! যদি আজিকার এই দুইটী হৃদয়ের মত জগৎ পৃথিবী, সংসার সমাজ, স্বর্গ মর্ত্ত্য, স্নেহ মমতা, আশা ভরসা সকল বিস্মৃত হইয়া একস্রোতে ভাসিতে পারি—এক জপে জপিতে পারি—একসুরে গাহিতে পারি—একপ্রাণে মিশিতে পারি—একে একে এক হইতে পারি, তবেই জীবন সার্থক। একে একে এক হওয়া কি চমৎকার! এক হৃদয়ের সহিত এক হৃদয়, এক অণুর সহিত এক অণু, এক শোণিত-বিন্দুর সহিত এক শোণিত-বিন্দু মিশিয়া যাওয়া কেমন সুখ! 'তুমি আমি', 'আমি তুমি' মিশিয়া গিয়া কেবল 'আমি' হওয়ার ন্যায় সুখ সংসারে আর নাই! এই ভালবাসাই স্বর্গ—এই কৌমার মিলনই স্বর্গ! স্বর্গ[illegible]কি—বালক বালিকার এই পবিত্রপ্রণয় স্বর্গসুখ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! তোমার আমাগত প্রাণ, আমার তোমাগত প্রাণ অথবা 'তুমিই আমি', 'আমিই তুমি' এই একত্ব-ভালবাসার জন্য পৃথিবীর সকল ছাড়িয়া কাননে কাননে, পুলিনে পুলিনে, শিখরে শিখরে ভ্রমণ করা যায়। পাঠক! ভালবাসায় এই 'আমি' হওয়াই সংসারে সাক্ষাৎ স্বর্গ!

অনেকে বলিতে পারেন, বালক বালিকার এইরূপ প্রণয় অস্বাভাবিক! জড়জগতে এইরূপ প্রণয় দেখা যায় না; নাটক উপন্যাস লিখিবার সময় লেখক মাত্রই এইরূপ প্রণয়ীযুগলের অবতারণা করেন। ইহা কবিকল্পনা ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, ইহা পরিদৃশ্যমান ঘটনা! সংসারে অনেক স্থলেই এরূপ প্রেমালাপ ঘটিয়া থাকে, তবে কেহ জানিতে পারে না বলিয়াই ইহা অলীক বোধ হয়। আবার কলিকালে ইহা আরও সম্ভবপর! বালিকার বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র! দ্বাদশে এখন সন্তানের জননী হইতেও দেখা যায়, আবার দ্বাদশে কুমারী থাকিতেও দেখা যায়! যাহারা দ্বাদশে জননী হইতে পারে, তাহারা যে দ্বাদশে প্রণয়িণী হইবে না, ইহা কি সম্ভব? তাই বলি, দ্বাদশবর্ষীয়া কু[illegible]লতা বালিকা বলিয়া কি ইহার হৃদয়ে গভীর প্রেম নাই? অবশ্যই আছে! পাঠিকাগণ! আপনারা এই বালক বালিকার

প্রেমের মর্ম্ম কিছু বুঝিলেন কি? কিম্বা কখনও এমন দৃশ্য দেখাইয়াছেন কি? যদি দেখাইয়া থাকেন, তবে এই ঘটনা দেখিয়া আপনার পূর্ব্বকথা অনেক মনে পড়িবে এবং এই প্রেমলীলাও ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন।

অনেকক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে বালক বলিল "আর কাঁদিও না আশা! আমি শীঘ্রই আসিব; সন্ধ্যা হইয়া আসিল—তুমি বাটীর ভিতর যাও।" বালিকা কহিল "কবে আসিবে?" বালক বলিল "সপ্তাহ পরে।" বালিকা দিন গণিয়া এই কয়দিন কাটাইব ভাবিয়া আর কিছু না বলিয়া ছল ছল নয়নে বালকের দিকে চাহিতে চাহিতে অন্দরমহলে চলিয়া গেল; বালকও বালিকার সরলতামাখা মুখশশী এবং পবিত্রতাপূর্ণ প্রেমরাশী ভাবিতে ভাবিতে সেই দ্বারবানজির সম্মুখ দিয়া দরজার বাহির হইয়া গেল।

বালক ও বালিকা উভয়েরই বর্ণ গৌর! উভয়েরই স্ত্রীপুরুষভেদে আকৃতি-গত গঠন প্রণালী ও অঙ্গসৌষ্ঠব নিতান্ত মন্দ নহে—উভয়েই সুশ্রী! উভয়েই পরস্পর এমন প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে যে, দেখিলে বোধ যেন একটী বৃন্তের দুটী ফুল এই—**বালক বালিকা**!

অষ্টম অধ্যায়।

যুবক যুবতী!

পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, এই বালকই সেই গণেশপুরের হরপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর পুত্র প্রভাসচন্দ্র! প্রভাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চদশ মুদ্রা বৃত্তি পাইয়াছে। সপ্তদশ বৎসরে এণ্ট্রান্স দিয়া অষ্টাদশে ফার্ষ্ট আর্ট বা এলে পড়িতেছে। কাশীবাবুর বাটীর অনতি দূরবর্ত্তী একটী 'মেশে' অর্থাৎ ছাত্র-নিবাসে প্রভাসের বাসা! ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কতি-পয় ছাত্র একত্রে একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে একজন পাচক-ব্রাহ্মণ ও একজন ঝি রাখিয়া এই 'মেশ' বা ছাত্র-নিবাস স্থাপন করিয়াছে। প্রভাস এবং অন্যান্য অনেক ছাত্রই এখানে থাকিয়া কলেজে পাঠ শিক্ষা করে।

কাশীবাবুর দুই কন্যা এবং এক পুত্র! জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম দয়াময়ী—বয়স ষোড়শ বৎসর! কনিষ্ঠা কন্যার নাম আশালতা—বয়স দ্বাদশ বৎসর!

পুত্রটীর নাম চারুচন্দ্র—বয়স দশ বৎসর মাত্র! চারুকে বাড়ীতে পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক হওয়ায় কাশীবাবু এই ছাত্র-নিবাসে স্বয়ং গিয়া বাছিয়া বাছিয়া প্রভাসকেই প্রাইভেট্ (টিউটার) শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে প্রভাসের বিদ্যানুরাগ দেখিয়া কাশীবাবু তাহাকে বড়ই ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভাস প্রত্যহ বিকালে চারুকে দুই এক ঘণ্টার জন্য সামান্য বাঙ্গালা পুস্তক ও ফার্ষ্ট বুক আদি পড়াইতে যায়; কিন্তু কাশীবাবু তাহার জন্য তাহাকে মাসিক পঞ্চ মুদ্রা প্রদান করেন। আরও তাঁহার ইচ্ছা যে, প্রভাস দুই বেলা তাঁহাদের বাড়ীতে আহার করে; কিন্তু প্রভাসের তাহাতে তত মত না থাকায় সে "আপাততঃ যাক্—পরে হইবে" এইরূপ বলিয়া সর্ব্বদা ওজর করিয়া কাটাইয়া দেয়। প্রভাসের মনে হইত যে, পরাধীনতায় রাজভোগ অপেক্ষা স্বাধীনতায় শাকান্নও সুখভোগ! কিন্তু সে বিবেচনা এখন ক্রমশঃই তাহার তিরোহিত হইতেছে। যে কোন সুযোগে এখন অধিকক্ষণ কাশীবাবুর বাটীতে কাটাইতে পারিলেই যেন তাহার সময় সুখে চলিয়া যায়! কাশীবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা আশালতাই যে এখন প্রভাসের প্রাণের উপাস্য দেবী!

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইতেই আজ প্রায় এক বৎসর প্রভাস এই বাড়ী যাতায়াত করিতেছে; তাহাতে আশার ভালবাসা, আশার আকর্ষণ অনুক্ষণ তাহার হৃদয়মধ্যে যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যখন প্রথমে প্রভাস পড়াইতে যাইত, তখন আশা তাহার ভাইটীকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিত এবং যতক্ষণ চারুর শিক্ষা শেষ না হইত, ততক্ষণ স্থিরভাবে প্রভাসের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার শিক্ষাদানের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা শুনিত। পরে নিজেও তাহার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিল; পূর্ব্বে 'বোধোদয়' পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, এক্ষণে প্রভাসের নিকট "সীতার বনবাস" "শকুন্তলা" "কাদম্বরী" প্রভৃতি বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে এবং কিছু কিছু ইংরাজী লেখা পড়াও শিখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রতি মা সরস্বতীর অনুগ্রহ বেশী! চারু অপেক্ষাও আশা শীঘ্র শীঘ্র বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিখিয়া ফেলিল এবং ক্রমশঃই বেশী শিখিতে লাগিল। শিক্ষার সঙ্গে আশা প্রত্যহই প্রায় প্রভাসের জন্য জলখাবার, জল ও পান আনিয়া দিত এবং যে কয় দণ্ড প্রভাস তাহাদের বাটীতে থাকিত, ততক্ষণ নানারূপে তাহাকে যত্ন করিত। এইরূপে উভয়ের মধ্যে কোন্ দিন যে কাহার প্রাণে প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইল তাহা

ঠিক্ বুঝা যায় না। তবে উভয়ের বয়স, মন ও রুচির সামঞ্জস্যে কোন দিনের কোন বিশেষ ঘটনাতেই যে বালক বালিকার এই প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরে ক্রমশঃই যত ঘনিষ্ঠতা জন্মাইতে লাগিল—যতই নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া বিবিধ বিষয় বুঝিতে লাগিল, ততই বালিকা-হৃদয়ের প্রেমানুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাই আশা সংসার-বোধ-বিহীনা সরলা বালিকা হইয়াও আজ প্রেম-পাগলিনী!

মোহময় প্রণয়-সুখে আত্মহারা হইয়া বালক বালিকা বেলা বুঝিতে পারে নাই। গোধূলি গত হইয়াছে—সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইয়া যায়! কিন্তু বালকবালিকা সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে ভাবিয়াই ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। বালিকা বাটীর মধ্যে গিয়া দেখিল, দীপ সকল অনেকক্ষণ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে; সে পিতা মাতার নিকট তিরস্কৃতা হইবে ভাবিয়া ভয় পাইল। নীচের ঘরে দাসী পাচিকাদি ভিন্ন অন্য কাহাকেও না দেখিয়া বরাবর উপরে উঠিল, এবং পিতার শয়ন-ঘরের একটী ক্ষুদ্র জানালা দিয়া উকি মারিয়া দেখিল, চারু অসুস্থ হইয়া শুইয়া আছে, মাতা তাহার মাথা টিপিয়া দিতেছেন এবং পিতা সন্ধ্যাহ্নিক কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আশা আর ঘরে প্রবেশ না করিয়া ভয়ে ভয়ে সেই জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ধ্যাহ্নিক সারা হইলে কাশীবাবু গৃহিণীকে কহিলেন, "আশাকে আজ এখনও দেখ্‌ছি না কেন?"

গৃহিণী। সে সেই বিকালে পোড়তে গিয়াছে—আজ এখনও আসে নাই।

কর্ত্তা। আজ ত চারু যায় নাই; তবে সে একা গেল কেন? এখন কি আর একা কোন পুরুষের নিকট যাওয়া ভাল দেখায়? তুমি কি বারণ কর নাই?

গৃহিণী। প্রভাস ওকে বেশ ভালবাসে বোলেই বারণ করি নাই।

কর্ত্তা। প্রভাস খুব ভাল ছোক্‌রা, তা আমিও জানি! তা হ'লে কি হয়, ওটা একটা বদ্ অভ্যাস হ'য়ে যায়; পরে অন্যের কাছেও একা যেতে পারে।

গৃহিণী। প্রভাসের সঙ্গে আশার বিয়ে দেওয়া কি স্থির কোল্লে?

কর্ত্তা। বিয়ে দিতে অমত কিছু নাই—দেখ, সেই জন্যই আমি আজও পর্য্যন্ত অন্য সম্বন্ধে ভরাভব দিই নাই। তবে কি জান, পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দিতে যেন ইচ্ছা করে না; দয়া যদিও তেমন বড় মানুষের ঘরে পড়ে নাই, তবুও নিকটেই চখের উপর আছে।

গৃহিণী। জামাই বাবাজি যে দয়াকে এবার সঙ্গে করে আসামে নিয়ে যাবেন।

কর্ত্তা। তা যাক্, সেত আর চিরস্থায়ী বাড়ী-ঘর নয়, চাকুরীর স্থান মাত্র। আশাকে যে তা হ'লে একেবারে পাড়াগাঁয়ে চিরদিনের জন্য ভাসিয়ে দিতে হবে।

গৃহিণী। আমি তা বলি না, এখন রেল-পথ হ'য়ে দূরও নিকট হ'য়েছে। প্রভাসের অবস্থা যদিও এখন ভাল নয়, তবু যেরূপ বিদ্যা শিখ্‌ছে, তাহাতে বোধ হয় পরে খুব ভালই হবে; আরও বনিয়াদী ঘরের ছেলে—জমিদার-পুত্র! সর্ব্বাংশেই ভাল; কেবল এক দোষ—ছেলেটী যেন কেমন খিরিষ্টানী মতে চলে, সাহেবের মত পোষাক পরে! তাই যে ভয় হয়! আবার এমন ধারা ছেলেও আর পাওয়া যায় না—মেয়েও আর রাখা যায় না।

কর্ত্তা। দেখা যাক্, শিগ্‌গির একটা উপায় কোর্ত্তেই হবে।

এই বলিয়া কাশীবাবু নিকটস্থ আসনে বসিয়া জলখাবার খাইতে বসিলেন।

বালিকা দাঁড়াইয়া সকলই শুনিল; ভাবিল পিতার আপত্তি—পাড়াগাঁ, মাতার আপত্তি—সাহেবী ধরণ! এই দুই আপত্তি কি থাকিবে? তিনি কি পাড়াগাঁ পরিত্যাগ করিতে বা সাহেবী চাল্ ছাড়িতে পারিবেন না? আশার মনে আজ কত আশা হইতে লাগিল, এমন সময়ে কাশীবাবু উচ্চরবে ডাকিলেন, "আশালতা!—আশা!"

আশা অমনি ঘরের ভিতর আসিল; পিতা কহিলেন, "এতক্ষণ কোথা ছিলে মা?" আশা কহিল, "আমি অনেকক্ষণ প'ড়ে এসেছি—এতক্ষণ বারাণ্ডায় ছিলাম।" কর্ত্তা জলখাবার খাইতে খাইতে কিছু খাদ্য কন্যার হস্তে দিলেন। বালিকা ভয়-ভাবনা ভুলিয়া—মনে মনে কত বালির বাঁধ বাঁধিয়া পিতার নিকট খাবার খাইতে বসিল।

এদিকে প্রভাস সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকারময় একটী গলি দিয়া যাইতেছেন। এই ক্ষুদ্র গলি দিয়া অনেকটা দূর যাইতে হয়, পরে সদর রাস্তা পাওয়া যায়। গলি দিয়া যাইতে যাইতে প্রভাসের প্রাণে আজ যেন কেমন ভয়ের সঞ্চার হইল; বাড়ীর ঝি শ্যামা আসিয়া বলিয়াছে যে, তাঁহাকে মারিবার জন্য তাঁহার রমেশ দাদা প্রসিদ্ধ বদ্‌মায়েস্ গোলাম সর্দ্দারকে পাঠাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার ভয়ের কারণ!

ভয়ে ভয়ে কিয়দ্দূর গমন করিলে গলির পূর্ব্বপার্শ্বস্থ একটী একতল বাটীর

দরজা হইতে কে যেন প্রভাসকে ডাকিল! প্রভাস নিকটে গিয়া দেখিল—শ্যামা! সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন?" শ্যামা কহিল, "এই বাড়ীর ঝি আমাদের দেশের লোক, তার সঙ্গে আগে হ'তে আমার খুব আলাপ ছিল; দরজার পাশে এই ঘরে সে থাকে, তাকে সকল কথা ব'লে তোমার জন্য আজ আমি এই ঘর ঠিক ক'রে রেখেছি; তোমার খাবার জিনিস, শোবার বিছানা সব আমি এখানে যোগাড় ক'রে রেখেছি। আজ রাত্রে আর তোমার বাসায় যাওয়া হবে না; গোঁয়ার গোলাম সদ্দার দশ বার জন গুণ্ডা সঙ্গে নিয়ে এই গলির মোড়ের মাথায় পাকে পাকে বেড়াচ্চে; তোমাকে দেখ্‌লেই তারা মেরে ফেলে পলাবে। কিছুতেই আমি আজ তোমায় বাসায় যেতে দেব না, এ এখন আমারই ঘর—কেউ তোমায় কিছু বোল্‌বে না।" প্রভাসের অনিচ্ছা হইলেও শ্যামা বারম্বার বারণ করায় তাহাকে তথায় থাকিতেই হইল। মনে মনে ভাবিল—কল্য প্রাতেই দেশে গিয়া ইহার একটী উপায় করিতে হইবে। নিতান্ত সঙ্কুচিত চিত্তে এক রাত্রের জন্য প্রভাসকে বিষম বিড়ম্বনা ভোগ করিতেই হইল; অপরিচিত স্থানে এরূপ উদ্বিগ্ন চিত্তে থাকিলে কি আর নিদ্রা হয়? সারা রাত্রি প্রায় তাহাকে জাগিয়া থাকিতেই হইল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় প্রভাস শুনিতে পাইল পার্শ্বস্থ ঘরে কাহারা কথা কহিতেছে; ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বারের একটী ছিদ্র দিয়া দেখিল গৃহমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে! তখন আর একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিদ্র সহায়ে প্রভাস দেখিল সুসজ্জিত গৃহটীর উত্তর দিকে একখানি খাটের উপর বসিয়া একজন যুবক ও একজন যুবতী! ষোড়শী যুবতীর রূপলাবণ্যে গৃহটী যেন আরও উজ্জ্বলতর দেখাইতেছে। যুবক কহিলেন "আজ আফিসে গিয়ে সাহেবের কাছে আরও এক মাসের ছুটী চাইলাম, কিন্তু সাহেব কিছুতেই স্বীকার কোল্লে না; আজ আবার চার শ ৪০০ কুলি চালান হ'য়েছে—কাজের খুব ভিড়, কালই যেতে হবে। এবার যখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি, তখন আর ছুটী না পাওয়ায় তত চিন্তার কারণ নাই!"

যুবতী। আমাকে নিয়ে গেলে মার খুব কষ্ট হবে।

যুবক। যে মা তোমাকে রাত দিন গালি মন্দ দেন—কথায় কথায় কত পীড়ন করেন, তাঁর জন্য তোমার এত চিন্তা কেন?

যুবতী। সে কি কথা? মা আমায় কবে পীড়ন ক'রেছেন? যিনি আমার একমাত্র আরাধ্য দেবতার জননী, তিনি যে আমার কেমন গুরু-

জন, তা কি ভেবে ঠিক করা যায়? তিনি যদি কখন আমার দোষ দেখে কোন তিরস্কার কোরেই থাকেন, তা কি আর আন্তরিক? মা যেমন মেয়েকে মৌখিক মন্দ কথা বলেন, তিনিও হয় ত দোষ দেখলে সেরূপ বোল্‌তে পারেন।

যুবক। তুমি রমণীরত্ন! আমি স্বচক্ষে মাকে তোমায় পীড়ন কোর্ত্তে কতবার দেখেছি, কিন্তু তুমি আমার নিকট ত কখনই কোন কথা বল নাই; আরও এই নিকটে, তোমার পিত্রালয়; সেখানেও কেউ ঘুণাক্ষরে এ সকল কথা জান্‌তে পারে না। দয়াময়ি! তুমি যথার্থই দয়াময়ী। আমি এমন হতভাগ্য যে, তোমার মত অমূল্য রত্নকে যত্ন কোর্ত্তে পারি না। এই ষোলো বছর বয়সে সংসারে কা'র এমন স্বামীভক্তি বল দেখি? এক দিকে আমার সৌভাগ্য এই যে, তোমার ন্যায় রমণীমণি চিরসঙ্গিনীরূপে পেয়েছি—অন্য দিকে আমার দুর্ভাগ্য যে তোমায় সুখী কোর্ত্তে পারি না।

যুবতী। তুমি কি বোল্‌চো? তোমার সঙ্গে বনবাসে উপবাসেও যে কত সুখ! একথা ত নূতন নয়—পতিপ্রেমই স্ত্রীজাতির সার সম্পদ! ভর্ত্তার ভালবাসাই নারীর ঐশ্বর্য্য! স্বামীর সোহাগই অবলার বল!

যুবক। তাই বা তোমায় তেমন দিতে বা দেখাতে পারি কই? পরের চাকর, তোমায় ফেলে বিদেশে থাক্‌তে হয়; হয় ত কতই কষ্ট পাও। যাহোক্ আর তোমায় রেখে যেতে পারবো না। মার কোন কষ্ট হবে না; আমাদের একজন ঝি আছে, আর একজন ঝির ঠিক কোরেছি। দুজন চাক্‌রাণী থাক্‌লে মার আর কষ্ট হবে না।

যুবতী। আমার মা আজ লোক পাঠিয়ে বোলে দিয়েছেন যে, এই শ্রাবণ মাসে যদি আশার বিয়ে হয়, তবে কেমন কোরে এখন আসাম যাওয়া হবে?

যুবক। বিয়ের কিছু ঠিক হয়েছে নাকি?

যুবতী। তা ত কিছুই দেখি না। কখন শুনি, চারুকে যে মাষ্টার পড়ায়, তারই সঙ্গে বিয়ে হবে; আবার কখন কখন এতে অমতও শুনি। অন্য সম্বন্ধও ত আর দেখি না।

যুবক। তবে, তার এখন কিছুই ঠিক নাই। কাল যাওয়াই স্থির!

এইরূপ কথোপকথনের পর যুবক যুবতী দুইজনেই আর না ঘুমাইয়া যাইবার উদ্যোগে দ্রব্য সামগ্রী সমূহ গুছাইতে লাগিলেন।

যুবক যুবতীর শেষ কথাগুলি শুনিয়া প্রভাসের হৃৎপিণ্ড যেন সজোরে আঘাত করিতে লাগিল—শিরায় শিরায় শোণিতরাশী যেন সবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল; ভাবিল—ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে; আশার আশা, তাহার আশা কি সফল হইবে না? প্রাণের আশাকে পাইয়া কি প্রাণের আশা মিটিবে না? যদি আশার আশা না মিটে, তবে আর পৃথিবীতে প্রভাসের স্থান হইবে না।

আরও ভাবিল যে—আশাকে পাইলে পরম আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হইবেন এই—যুবক যুবতী!

চিনিল যে—কাশীবাবুর বড় জামাতা ও বড় মেয়ে এই যুবক যুবতী! বুঝিল যে—প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ দেবদেবী এই—যুবক যুবতী! সুমধুর ও সুপবিত্র প্রেমামৃতের একমাত্র আকর স্থান এই—**যুবক যুবতী!**

নবম অধ্যায়।

প্রাচীন প্রাচীনা!

সুখের দিন চিরকাল থাকে না; সৈকত ভূমির জলরাশী যেমন দেখিতে দেখিতে যায়—কৃষ্ণ মেঘের মধ্যে সোণার বিদ্যুৎ যেমন দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হয়—নানা বর্ণে রঞ্জিত রামধনু যেমন দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়—সন্ধ্যার প্রাক্কালে পশ্চিমাকাশের রক্তিমরাগ যেমন দেখিতে দেখিতে লুক্কায়িত হয়—শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদ যেমন দেখিতে দেখিতে অস্ত যায়—পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দু যেমন দেখিতে দেখিতে পড়িয়া যায়—অচল আকাশে সচল মেঘ-মণ্ডল বহুমূর্ত্তিমান হইয়া যেমন দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়—জলবিম্ব জলে উঠিয়া যেমন দেখিতে দেখিতে জলে মিশিয়া যায়, সুখের দিনও সেইরূপ দেখিতে দেখিতে যায়।

গণেশপুরের জমিদার হরপ্রসন্ন রায় চৌধুরী অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনে এখন নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা এখন জনশূন্য!

যে প্রশস্ত পূজার দালানে একদিন দোলদুর্গোৎসবাদি কত ক্রিয়াকলাপ হইত, সেখানে এখন কেবল বাদুড় চাম্‌চিকা সুখে নিদ্রা যায় আর কপোত কপোতী নির্ব্বিঘ্নে প্রেমালাপ করে। যে সকল উচ্চ স্তম্ভ ও প্রাচীর কত কারুকার্য্য খচিত ছিল, সে সকল এখন কেবল বন্য-বৃক্ষ লতাদিতে পরিপূর্ণ। যে সকল বৃহৎ বৃহৎ বহির্দ্বার দ্বারবানেরা রক্ষা করিত, সে সকল এখন কেবল অর্গল নিবদ্ধই আছে। যে নাটমন্দির একদিন নৃত্যগীতাদিতে কত আমোদিত হইত, সেখানে এখন কেবল শৃগাল কুক্কুরাদি পশুগণ আমোদ করে। যে বহির্ব্বাটীতে একদিন নায়েব, গোমস্তা, সরকার, প্রতিবেশী, প্রজা ও ভৃত্যাদি নিয়তই কোলাহল করিত, নির্জ্জনতা আসিয়া এখন সে স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই বিজন অট্টালিকার একটী নিভৃতকক্ষে প্রাচীন প্রাচীনা স্ত্রীপুরুষদ্বয় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, এক পার্শ্বে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে! সেই প্রদীপের মৃদু আলোকে প্রাচীন প্রাচীনার মুখমণ্ডল ঘোর বিষাদাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছে—যেন দারুণ চিন্তায় দম্পতীর অন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। মিথ্যা মোকদ্দমায় তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন; পরে যাহা কিছু ছিল, তাহাও বুঝি জ্ঞাতিশত্রু কর্ত্তৃক এইবার যায়, জনশূন্য অট্টালিকাও ত্যাগ করিয়া শেষে বুঝি কুটীর আশ্রয় করিতে হয়; এই চিন্তায় উভয়েই চিন্তিত!

গৃহিণী কহিলেন "রমেশ আমাদের এত শত্রু হ'ল কেন?

হর। কেমন ক'রে জান্‌বো? বোধ হয় তার মনে ধারণা হ'য়েছে যে, মথুর চাটুর্য্যের মেয়ের বিয়ে অন্যত্র আমার দ্বারাই হ'য়েছিল।

গৃহিণী। যাই হোক্, রমেশ হ'তেই আমাদের কুটীরবাসী হ'তে হ'ল। তাতেও দুঃখ নাই—এখন সব প্রাণে প্রাণে বজায় থাক্‌লেই হয়।

হর। সে আশাও আর কই? যখন পাষণ্ড রমেশ প্রভাসকে মেরে ফেল্‌তে উদ্যোগী হ'য়েছে, তখন আর কিছুতেই বিশ্বাস নাই।

গৃহিণী। এখন কোল্‌কাতা থেকে শ্যামা আর নারায়ণপুর থেকে মামাশ্বশুর ফিরে এলে যে বুঝ্‌তে পারি। প্রভাসের চেয়ে জ্ঞানদার জন্যই যেন প্রাণ বড় অস্থির হ'য়েছে। আহা! মা'র আমার মুখখানি কত দিন দেখি নাই।

হর। ঠিক্ কথাই ব'লেছ, জ্ঞানদার কথাটা মনে হ'লে আমারও প্রাণ যেন অস্থির হ'য়ে উঠে। মা যেন আমার লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ।

গৃহিণী। আচ্ছা, রমেশ যে এত দুষ্কার্য্য ক'চ্ছে, তার প্রতিফল কি পাবে না?

হর। এই কলিকালে, তা আর পায় কই ? কলিতে পাপীরই 'পোয়া বারো', ধর্ম্ম-ভীরুর পদে পদে গেরো (গ্রহ)! তুলসীদাস ব'লেছেন—"কলি-কালে সাধুর গলায় ফাঁস আর মোহনমালা পরে চোর।" ভগবানের এতে যে কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গৃহিণী। যাই হোক্, রমেশ-পশুর অত্যাচার আরও যে কতদূর গড়ায়, তা বলা যায় না।

হর। সে ত যা হ'বার তাই হবে; এখন সংসার চালান যে ভার হ'য়ে উঠ্‌লো; শেষে কি অন্নাভাবে মারা যেতে হ'বে ? প্রভাস যে টাকা বৃত্তি পায়, তাতেও তার পড়ার খরচ কুলায় না—আরও না কি কোথায় ছেলে পড়িয়ে পাঁচ টাকা পায়। তার দ্বারা কোন সাহায্যই এখন পাওয়া যাবে না; পরেও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ; কারণ তার আর এ পাড়াগাঁয়ে হিন্দু-সমাজে বাস করবার মত নাই। এই সবে মাত্র আঠার বৎসর বয়স—একটা পাস দিয়েছে মাত্র; এখনই ছেলে আমার সাহেব! তার সঙ্গে যদি যেতে পারি, তা হ'লেও বা হয়; তা কি পার্‌রে ?

গৃহিণী। সে কি হয় ? বাস্তু ভিটে ছেড়ে কোথাও কি যেতে আছে ? যা করেন ভগবান্—একটা উপায় হবেই হবে; কৃষ্ণের জীব অনাহারে মরে না। মা অন্নপূর্ণাই আমাদের খেতে দেবেন—তার জন্য তুমি শেষকালে এত চিন্তা ক'রে শরীর নষ্ট কর কেন ?

হর। চিন্তা কি সাধে করি—চিন্তা যে আপনি আসে !

এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ হরপ্রসন্ন কাঁদিয়া ফেলিলেন। গৃহিণীও কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

বৃদ্ধ একাকী সেই গৃহ মধ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি ছিলাম আর কি হইলাম! দরিদ্রতা যে দারুণ দুঃখের মূল, তাহা ত স্বপ্নেও জানিতাম না। যে দরিদ্র, তাহার এ সংসারে মরণই মঙ্গল! উঃ, কি কষ্টেই দরিদ্রের দিন যায় ? যার বিভব নাই, সম্পদ নাই, অর্থ নাই—যে পথের কাঙ্গাল—যে এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়ায়—যে মলিন বেশে বিষণ্ণ বদনে ক্ষুব্ধ চিত্তে অন্ন বিনা অনাহারে হাহাকার করে—যে ক্ষুধার জ্বালায় শূন্য উদরে দিবানিশি পরের মুখ পানে চাহিয়া থাকে, তাহার জীবিতাবস্থাই মৃত্যু আর মৃতাবস্থাই জীবন! যে দরিদ্র, তাহার এ সংসারে সহায় নাই, অবলম্বন নাই, উপায় নাই,

আশ্রয় নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, কিছুই নাই! দরিদ্র হইলে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু সকলই পর হইয়া যায়। যে দরিদ্র, সে গুণ থাকিলেও বিকাশ করিতে পারে না—আশা থাকিলেও সম্পন্ন করিতে পারে না—সাধ থাকিলেও মিটাইতে পারে না—সাহস থাকিলেও নির্ভীক হইতে পারে না। যে দরিদ্র, বিশ্ব তাহার বোধাতীত বস্তু—জগৎ তাহার অনাবিষ্কৃত দেশ—পৃথিবী তাহার অরণ্য—সংসার তাহার মরুভূমি—সমাজ তাহার শ্মশান—স্বদেশ তাহার কণ্টক-কানন—গৃহ তাহার অগ্নিকুণ্ড! যে দরিদ্র, তাহার দৃষ্টি-প্রখরতা ও দৃষ্টিহীনতা দুই এক; তাহার বসন্ত বর্ষা, পূর্ণিমা অমাবস্যা, সুখ দুঃখ সবই সমান! তবে আর কেন? যে পথে ঐশ্বর্য্য গিয়াছে, সম্পদ গিয়াছে, সেই পথে সকলই যাক্; মামা আসিলে আমি কাশী যাওয়াই স্থির করিব।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা দুই গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। গৃহিণী পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃদ্ধকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৃদ্ধের অনেক যাতনার উপশম হইল। গৃহলক্ষ্মীরূপিণী গৃহিণীর জন্যই বৃদ্ধ, বৃদ্ধ বয়সে দরিদ্র-দশায় পড়িয়াও অনেক কষ্টের লাঘব করিতেন। আহা! সতী-স্ত্রী সংসারের ভূষণস্বরূপা! গৃহে বাস সুখের জন্য; সে সুখের মূলাধারই সতী-সাধ্বী-স্ত্রী—সে সুখের আদি কারণই পতিপরায়ণা পত্নী—সে সুখের নিদানই অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী সহধর্ম্মিণী। যদিও হরপ্রসন্নের এখন দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই—যদিও তিনি চরমে দরিদ্রতার চরমসীমায় পড়িয়াছেন—যদিও তাঁহার হৃদয়ে প্রফুল্লতা নাই, প্রাণে সুখ নাই, চক্ষে জ্যোতিঃ নাই, মুখে হাসি নাই—যদিও সুখের দিন দুঃখের দিন, উৎস-বের দিন নিরুৎসবের দিন, হর্ষের দিন বিষাদের দিন, সকল দিনই তাঁহার এখন সমান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রাণাধিকা পত্নীর প্রবোধ বচনে তাঁহার প্রতপ্ত প্রাণ প্রচুর পরিমাণে পরিতৃপ্ত হয়। সতী সাধ্বী গৃহিণী বৃদ্ধের সুখের আলয়—শান্তির নিকেতন—প্রেমের প্রস্রবণ—স্নেহের প্রতিমা—সম্পদ-বিপ-দের সঙ্গিনী—পাপ-পুণ্যের ভাগিনী—চিরজীবনের সহচরী। প্রাচীনা গৃহিণী যেন প্রাচীন হরপ্রসন্নের হৃদয়মন্দিরের চিরাধিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি!

গৃহিণী হতভাগ্য হরপ্রসন্নকে নানাপ্রকার প্রবোধ বচনে পরিতৃপ্ত করিতে-ছেন—নানাপ্রকার আশ্বাস-বাক্যে আশ্বাসিত করিতেছেন—নানাপ্রকার সান্ত্বনা-বাক্যে সন্তুষ্ট করিতেছেন—নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝাইতেছেন, এমন সময়ে বাহিরে স্ত্রী-কণ্ঠে কে গাহিল——

দুঃখেতে গড়িল বিধি দুঃখিনী রমণী,
সংসার-সাগরে সেই সোণার তরণী।
ধীরে ধীরে আনি তীরে ভাসাইল সিন্ধুনীরে
কূলপানে ফিরে ফিরে চাহিল তখনি।
তরল তরঙ্গ অঙ্গে তরণী নাচিল রঙ্গে
কঠিন কাণ্ডারী সঙ্গে দিবস রজনী।
আচম্বিতে ঘন ঘন গগনে গরজে ঘন
বেগে বহে সমীরণ আঁধার ধরণী।
তরি তাহে পড়ে হেলে মাজি পলাইল ফেলে
ডুবিল রে অবহেলে সাধের তরণী।
বিধির কি সাধা বাদ ঘটাইল পরমাদ
ফুরাইল সুখ-সাধ পলকে অমনি।

গান শুনিয়া গৃহিণী কহিলেন, "এই সুর নিশ্চয়ই আমাদের শ্যামার বোন্ বামার।" বৃদ্ধ কহিলেন, বামা এখন জ্ঞানদার শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকে ত?

গৃহিণী। হাঁ, বামার আমার জ্ঞানদার সঙ্গে বড় ভাব; জ্ঞানদা যখন কচি খুকি, তখন হইতেই বামা তাহাকে 'গঙ্গাজল' বলিয়া ডাকিত; সেই অবধি জ্ঞানদা বামার 'গঙ্গাজল'!

বৃদ্ধ। তবে এ সময়ে তাহার আসিবার কারণ কি? আর এমন খেদের গান গাহিতেছেই বা কেন? বলাই মামা ত সেখানেই আছেন।

গৃহিণী। কি জানি, মন যে বড় ব্যাকুল হ'ল; চল দেখি, নীচে নেমে জিজ্ঞাসা করি।

এই বলিয়া উভয়ে প্রদীপ হস্তে নীচে নামিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে বামা আবার সেই সুরেই গাহিল——

কোথায় জুড়াইব রে হৃদি-দাবানল,
সুধার সাগরে আজ উঠিল গরল!
জলদে বিজলী-মালা সুকুমারী সুরবালা
নাহি মানে কোন জ্বালা পবিত্র সরল!

সুধা মাখা শরদিন্দু নাহিক কলঙ্ক-বিন্দু
এ হেন সুধার সিন্ধু হ'ল হলাহল!
অধরে সুধার হাসি এত ভালবাসা বাসি,
কে দিল তাহাতে ফাঁসি এমন বিকল!
নিরমল গঙ্গাজল সুপবিত্র সুবিমল
কে বলে তাহারে বল এমন সমল?

গান শুনিতে শুনিতে ব্যাকুল প্রাণে নীচে নামিয়া আসিলেন—প্রাচীন-প্রাচীনা!

দশম অধ্যায়।

সন্তান না শত্রু?

প্রাচীন প্রাচীনা নীচে আসিয়া হস্তস্থিত প্রদীপ সহায়ে বামার বিষণ্ণ বদন ও জলভারাক্রান্ত নয়ন দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বামা বৈষ্ণবী তাঁহাদের উভয়কে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিল, "অসম্ভব কি সম্ভব হয়? যা দেখ্‌লেও বিশ্বাস হয় না, তা কি শুন্‌লে বিশ্বাস হয়? গঙ্গাজল কি অপবিত্র হয়?" গৃহিণী ব্যাকুল প্রাণে বিশেষ ব্যস্তভাবে কহিলেন, "কেন? কি হ'য়েছে?" বামা বলিল, "আর কি হ'বে? আমার গঙ্গাজল না কি অপবিত্র হ'য়ে অন্তর্দ্ধান হ'য়েছে!" গৃহিণী কহিলেন "সে কি?" বামা আবার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "কি আর বোল্‌ব মা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! তোমার জ্ঞানবতী জ্ঞানদা না কি অজ্ঞানা হ'য়ে গণেশ বাবুর কোন বন্ধুর সঙ্গে একদিকে চ'লে গিয়েছে; জামাই বাবুর সেই বন্ধু সর্ব্বদা সেই বাড়ীতে যাতায়াত কোর্‌তো, তাই না কি কেমন কোরে গঙ্গাজলের সঙ্গে ভালাবাসা হ'য়েছিল। একদিন সেই বন্ধু মিছামিছি তোমাদেরই নাম দিয়ে, তোমাদের অসুখ হ'য়েছে—তোমাদের মেয়ে দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'য়েছে, এই সকল ছলনার কথা লিখে জামাই বাবুকে একখান চিঠি

দিয়ে ছিল ; জামাইবাবু সেই চিঠি পেয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতেই গঙ্গাজলকে নিয়ে এখানে আস্‌ছিলেন। নৈহাটী ষ্টেশনে মেয়ে-গাড়ীতে গঙ্গাজলকে তুলে দিয়ে তিনি অন্য গাড়ীতে ছিলেন ; রামনগরে নেমে মেয়ে-গাড়ী হ'তে গঙ্গাজলকে নামাতে গিয়ে দেখ্‌লেন না কি সে গাড়ীতে কেহই নাই! তারপর তিন দিন ক্রমাগত সন্ধ্যা করে না কি জান্‌তে পাল্লেন যে তাঁর সেই বন্ধু বা শত্রুর সঙ্গে সে চ'লে গিয়েছে, আগে হ'তেই না কি তিনি তাদের এই ভালবাসা অস্পষ্টভাবে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, কিন্তু ঠিক্ বিশ্বাস কোর্ত্তে পারেন নাই। এই রকম ত আমাদের ওখানে জনরব ; এখন সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন! আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই—এর মধ্যে যে কি কাণ্ড হ'য়েছে, তা ভেবেই ঠিক্ কোর্ত্তে পাচ্চি না।

বৃদ্ধ হরপ্রসন্ন জ্ঞানদার কথায় জ্ঞানশূন্য হইয়া কহিলেন "বামা! আর আমার কন্যা নাই—আর আমার সম্মুখে তাহার নাম উচ্চারণ করিও না ; এখন আর সে কন্যা নহে—রাক্ষসী!" বামা কহিল "সে কি? আগে এ কথা সম্ভব কি অসম্ভব, মিথ্যা কি সত্য? তা না বুঝেই আপনি রাগ কোল্লেন কেন?" বৃদ্ধ কহিলেন "স্ত্রী চরিত্র দেবতাই বুঝিতে অক্ষম, তা আমি কি করিয়া বুঝিব? যেখানে সে আর ঘরে নাই, তখন সে যাহাই কেন হউক না—সে কুলটা—সে রাক্ষসী!"

গৃহিণী এই কথা শুনিয়া অবধি কেবল কাঁদিতে ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধের বাক্য শুনিয়া তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "মামা-শ্বশুর কোথায় গেলেন?" বামা বলিল "বলাই মামা সেখানে গিয়ে এইরূপ শুনেই সকলের সম্মুখে একবার হো—হো করিয়া উচ্চ হাসি হাস্‌লেন আর বল্লেন—'এ কথা কখনই বিশ্বাস হয় না ; যদি পূব দিকের সূয্যি পশ্চিমে উঠে, তবুও এ কথা কখনই সম্ভব হয় না। নিশ্চয়ই এর ভিতর কোন গুপ্ত ভাব আছে ;'—তখন তিনি আমাকে এখানে সংবাদ দিতে পাঠিয়ে দিয়ে বল্লেন—'যত দিন আমি জ্ঞানদার সন্ধান না পাবো, যত দিন আমি এই তত্ত্ব অবগত হ'তে না পারবো, তত দিন আর গণেশপুরে ফিরবো না। পাষণ্ড রমেশ যত অত্যাচারই করুক, জ্ঞানদাকে না পেলে আর আমার কোন দিকেই লক্ষ্য নাই'!—"এই ব'লে তিনি যে কোথা গেলেন, তা আর জানি না।"

গৃহিণী শুনিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং কহিলেন "মামাশ্বশুর ঠিক্ বুঝেছেন ; কর্ত্তার যেমন না বুঝেই রাগ!" বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন "বলাই মামা নিতান্ত

নির্ব্বোধ বলিয়াই আবার তিনি সেই কুলটা কন্যার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; আমার সম্মুখে আর সেই রাক্ষসীর কেহ নাম করিও না! আমার কুলগর্ব্ব, বংশ-মর্য্যাদা সকলই নষ্ট হইল—রাক্ষসী চিরদিনের জন্যই আমার 'মাথা হেঁট' করিল—মরিলেও শান্তি পাইব না।" কথা শুনিয়া গৃহিণী পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। সে রাত্রে তাঁহাদের কিম্বা বামার আর আহারাদি হইল না। কেবল ক্রন্দন-কোলাহলেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে প্রভাসচন্দ্র শ্যামার সহিত স্বদেশে স্ব ভবনে আগমন করিলেন; পরে সমস্ত শুনিয়া সকলেই সর্ব্বাধিক বিস্মিত হইলেন। প্রভাস কহিলেন "আমি এই ঘটনার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; বোধ হয় কোন দস্যু কর্তৃকই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে, নতুবা গঙ্গেশ বাবু ত জ্ঞানদার চরিত্রে সন্দিহান হইবার লোক নহেন। গঙ্গেশ একজন উন্নত সমাজ-সংস্কারক—স্ত্রীস্বাধীনতার পথপ্রদর্শক! তিনি কুসংস্কারাপন্ন জড়পিণ্ডবৎ হিন্দু নহেন—প্রকৃত হিন্দু! তিনি বিধবা ভগ্নী কামিনীর বিবাহ দিতেও বিশেষ উদ্যোগী! আরও জানি, গঙ্গেশ কংগ্রেসের ডেলিগেট—মিউনিসিপল কমিশনর! এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির সেরূপ ভ্রম হইতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন জুয়াচোর বা দস্যু কর্তৃক এই ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি কলিকাতায় গিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া থানায় থানায় 'হুলিয়া' করিয়া দিয়া জ্ঞানদার সন্ধান করিব।"

হরপ্রসন্ন কহিলেন "তাহা হইলে আরও দেশে দেশে তোমার পিতা মাতার মুখোজ্জ্বল হইবে। সন্তান নহিলে এমন সুহৃদ আর কে আছে? তোমাকে যে বাপু এতকাল আমরা লালন পালন কোরে লেখাপড়া শিখালাম, তার কি এই প্রতিফল? বুড়া বাপ মার দুর্দ্দশার দিকে দৃক্‌পাতও কর না; অধিকন্তু ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়ে আমাদের শেষ দশায় জাতি কুল নষ্ট কোর্‌তে উদ্যত হ'য়েছ। আমার যেমন পুত্র তেমনই কন্যা! পুত্র কুলাঙ্গার—কন্যা কলঙ্কিনী! ধিক্ আমাদের জীবনে!"

পিতার কথায় প্রভাসের রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি কহিলেন "শ্যামা দিদিকে পাঠাইয়া আমাকে লইয়া আসিলে কি রমেশ দাদার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য? না, এই সকল তিরস্কার করিবার জন্য? তুমি নিতান্ত নীচাশয় বলিয়াই তোমার দুর্গতি ঘুচে না; তোমার অন্তর অপবিত্র বলিয়াই অধঃপতন হইতেছে! তুমি যদি কোশা কুশী ত্যাগ করিতে পার—তুমি যদি মাটীর পুতুলের পায় মাথা কুটা ছাড়িতে পার—তুমি যদি কুসংস্কার

সমূহ বিসর্জ্জন দিতে পার, তবে সমাজ হইতে 'মাসহারা' বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি। সংসারে সকলেরই স্বাবলম্বন শিক্ষা করা উচিত! কেহ কাহারও গলগ্রহ হওয়া সভ্য নীতির অনুমোদিত নহে। মিষ্টার জন্‌বুলের পিতা তাঁহার বাসায় চারিদিনমাত্র আহার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিল করিয়া সেই পিতার নিকট হইতে তাহার খরচা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তার তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকিয়া অসুস্থ হইয়াছিল বলিয়া তাহার চিকিৎসার জন্য গিয়া ভিজিট লইয়াছিলেন এবং শ্বশুরের নিকট সমস্ত ঔষধের মূল্য বুঝিয়া লইয়াছিলেন। আবার মিষ্টার জে ঘোষ বলেন যে, পিতা পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন, পুত্রের নিকট তাঁহার কিছু পাইবার প্রত্যাশা নাই; তবে মাতা গর্ভে ধরিয়াছেন বলিয়া গুদাম ভাড়া কিছু পাইতে পারেন। আহা! এ সকল নীতি-বাক্য সভ্য জগতে সভ্য জাতির সার সামগ্রী! আর আমাদের মহামূর্খ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছে—'পিতা গগন হইতেও উচ্চ'!—তাহাদের মাথা! আবার কোন মূর্খ লিখিয়াছে—

'পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা॥'

এই সকল গণ্ডমূর্খ অলস ও জড়্‌পিণ্ডদিগকেও আবার সকলে পণ্ডিত বলিয়া ব্যাখ্যা করে? সাধে কি রমেশ দাদা আমাদের শত্রু হইয়াছেন? তুমিই ত বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছ। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর সহিত মনের মিল হয় নাই বলিয়াইত তিনি তাহাকে ডাইভোর্স (পরিত্যাগ) করিয়াছেন। খুড়া মহাশয় একটা অসভ্যা বানরীকে দাদার গলায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া সদ্বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছেন; নতুবা তাঁহার চিরজীবন চিরদুঃখেই কাটিত। এই জন্যই জগতের সভ্যজাতিগণ বিবাহের পূর্ব্বে কোর্টসিপ্ করে অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে, তাহার সহিত মনের মিল হইবে কি না কিছুদিন পরীক্ষাপূর্ব্বক ভালবাসাকে পাকা বাঁধনে বাঁধেন। তুমি যে কুলমর্য্যাদার ভয়ে যার তার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিও না। আমি নিজেই আমার প্রণয়িনী বাছিয়া লইতেছি। আহা! রমেশ দাদার সহিত মোহিনীর এমন মনের মিল এমন বাল্যপ্রণয়! তাহাতে প্রলয় তুমিইত ঘটাইলে; তুমিইত মথুর চাটুর্য্যে মহাশয়কে পরামর্শ দিয়া মোহিনীর বিবাহ অন্যত্র ঘটাইলে! কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর তাহাদের উভয়ের প্রেমের গভীরতা বুঝিতে পারিয়াই সদয় হইয়া

মোহিনীকে বিধবা করিলেন; সেই সূত্রে মথুর নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামের মধ্যে রমেশ দাদা একটী মহৎকার্য্যের আদর্শ দেখাইতে পারিবেন। বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থানুসারে হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ হইলে এই গণেশপুর উজ্বল হইবে। তুমিই এমন সুখের পথে কণ্টক! তোমার দুর্দ্দশা কখনই ঘুচিবে না। রমেশ দাদা শত্রুতা সাধিতেছেন কি সাধ করিয়া? তোমার যে কষ্টই হউক, আমি আর লক্ষ্যও করিব না— আমি চলিলাম, আর আমি তোমার নিকট আসিব না।

এই বলিয়া প্রভাস পিতাকে ইংরাজি ভাষায় নানারূপ গালি দিতে দিতে এবং বাবাকে বারম্বার 'ওল্‌ডফুল' বলিতে বলিতে ছুটীয়া রামনগর ষ্টেশনাভিমুখে চলিলেন। মায়ের মায়া—মায়ের স্নেহ—মায়ের প্রাণ বুঝে না, ছেলে আসিল আর চলিল—এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না বা কিছুই আহার করিল না; মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি দৌড়িয়া গিয়া প্রভাসের হাতদুখানি ধরিয়া—'বাপু বাছা' বলিয়া কত আদর করিয়া ডাকিলেন, কিন্তু গুণধর পুত্র সজোরে মাতার হাত ছাড়াইয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিলেন। জননী সেই ধাক্কায় ধরাশায়িনী হইলেন; পরে মাতৃ বা ধাত্রীস্থানীয়া শ্যামা হাত ধরিয়া ফিরাইতে গেল, কিন্তু প্রভাস তাহার অঙ্গে সবুট পদাঘাত পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। সেই আঘাতে শ্যামাও মাটীতে পড়িয়া গেল।

শ্যামা অতি কষ্টে মাটী হইতে মাটী ধরিয়া উঠিল বটে, কিন্তু প্রাচীনা গৃহিণী পড়িয়াই রহিলেন। তখন বৃদ্ধ ও শ্যামা দুইজনে হাত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর লইয়া গেলেন। গৃহমধ্যে গিয়াও গৃহিণী আর বসিতে পারিলেন না। শয়ন করিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন "আর কাঁদিও না, মনে কর আমাদের কন্যাপুত্র কিছুই হয় নাই"। গৃহিণী অমনি কহিলেন "বাছাকে তুমিইত রাগাইয়া দিলে; এখনকার কলিকালের ছেলে পিলের সঙ্গে সাবধানে কথা কহিতে হয়! তুমি যেন তেলে বেগুনে জ্'লেই আছ"। বৃদ্ধ বলিলেন "তা যেন হইল, আমি ত বুড়া বয়সে বাহাত্তুরে দশায় পড়িয়া অষ্টপ্রহর রাগিয়াই আছি; আর তোমার গুণধর কিরূপ নির্লজ্জভাবে মানের মাথায় পদাঘাত করিয়া আমার সহিত বাদানুবাদ করিল বল দেখি? আরও দেখ, তুমি ত আদর করিয়া আহ্বান করিলে— শ্যামাও ত সোহাগ করিয়া সম্বোধন করিল, তোমরা তাহার কি প্রতিফল

পাইলে বল দেখি" ? দুঃখে কষ্টে—জ্বালা যাতনায়—ব্যথা বেদনায়—মনকষ্ট মনঃপীড়ায় গৃহিণী আর কথা কহিতে পারিলেন না। অবলার বল অবিরল রোদনই এখন কেবল তাঁহার সম্বল হইল।

গৃহিণীর কাতরতাপূর্ণ বদন ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন নিরীক্ষণ করিতে করিতে নিরাশ হৃদয়ে বৃদ্ধ বারম্বার বলিতে লাগিলেন "বল দেখি, গৃহিণি, ইহারা—

সন্তান না শত্রু ?"

একাদশ অধ্যায়।

সরসী-সলিলে !

গণেশপুরের প্রান্তভাগে একটী সরোবরের কূলে বসিয়া একজন প্রৌঢ় পুরুষ একাকী একমনে কি ভাবিতেছেন। প্রায় সন্ধ্যা হয়—গোধূলিগগনে একটী মাত্র সমুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা দিয়াছে; এমন সময় পুরুষটী আপন মনে বলিতে লাগিলেন "কই, এখনও ত সেই দেবীমূর্ত্তির দর্শন পাইলাম না ? সেই একদিন বড় বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখস্থ জঙ্গলময় ফুলবাগানের কুঞ্জবনের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া দুইটীতে ভবিষ্যতের কত সুখের আশা করিয়াছিলাম; তার পর আর কয়দিন দেখিতে পাই নাই। সেই দিন সন্ধ্যার পর বুড়া বলাই কাশী হইতে না আসিলে আরও কিয়ৎক্ষণ সেই স্বর্গীয় সুখের আস্বাদ অনুভব করিতাম। যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, তাহাকে যদি অপরের অঙ্কশায়িনী হইয়া চিরদিন থাকিতে হইত, যদি সে বিধবা না হইত, তবে ত আমাকে পাগল হইয়া যাইতে হইত।

আহা! এই সরোবরে অবগাহন করিতে করিতেই ত উভয়ে প্রেম-সরোবরে ভাসিয়াছি! দেখ, সরসি! সেই দিনের সেই ভাবটী আজও যেন মনে পড়ে, বাল্যকালে যে দিন তোমার নির্ম্মল জলে নির্ম্মলা বালিকার সহিত জলক্রীড়া করিয়াছিলাম, তুমি অঙ্গের তাড়নে—হস্তের তাড়নে তাড়িত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে কত রঙ্গ দেখাইয়াছিলে; তাহা দেখিয়াই উভয়ে—উভয়কে ভাল বাসিতে শিখিয়াছিলাম। আর এক দিন তোমারই তীরে দাঁড়াইয়া

দুইটী হৃদয় প্রবল প্রেম-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল; সেই তোমার মৃদুতরঙ্গায়িত প্রবাহের সহিত সেই সরল হৃদয়ের ঈষচ্চঞ্চল প্রেম-প্রবাহ মিলিয়া গিয়া কেমন পবিত্র ভাব উৎপন্ন করিয়াছিল! সেই দিন হইতেই আমরা যুগল কপোত কপোতীর মত বেড়াইতাম; পরিশেষে পাষণ্ড হরপ্রসন্নই আমাদের এমন যোড় ভাঙ্গিয়া দিল! কিন্তু কই দুর্বৃত্ত জ্যেষ্ঠতাত! পারিলি না? তোর মনের আশা—প্রাণের সাধ মিটাইতে পারিলি না? তোর হৃদয়ের অসহ্য প্রতিহিংসার পরিশোধ লইতে পারিলি না? কেবল কিছু দিন কষ্ট দিলি মাত্র! কেবল সরল পথ ছাড়াইয়া জটীল পথে লইয়া আসিলি মাত্র! নিমকের গোলাম গোলামসদ্দার আর হৃদয়ের সুহৃদ হৃদয় থাকিতে এই জটীল পথও আমার সরল হইবে; কিন্তু তোকে ধিক্! তোর সর্ব্বনাশ সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদিকেই করিতেছি—এইবার সমূলে বিনষ্ট হইবি"!

এইরূপ বলিতে বলিতে পুরুষ পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটী এলোকেশী দিব্যাঙ্গনা দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার সকল কথা শুনিতেছে! সন্ধ্যার প্রাক্কালে যেন সুরপুর হইতে সুরবালা নামিয়া আসিয়া সেই সুপুরুষের সুললিত স্বর শুনিতেছে! সেই সদ্য-বিকসিত বদন-কমল—সেই অনিন্দ্য রূপলাবণ্য—সেই আগুলফ বিলম্বিত চিকুর-দাম—সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত মৃগনয়ন—সেই ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা দেখিয়াই সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়-মধ্যস্থিত হৃদয় দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, শিরায় শিরায় শোণিত-স্রোত সবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল! ক্ষণকাল পরেই পুরুষের পার্শ্বে রমণী বসিল—পুরুষ রমণী মিলিল! পুরুষ রমেশ—রমণী মোহিনী!

হরপ্রসন্নের সহোদর ভাই দুর্গাপ্রসন্নের পুত্র রমেশ! দুই ভাই সাবালক হইয়াই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়াছিলেন। বিষয়-বিভব বিভাগ করিয়া লইয়া কনিষ্ঠ দুর্গাপ্রসন্ন পৈতৃক-বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামের উত্তর প্রান্তে স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছিলেন। বিভাগের সময়ে জ্যেষ্ঠের নিকট কনিষ্ঠ সেই সুবৃহৎ অট্টালিকার অর্দ্ধাংশের মূল্য ধরিয়া লইয়াছিলেন—তাহাতে আর তাঁহার দখল ছিল না। দুর্গাপ্রসন্ন যে স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিতেন, তাহা একজন জমিদারের বাটীর ন্যায় নহে; সামান্য ইষ্টক-নির্ম্মিত একতল গৃহ মাত্র! লোকে তাঁহার বাড়ীকে ছোট বাড়ী বলিত এবং হরপ্রসন্নের বাড়ীকে বড় বাড়ী বলিত। তিনি অত্যন্ত ভোগ-সুখাভিলাষী এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিলেন; অবৈধ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পরিণাম-ফলে অকালেই

তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রমেশের জন্ম হয়; পরে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলে সেই গর্ভে রাধেশ নামক একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দুর্গাপ্রসন্নের মৃত্যুকালে রমেশের বয়স দ্বাবিংশ বৎসর এবং রাধেশের বয়স ছয় বৎসর মাত্র ছিল; কিন্তু সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা!

পিতার মৃত্যুর পর রমেশ বিমাতার সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত পূর্ব্বক বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি রাধেশকে লইয়া আপন পিত্রালয়ে গিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছেন। সেখানে তাঁহার মাতা ভিন্ন আর কেহই নাই। নিতান্ত নিরাশ্রয়ার ন্যায় মায়ের কাছে পুত্রটী লইয়া পরের সাহায্যে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছেন। রাধেশ এখন ষোড়শ বৎসরে পড়িয়া বিলক্ষণ বিদ্যাভ্যাস করিতেছে; রমেশ কিন্তু তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন।

মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে দুর্গাপ্রসন্ন সুবর্ণ গ্রামের রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা মায়ার সহিত রমেশের বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। মায়া স্বাভাবিকই বড় লজ্জাশীলা ছিল; অধিকন্তু সেই বালিকা বাল্য বয়সেই রমেশের অনেক অসৎ কার্য্যে বাধা দিত—অসৎ কল্পনা ত্যাগ করিতে বলিত; আবার বাল্য-প্রণয়িনী মোহিনীর প্রেমানুরাগও অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল; এই ত্রিদোষেই ত্র্যহস্পর্শ লাগিল—তিনি হৃদয়প্রসন্ন নামক জনৈক প্রিয় বন্ধুর পরামর্শে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ কিছু না বলিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া আর তাহাকে গৃহে আনিলেন না। মায়ার মায়া আর করিলেন না। মায়ার পিতা রাজসাহী জেলায় একটী বড় চাকুরী করিতেন; তিনি সপরিবারে সেখানেই থাকিতেন। কোন সময়ে ছুটী লইয়া তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র অভাগিনী কন্যা মায়ার সহিত নৌকারোহণে দেশে আসিতেছিলেন; সহসা প্রবল ঝড় উঠিয়া পদ্মাগর্ভে সেই নৌকাখানি আরোহী সমেত ডুবিয়া গেল। সেই অবধি তাঁহাদের নামটী পর্য্যন্তও জন্মের শোধ ডুবিয়া গেল—তাঁহাদের অস্তিত্বও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল! রমেশও পরম্পরায় সেই সংবাদ পাইয়া সেই অবধি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

মোহিনী এই গ্রামের মথুর চাটুয্যের মেয়ে! বাল্যাবধি রমেশের সহিত ইহার ভালবাসা! রমেশের বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর, মোহিনী তখন একাদশ বৎসরের বালিকা! সেই অবধি দুই জনেরই ভালবাসা! তাহার পর বয়ো-

বৃদ্ধির সহিত অনুরাগেরও ক্রমোন্নতি! সহসা অসহনীয় বিচ্ছেদ! লোকের পরামর্শ মতে মথুর কুল-ভঙ্গ না করিয়া যেমন অন্যত্র মোহিনীর বিবাহ দিল, অমনি পাদদলিত কালফণীবৎ উভয়েই গর্জ্জিয়া উঠিল! কখন্ কাহার সর্ব্বনাশ করিবে, উভয়েরই অহরহঃ কেবল সেই চিন্তা!

মোহিনীর নব-যৌবন-সময়ে একদিন তাহার স্বামী আসিলে সে রমেশের নিকট গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিল; রমেশ কহিলেন "আমিও তাই ভাবৃছিলাম, আমি গোলাম সর্দ্দারকে পাঠা'ব, সে গোপনে রাত্রিতে তোমাদের বাটীতে থাক্‌বে। কুলিনের পো ঘুমুলেই তুমি গোলামকে একবার ঘরের ভেতর যেতে দিও"। মোহিনী বাটী আসিয়া ঠিক সেইরূপ করিলে গোলাম গৃহমধ্যে গিয়াই মোহিনীর নিদ্রিত স্বামীর নাসারন্ধ্রে কি একটী পদার্থ মুহূর্ত্তমাত্র ঘ্রাণ লইতে দিল এবং পরক্ষণেই চলিয়া আসিল। তখন হইতে পঞ্চ দিবস পর্য্যন্ত সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর পঞ্চত্ব পাইল! কত লোক দেখান চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুই হইল না—কেহ ধরিতে ছুঁইতেও পাইল না।

ইনি সেই মোহিনী এবং ইনিই সেই রমেশ! উভয়ে অনেক দিনই মিলিয়াছেন; কিন্তু আজ আবার নূতন ভাবে প্রাণে প্রাণে মিলিলেন—মনে মনে মিশিলেন। রমেশ কহিলেন "প্রাণাধিকে! সেই কুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া অবধি কয়দিন তোমায় দেখি নাই কেন?"

মোহিনী। প্রাণাধিক্! এখন যেন কেমন লোক-লজ্জার ভয় করে; 'রাঁড়ের বিয়ে' 'রাঁড়ের বিয়ে' কোরে পাড়ার মেয়ে মহলে সকলে সর্ব্বদা বিদ্রূপ করে; তাই যেন আরও কেমন ঘৃণা হয়।

রমেশ। কেন, লজ্জার ভয়ে যে সময়ে তুমি পুনরায় বিবাহে মৌখিক অমত করিয়াছিলে, সে সময়ে সকলকেই ত শাসন করিয়া দিয়াছিলাম; আবার বুঝি সকলে সেইরূপ লাগিয়াছে? পুনরায় বিশেষ করিয়া শাসন করিব। তুমি প্রত্যহ নিঃশঙ্কে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; নতুবা আমি বড়ই অস্থির হই।

মোহিনী। আর কত দিন এরূপ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা কোর্‌বো? শীঘ্রই তোমাদের গৃহে লইয়া চল; পিসিমাও অস্থির হ'য়েছেন।

রমেশ। বটে, তবে কল্যই সকলকে জানাইয়া তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইব; সেই সঙ্গে পিসিমাও যাইবেন। আহা! তাঁহার

গুণ আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। তোমার পিতা নিরুদ্দেশ হইলে তাঁহার ভগ্নী তোমার পিসিমাই ত তোমাকে সযত্নে পালন করিতেছেন। দুই পিশি-ভাইঝিতে তবু এতদিন বাটীতে থাকিতে পারিয়াছিলে; আমি কেবল খরচ দিয়া খালাস ছিলাম বৈ ত নয়?

মোহিনী। গোলাম সর্দ্দার কি করিয়া আসিল?

রমেশ। সে আর কি করিবে? শ্যামা সমস্তই কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রভাসকে সতর্ক করিয়াছিল; তা যাক্, সে কাজ অন্য উপায়ে হাসিল করিব। মধ্যে বাটী আসিয়া প্রভাস তাহার অসভ্য, বর্ব্বর ও বদ্‌মায়েস বাপের সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিলাম, সে আর দেশে আসিবে না। সে দিন সেই কুঞ্জবনমধ্যে বলিয়াছি যে সেই বড় বাড়ী আমারই হইবে, আর তুমিই তাহার একমাত্র অধীশ্বরী হইবে; আজও আবার পুনরায় সেই কথা বলিতেছি।

মোহিনী। গোলাম এখন কোথায়?

রমেশ। তাহাকে আবার রাধেশের ধ্বংসকার্য্যে আপাততঃ নিয়োজিত করিয়াছি।

মোহিনী। তোমার প্রিয় সখা পরামর্শ-দাতা হৃদয়প্রসন্নকে ত কিছুদিন হইতে দেখিতে পাইতেছি না; ইহার কারণ কি?

রমেশ। হৃদয়কেও একটী গূঢ় কার্য্য সাধনের জন্য পাঠাইয়াছি। সে দিন বুড়া বলাই না আসিয়া পড়িলে সে কথাটীও তোমাকে বলিতাম। তুমি যখন প্রভাসকে মারিয়া ফেলিবার কথা শুনিয়া বলিলে যে 'জ্ঞানদা তাহার দাদার জন্য শ্বশুরবাড়ী বসিয়া কতই কাঁদিবে'; তখনই আমি ভাবিয়াছিলাম যে জ্ঞানদার সর্ব্বনাশও সত্বর হইবে। হৃদয়কে সেই কার্য্যের জন্যই পাঠাইয়াছি। জ্ঞানদার স্বামী গঙ্গেশচন্দ্র স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং বিধবা-বিবাহ ইত্যাদির প্রচলন জন্য বিশেষ ব্যস্ত! আমাদের পল্লী-সমাজ-সংস্কারক সভায় গঙ্গেশ একজন সভ্য! আমার পত্নী পরিত্যাগের কথা শুনিয়া গঙ্গেশের মনেও যে সেইরূপ ভাব আছে, তাহা আমি তাহার কথাচ্ছলেই বুঝিয়াছিলাম। হৃদয়ের সঙ্গেও গঙ্গেশের সখ্যতা আছে; হৃদয়

আবার একজন কুলিসংগ্রহকারক—তাহাতে সে বেশ দু পয়সা পায়। তাই তাহাকে পাঠাইয়াছি যে কোন কৌশলে গঙ্গেশ-দ্বারা জ্ঞানদাকে গৃহের বাহির করাইয়া হৃদয় একেবারে তাহাকে কুলির ন্যায় চা-বাগানে চালান দেয়। সন্ধানে জানিলাম কার্য্য সফল হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানদা না কি দামুকদিয়া ঘাটে ষ্টিমার হইতে পদ্মার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। হৃদয় নৌকা-যোগে নদীতে তাহার সন্ধান করিতেছে। তাহার পর কি হইল, এখনও শুনি নাই। ডুবিয়া মরিয়া থাকে ত আপদ চুকিয়া গিয়াছে, আর বাঁচিয়া থাকিলেও হৃদয়ের হাত হইতে অব্যাহতি নাই। আবার শুনিলাম বামা বৈষ্ণবী আসিয়া না কি সংবাদ দিয়াছে যে, গঙ্গেশ তাহাকে কুলটা বা ব্যভিচারিণী নামেও পরিচিতা করিয়াছে।

মোহিনী। প্রাণাধিক! তোমার চারি দিকে এরূপ জাল পাতিবার কারণ কি?

রমেশ। রাধেশকে মারিবার উদ্দেশ্য আমার এই বিপুল বিষয় অবিসম্বাদিত রূপে ভোগ করিবার জন্য এবং তোমাকে একমাত্র ইহার অধীশ্বরী করিবার জন্য। প্রভাসের বিনাশের চেষ্টা সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা ও তাহাদের অবশিষ্ট সম্পত্তির নির্ব্বিবাদে উত্তরাধিকারী হইবার জন্য। প্রভাস না থাকিলেও যদি জ্ঞানদার গর্ভে সন্তান হয়, তাহা হইলেও এই আশা ফলবতী হওয়া দুষ্কর হইবে বিবেচনায় পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া জ্ঞানদাকে গৃহ-বহিষ্কৃতা করিলাম। এ সকল কার্য্য কি কেহ জানিতে পারে? না ধরিতে ছুঁইতে পায়?

মোহিনী। এতক্ষণে এ সকলের কূট অর্থ বুঝিলাম।

রমেশ। তুমি বুঝিবে না ত কে বুঝিবে বল দেখি? তুমিই ত এই বাঘের যোগ্য বাঘিনী! প্রেম-আদরিণি! তোমার হৃদয় যে কত গুণের আকর—কত প্রেমের সাগর, তাহা ঠিক করা যায় না। তোমার এক এক দিনের এক একটী কথা মনে হইলে আমার আত্ম-বিস্মৃতি জন্মে। আবার সেই দিনের সেই কথা—যে দিন তুমি তোমার স্বামীকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট আসিলে, সেই দিন তোমার সেই সুগভীর প্রেম-সাগরের তল কোথায়, তাহা আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

মোহিনী। কি বলিলে রমেশ? তোমারই বা কোন্ দিনের কোন্ কথাটী বা কোন্ ভাবটী ভুলিব? আর সেই দিন, যে দিন তুমি আমারই জন্য সেই সুন্দরী মায়া-রাক্ষসীকে অবহেলে চিরদিনের তরে দূর করিয়া দিলে, সেই দিন তোমার ত্যাগ স্বীকারের আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়াই আমি চিরতরে তোমার নিকট বিক্রীত হইয়াছি।

রমেশ। মোহিনি! আমার মনমোহিনী মোহিনি! এই সরোবরে সাঁতার দিতে দিতেই আমাদের প্রথম প্রেমের অঙ্কুর হয়; এস আজ এই সরসী-নীরে দাঁড়াইয়াই আমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হই। কল্য সর্ব্ব-সমক্ষে বিবাহোৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া তোমাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে গৃহে লইয়া যাইব; অদ্য ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমরা পবিত্র পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইলাম—অন্ত সংসার-ক্ষেত্রে আমরা চিরসম্মিলিত হইলাম। দেখি কে আমাকে সমাজচ্যুত করে? হিন্দুমতে বিধবা-বিবাহ ত আর অশাস্ত্রীয় নহে; তবে কাহার এমন ক্ষমতা যে আমাকে সমাজচ্যুত করে? এখন এখানে আমিই সমাজ!

এই বলিয়া রমেশ সোপান-শ্রেণী অবলম্বনে সরসী-নীরে নামিয়া জলের উপর দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে ডাকিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উভয়ে মিলিত হইলেন, পরে "এস প্রাণেশ্বরি! এস চিরসহচরি!" এই বলিয়া স্বীয় দক্ষিণ বাহু দ্বারা মোহিনীর গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন ও কহিলেন "প্রিয়তমে! আর তোমার এ বেশে থাকিতে হইবে না; তোমাকে সুচারু বসন ভূষণে ভূষিত করিব—তোমার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত করিব। তোমার এই বিশ্ববিমোহন ভুবন ভুলান অপরূপ রূপ অলঙ্কারের জ্যোতিতে আরও সমুজ্জ্বল দেখাইবে; আর আমি সেই অনিন্দ্য জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্য-সাগরে দিবানিশি ডুবিয়া থাকিব।" মোহিনী কহিল "প্রাণেশ্বর! শুনিয়াছি সোনার নাকি এখন পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণ দাম বাড়িয়াছে?" রমেশ সগর্ব্বে কহিলেন "তাহাতে তোমার আমার কি? আমার কিসের অভাব? তোমার অই বর-অঙ্গ সাজাইতে সর্ব্বস্ব দিতেও রমেশ প্রস্তুত!" কথাগুলি শুনিয়া মোহিনীর মনোহর মুখে যেন আনন্দ-জ্যোতি বিভাসিত হইল। রমেশ তাহা দেখিয়া বিভোর হইয়া আদরের মাত্রা আরও চড়াইলেন। এমন সময়ে গ্রাম হইতে ঘাটে আসিবার পথ দিয়া কে যেন কোমল-কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে ঘাটের দিকেই আসিতে লাগিল; সে গাহিতেছে——

প্রেম-সাগরে পূরো জোয়ারে দূরে গেল সই বিচ্ছেদ-ভাঁটা!
কালের গুণে কানা বেগুনে মিশ্‌লো লো সই ডেঙ্গো ডাঁটা!
আমরা যত কুল-নারী, মুখ ফুটে তা বোল্‌তে নারি,
কাঁপে অঙ্গ থর হরি, যেন নবমীর পাঁটা!
তাজা বিষের 'ঈশুমূল' বোল্‌তে গেলে রয়না কুল,
দেখে শুনে প্রাণ আকুল যায় না লো তায় আঁটা!
কারে বলি মনের ব্যথা উল্‌টো কলির উল্‌টো কথা,
পাপের পশার যথা তথা পুণ্য-পথে পড়ে কাঁটা!
সোনার বাজার ভারি চড়া ভার হ'ল রে গয়না গড়া,
গিন্নীদের মেজাজ কড়া বিবিদেরো লাগে বাঁটা!
কবে যা'ব রে সিঙ্গে ফুঁকে হেসে খেলে নিই রে মুখে,
পাপীদের পোড়ার মুখে মেরে শুধু মুড়ো ঝাঁটা!

গান শুনিয়া মোহিনী মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "এ সময়ে এ পথে কে আসিল?" রমেশ কহিলেন "কি জানি? ভৌতিক ভয়ের প্রবাদে এ পথে অপরাহ্ণেও কেহ আসে না; সেই জন্য নির্জ্জন বলিয়াই এই সরসীর কূলে মধ্যে মধ্যে আমরা আসিয়া থাকি, কখনও ত এ সময়ে এখানে কেহই আসে নাই। আজ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইল, এখন এ পথে কে আসিল? আবার যেরূপ গান গাহিল, তাহাতে আমাদেরই উপর যেন শ্লেষোক্তি বলিয়া বোধ হইল। সেটা আমাদের মনে গুণে আমাদেরই উপর লক্ষ্য করিয়া গাহিল বোধ হইতেও পারে; সে অন্য ভাবেও এই গান গাহিতে পারে। কিন্তু এখন আসিতেছে কে?" মোহিনী একেবারে নিরুত্তর! বিষম ভয়ে আকুল হইয়া তাহার মুখখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রমেশ তাহা দেখিয়া আবার কহিলেন "ভয় কি মোহিনী? লজ্জাই বা কি? যখন আমরা সর্ব্বজন সমক্ষেই বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতেছি, তখন আর ভয় কি?"

এই বলিয়া রমেশ মোহিনীর সহিত ঘাটের উপর উঠিয়া দেখিলেন একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই চিনিলেন—এ সেই বামা বৈষ্ণবী; পরে কহিলেন "কি রে বামা কবে এসেছিস্?" বামা মৃদু হাসিয়া মৃদু স্বরে কহিল "কাল!"

রমেশ। এই সন্ধ্যারাত্রে একাকিনী এ ঘাটে কেন?

বামা। ডুবে মোর্‌তে।

রমেশ। গ্রামের মধ্যে ত অনেক পুকুর পুষ্করিণী আছে? তবে এই গ্রাম ছাড়া হ'য়ে তফাতে ভূতের ভয়ের পথে কোন্ সাহসে আসিলি?

বামা। যেখানে যার সুখ। তা ভয়ই বা কি, লজ্জাই বা কি?

রমেশ। মরণেও কি সুখ আছে নাকি?

বামা। আছে বৈ কি!

রমেশ। তোর মরণের সুখ কোথায়?

বামা। কেন, এই—**সরসী-সলিলে।**

একাদশ অধ্যায়।

শ্যামা ও বামা!

শ্যামা ও বামা বৈষ্ণবী পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর পতিপুত্র হীনা হইয়া দুই ভগ্নীতে এই গণেশপুরে ভদ্র পল্লীতে একখানি তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহ মধ্যেই বাস করিত। শ্যামা বড় বাড়ীতে এবং বামা ছোট বাড়ীতে পরিচারিকার কার্য্যে নিয়োজিতা ছিল। সারাদিন পরের বাড়ী কাজ করিয়া রাত্রিতে দুই ভগ্নীতে আপন ঘরে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিত। ছোট বাড়ীতে কর্ত্তার মৃত্যু হইলে রমেশের অস্বাভাবিক অত্যাচার দেখিয়া বামা সেখানকার কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়া থাকিল। বিশেষতঃ রমেশের বন্ধু ও বয়স্য হৃদয়প্রসন্নের কটূক্তিতে বামা আরও শীঘ্র কার্য্য ছাড়িয়া ছিল।

এই সময়েই বুড়া বলাই বড় বাড়ী হইতে ভাগিনেয়ের উপর রাগ করিয়া আদরের খুকি দিদিকে ফেলিয়া কাশী চলিয়া গিয়াছিলেন। খুকি দিদি তখন ঠাকুরদাদার আদর সোহাগে বঞ্চিতা হইয়া বামার আশ্রয় লইয়াছিল, বামাও তাহাকে প্রাণের অধিক জ্ঞানে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। বামা বৈষ্ণবী বহুদিন হইতে ভদ্রসংস্রবে থাকায় কিছু লেখাপড়া জানিত এবং অনেক জ্ঞান বুদ্ধিও ধরিত। জ্ঞানদাকে বামাই 'বোধোদয়' পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইয়া ছিল এবং পরে 'রামায়ণ' 'মহাভারত' আদি অনেক ধর্ম্মগ্রন্থও পড়াইয়াছিল। বামা সঙ্গীত বিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শিনী ছিল; তাহার আভাস পাঠক

পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। বামার অনেক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত সংগ্রহ ছিল এবং কণ্ঠস্বরও জন-মন-মুগ্ধকর ছিল। জ্ঞানদাকে সময়ে সময়ে সুর-লয়-সংযোগে সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত অভ্যাস করাইতেও বামা যত্ন করিত। জ্ঞানদাও বলাই দাদার শিক্ষিত সাধা গলায় সেই সকল সুর-লয় ও সংগীতাদি সুন্দররূপে শিখিয়াছিল—এমন কি শেষে সেই বাল্য বয়সে বামা অপেক্ষাও তাহার সঙ্গীতশক্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; অথচ বিবাহের পর সেই লজ্জাবতী ললনার যে এই শক্তি আছে, তাহা তাহার শ্বশুর বাড়ীতে এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতেও পারে নাই। লজ্জাশীলা বঙ্গবালা গৃহস্থের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে যে ভাবে বিরাজ করেন, জ্ঞানদা গঙ্গেশের গৃহে সেইভাবেই থাকিয়া সকলের সুখ্যাতির পাত্রী হইয়াছিলেন; এই জন্যই ত তাহার কপাল পুড়িয়াছে!

বামা প্রৌঢ়া আর জ্ঞানদা বালিকা! তবু তখন তাহাদের ভালবাসা বয়সের সামঞ্জস্যকে দূরে ফেলিয়া উভয়ের অন্তরেই আশ্রয় লইয়াছিল। বামা জ্ঞানদাকে 'গঙ্গাজল' বলিয়া ডাকিত; জ্ঞানদাও তাহাকে 'গঙ্গাজল' বলিত! এইরূপে উভয়ের ভালবাসা ক্রমশঃই বাড়িয়া গিয়াছিল। জ্ঞানদাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবার সময় তাহার পিতা বামাকেই ঝি'র স্বরূপ কন্যার সহিত পাঠাইয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত সে সেখানেই থাকিত। গঙ্গেশবাবুর মাতা তাহার কাজকর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে চিরদিন তাঁহাদের বাটীতে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ বামা বহু গুণে গুণবতী বলিয়া তাহার ন্যায় ঝি বাটীতে রাখিতে সকলেই যত্ন করে। আরও বামা 'ডাইনে খাওয়ার' জলপড়া, স্ত্রীলোকের গোপনীয় রোগের ঔষধ, ছেলেপিলের 'বাল্‌সা' বা অসুখের উপায় এবং বিস্তর টোট্‌কা টুট্‌কী ও শিকড় বাকড়ের গুণ অবগত ছিল; সেই জন্য গ্রামের লোকও তাহার বাধ্য হইয়া পড়িল। বামাও বেশ আনন্দের সহিত জ্ঞানদার নিকট থাকিল; কিন্তু কোথা হইতে কখন্ যে তাহার সাধের 'গঙ্গাজলের' এইরূপ গ্রহ ঘটিল, তাহার বিন্দুবিসর্গও সে জানিতে পারে নাই। সে জানিত জ্ঞানদা গঙ্গেশবাবুর সহিত পিত্রালয়েই যাইতেছে, কিন্তু এ দিকে যে তাহার জন্য যমালয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

গঙ্গেশবাবু বাটী ফিরিয়া আসিয়া নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য এবং জ্ঞানদাকে চির-কলঙ্ক-সাগরে ডুবাইবার জন্য যে ভাবে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই বামার মনে বিশেষ ধারণা হইয়াছিল যে, এই কার্য্য

জ্ঞানদার পিতার পরম শত্রু ও তাহার পূর্ব্ব প্রভু রমেশ পশু কর্ত্তৃকই ঘটিয়াছে। একে ত জ্ঞানদার জন্ত বামা পাগলিনীর ন্যায় হইয়াছে, তাহার উপর আবার সেই অকলঙ্ক চাঁদের কলঙ্কের কথা শুনিয়া সে নিতান্তই অধীরা হইয়াছে! আর তাহার কাজকর্ম্মে ইচ্ছা নাই—পরাধীনতায় শান্তি নাই—ঔষধ বিতরণাদি পরোপকারে প্রবৃত্তি নাই—রঙ্গ-রস বা হাস্ত-কৌতুকে মতি নাই! কেবল বাসনা—দেশে দেশে স্বীয় কণ্ঠস্বর ছড়াইয়া ভিক্ষা করিয়া ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রাণের অধিক ধন জ্ঞানদার অনুসন্ধান করা—প্রাণের একমাত্র শান্তিজল সেই সুনির্ম্মল 'গঙ্গাজল' যে কোথায় গিয়াছে, কেবল তাহারই খোঁজ করা! তাই বামা বলাই মামা বলিবামাত্রই গণেশপুরে এই শোচনীয় সংবাদ দিতে আসিয়াছে ; এখানে কৌশলে কোনরূপে রমেশের নিকট জ্ঞানদার গুপ্তসন্ধান কিছু জানিতে আসাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য!

তাই আজ সে বিকালে পাড়ায় সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়াছিল। পরে মোহিনীর পিসির নিকট আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "মোহিনী কোথায় পিসিমা?"

পিসি। কি জানি, সে কোথায় বেড়াতে গিয়েছে। তুমি কবে এলে?

বামা। কয় দিন হ'ল এসেছি। হ্যাঁ পিসিমা! মোহিনীর নাকি দ্বিতীয় বিবাহ?

পিসি। সে কি রে? সে যে কবে হ'য়ে গিয়েছে; তুমি তার কাদায় কত নাচ গান কোরে ছিলে, তা কি মনে নাই? তারপর তার কপালও পুড়ে গিয়েছে—এখন আর সে কথা কেন?

বামা। তা নয়, তা নয়, আবার নাকি মোহিনীর বিয়ে হবে?

এই কথায় মোহিনীর পিসি রাগিয়া উঠিল এবং বামাকে দু কথা শুনাইয়া দিল। বামা মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে পলাইয়া একেবারে ছোট বাড়ী চলিয়া আসিল। তথায় রমেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া তাঁহার সন্ধান লইল ; কিন্তু তাঁহাকেও বাড়ীতে দেখিতে না পাইয়া বামা মনে মনে ভাবিল যে, ইহারা দুইজনে নিশ্চয়ই কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রেমালাপ করিতেছে। এখন আর নির্জ্জন কোথায়? তবে গ্রামের প্রান্তভাগে 'সরসী' নামক যে সরসী আছে, তাহারই তীরস্থ একটী অশ্বথ বৃক্ষে এক ব্রহ্মদৈত্য আছেন ; বিকালে তিনি জলে নামিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করেন, সেই জন্য দুপরের পর আর সে পুকুর ধারে কেহই যায় না। এই অলীক প্রবাদের কথা বামাও

জানিত এবং এ সময় এই স্থানই যে গুপ্ত প্রেমিক-প্রেমিকার বিহার-ক্ষেত্র, তাহাও সে অবগত ছিল। তাই আজ সে সন্ধানে সন্ধানে সরোবর-কূলে আসিয়া অলক্ষ্যে তাহাদের সকল কথাই শুনিতে পাইল; কেবল যে কথা শুনিবার জন্য সে বিশেষ ব্যাকুলা, তাহাই ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। কারণ জ্ঞানদা-সম্বন্ধীয় কথাগুলি রমেশ মৃদু স্বরে মোহিনীকে বলিয়াছিলেন; তবে যাহা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহাতে রমেশ কর্ত্তৃকই যে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে এবং রমেশের সেই প্রিয় বয়স্য হৃদয়প্রসন্ন, যে বামাকে ব্যঙ্গোক্তি করিয়া ব্যথা দিয়া ছোট বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছিল, সেই পাষণ্ডই যে রমেশের আদেশে জ্ঞানদাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, ইহা সে ঠিক ধারণা করিয়াছিল। আবার পাষণ্ড হৃদয়কে সে গঙ্গেশের সহিত তাঁহাদের বাটীতে আলাপ করিতেও দেখিয়াছে। কথায় ও কার্য্যে—ভাবে ও ভঙ্গীতে বামা ঠিক বুঝিল যে, হৃদয় তাহার হৃদয়ের ধন অপহরণ করিয়াছে। বুঝিয়াই সে চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু যে স্বভাবতঃ রসিকা বা কৌতুক-প্রিয়া হয়, দুঃখের সময়ও কোন বিসদৃশ ভাব দেখিলে সে তাহাতে কৌতুক না করিয়া থাকিতে পারে না। তাই সে এই মাণিকযোড়ের যুগল মিলন বা গুপ্তবিহার দেখিয়া তাহাদেরই লক্ষ্য করিয়া সেই গান ধরিয়াছিল। পরে রমেশ "তবে তুই ডুবে মর্—আমরা চোল্লাম" বলিয়া মোহিনী-সহিত চলিয়া আসিলে, বামাও অলক্ষ্যে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া বাটীতে উপস্থিত হইল!

তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর! বামা বাড়ী আসিয়া দেখিল তাহার দিদি শ্যামা তখনও বড় বাড়ী হইতে বাড়ী আসে নাই। সে গৃহে গিয়া প্রদীপ জ্বালিল ও চারিদিকে 'সন্ধ্যা দেখাইল'! উঠানে লাউয়ের মাচার তলায় তুলসী-মঞ্চের নিকটও একটী দীপ জ্বালিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তথায় 'ঢিপ ঢিপ' করিয়া মাথা কুটিয়া প্রণাম করিল। তুলসীমঞ্চের আলোকে উঠানের অন্যান্য বৃক্ষ-লতাদিও আলোকিত হইল। শ্যামাও ঝাড়ন কাড়ন, মারণ উচাটন, স্তম্ভন বশীকরণ প্রভৃতি বিস্তর তন্ত্রমন্ত্র জানিত এবং নানাবিধ গাছগাছড়ার গুণাবলী অবগত ছিল। সেই জন্য অনেক রকম গাছ ও লতা তাহার উঠানে আছে। সেই সকলের মধ্যে লজ্জাবতী, নাগদানা, শ্বেতকরবী, কৃষ্ণকালী, বনচাঁড়াল, আয়াপান বা বিশল্যকরণী, বিষহরি, আকনাদি বা নিমুখো, আপাঙ্গ বা চিড়-চিড়ে, কালমেঘ, ঘৃতকুমারী, ওলটকম্বল, ভৃঙ্গরাজ, সোমরাজ এবং মুক্তবর্ষী প্রভৃতি গাছগুলি বিশেষ যত্নের সহিত সে পালন করিত এবং দীপ জ্বালিয়া

তাহাদিগকেও 'সন্ধ্যা দেখাইত'। বামাও সে সকল সম্পন্ন করিল। পরে হাত পা ধুইয়া ঝোলা লইয়া হরিনামের মালা জপিতে বসিল।

ক্ষণকাল পরে শ্যামা বিষণ্ণ বদনে বাড়ী আসিয়া বলিল "বামা! বড় বাড়ীর গিন্নী বুঝি আর বাঁচেন না!"

বামা বিস্ময়ের সহিত কহিল "সে কি?" শ্যামা করুণস্বরে কহিল "যে রকম দেখ্‌লাম, তাতে এই রাত কাটায় কি না বলা যায় না! প্রভাসের আঘাতে সেই যে প'ড়ে গেলেন, আর উঠ্‌তে পাল্লেন না; বরং বুকে ব্যথা, জ্বর, কাশী, প্রলাপ।

বামা। চিকিৎসা কি হ'চ্চে?

শ্যামা। আগে ও পাড়ার ধীরু কবিরাজ দেখ্‌ছিল, তাতে রোগের অনেক উপশমও হ'চ্ছিল, তারপর পাঁচজন লোকের কথা শুনে কর্ত্তা আজকাল্‌কার একজন পাস করা ডাক্তার ডেকেই এই সর্ব্বনাশটা কোল্লেন। সে এসেই আগে বগলের ভিতর 'খণ্ডার মুগুর' না কি একটা পুরে দিল——

বামা। (মৃদু হাসিয়া) সেটার নাম থারমামিটার! জ্বর পরীক্ষার যন্ত্র! তারপর?

শ্যামা। পরে আবার সানাইয়ের মত বুকে একটা কি বসিয়ে দিয়ে কান পেতে কি শুন্‌তে লাগ্‌লো——

বামা। (হাসিয়া) তার নাম—ষ্টিথ্‌স্‌কোপ! বক্ষ পরীক্ষার যন্ত্র! তারপর?

শ্যামা। তারপর দুটো সিসিতে দু রকম আরক খেতে দিল, আর একটা ছোট সিসিতে ওষুধ দিয়ে তার গায় 'বিষ' লিখে রেখে বুকে পিঠের দাঁড়ায় পাঁজরায় মালিস কোর্ত্তে বোল্লে। সেটা কি সত্যি সত্যিই বিষ? বিষেই বা মেরে ফেল্লে? সেই দুই আরক খেয়ে আর এই বিষ মালিস কোরেই ত গিন্নি ক্রমে অজ্ঞান হ'য়ে পোড়লো, আর হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল!

বামা। ওষুধগুলির নাম কি শুন্‌তেও পাও নাই?' তোমার ত দিদি একবার শুন্‌লেই সব মনে থাকে; সেবার সেই ঝাড়ন মন্তোর শেখ্‌বার সময় ত একবার শুনেই শিখে ছিলে।

শ্যামা। শুনেছি বই কি! আগে কাগজে লিখে 'পেচ্ছব্‌পণ' কোরে তবে ত ওষুধ দিলে!

বামা। 'পেচ্ছাব-পণ' নয় "প্রেস্কৃপ্সন!" ওষুধগুলার নাম কি?

শ্যামা। কি জানি—কি বোল্লে! আমার আবার সব কথা বেরোয় না; একটা সিসিতে—এমন খাবরা, ভাইয়ের নামে গেলো ছাই, ভাইয়ের নামে ছিপি কাক্, স্বরূপ কলু, তিন চার ছেলের গা, তিন চার সিন্নি, কোলের এধার এই সব! আর একটায় দিলে ব্যোমার পটাস্, তিন চার বেলের দোনা আরও কত কি! বিষের মালিসের নাম বোল্লে—এমন লেল্লাই মাঠ!

বামা। ওষুধগুলার নাম অনেক মনে আছে বটে, কিন্তু ভাল কোরে ত বোল্‌তে পাল্লে না দিদি! প্রথম দিয়েছে—এমন্ কার্ব্ব, ভাইনম গ্যালিসাই, ভাইনাম ইপিকাক্, সিরাপটলু, টিন্‌চার সেনেগা, চিঞ্চার সিলি, আর ক্লোরিক্ ইথার! দ্বিতীয় সিসিতে ব্রোমাইড অব্ পটাশ্ আর চিঞ্চার বেলেডোনা! মালিসের নাম—এমনিয়া লিলিমেণ্ট! পাছে কেউ খায় বা রোগীকে খাইয়ে দেয় বোলে ডাক্তার ঐ শিশির গায় বিষ লিখে দিয়েছে। এখন বুঝ্‌লে?

শ্যামা। এ সকল ভাই তুই কোথা শিথ্‌লি?

বামা। নারায়ণপুর নৈহাটীর নিকট—কলিকাতা ঘেঁসা জায়গা! লোকে কথায় কথায় মেয়ে ডাক্তার ও পাস করা ধাই মাগীদের নিয়ে আসে। গঙ্গেশবাবুর বাড়ী একজন মেয়ে ডাক্তার এসে অনেক দিন ছিল, সে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দুই রকমই জানে, তাই আমি তার কাছে এ সকল শিখিছি।

শ্যামা। হুমোপ্যাথি ত কেবল জল!

বামা। চাষা-লোকে তাই বলে বটে; সেবার সেখানে তালুকমণ্ডলের কলেরা হ'লে সেই মেয়ে ডাক্তার তাকে ভেরেট্রাম আর কুপ্রম পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ পর পর খেতে দিয়ে আরাম কোরে ছিল; দাম দেবার সময় সে ব'লে ছিল—"মোরে নিছাক্ পানি খেইয়েছ, পানির আবার দাম কি?" শুনে সবাই হেসে অবাক্! ঠিক্ লক্ষ্য কোরে এই ওষুধ দিতে পাল্লে এক ফোঁটাতেই অনেক রোগ পলায়। দেখিছি সেই ডাক্তার জ্বরে একোনাইট ও বেলেডোনা, কোষ্ট বদ্ধে নক্স, রক্তামাশায়ে মার্কিউরিয়স করোসাইভস্, কলেরার শেষ অবস্থায় হাইড্রোসেনিক এসিড, আর্সেনিক, কোব্রা ইত্যাদি দিয়েও বেশ ফল পেতেন, আরও

রোগানুসারে, লক্ষণানুসারে অনেক ওষুধ দিয়ে বেশ চিকিৎসা কোর্‌তেন। বাবুদের বাড়ী একদিন লুচী, আলুর দম, মাছের কালিয়ে প্রভৃতি খেয়ে আমার পেট ফেঁপে ছিল, কিন্তু এক ফোঁটা পল্‌সেটিলায় আমার তা সেরে ছিল; তাই বলি এমন ওষুধ আর হবে না—আমাদের কবিরাজীর সঙ্গেও না কি এর অনেক মিল আছে।

শ্যামা। এলোপাতি বা হুমোপাতি পাতি পাতি কোরে দেখ্‌লেও আমাদের 'সার কুমারী' (সার কৌমুদী) মতের চিকিচ্চের সমান হবে না। যে দেশে আমাদের জন্ম, সে দেশের গাছগাছড়ায় অভক্তি কোরে বিলিতী জল খেয়েই ত আমাদের রোগ বালাই ঘোচেই না। দুধ-সাগু ও দুধ-সুজী—দু দিন পরেই ভাল, ভাত আর মাছের ঝোল। এমন সুখের পথ্য ছেড়ে কে এখন শুকিয়ে ম'রে খই বাতাসা ও পাঁচন খেয়ে রস পরিপাক করে? তাই দুর্দ্দশাও তেমনই হ'য়েছে।

বামা। সে কথা মিথ্যা নহে; সেই মেয়ে ডাক্তারও বোলে ছিলেন যে, "ডাক্তারগণ ম্যালেরিয়ার যে কারণই বলুন, আমার মতে কুইনাইন যত দিন—ম্যালেরিয়া তত দিন। এলোপ্যাথি চিকিৎসা আশু প্রতীকারক বটে, কিন্তু পরিণাম শুভপ্রদ নহে; মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচায় বটে, আবার অচীরেই চরমের পথে লইয়া যায়!" তার এ কথা আমি শিরোধার্য্য করি। তারপর গিন্নি এই ওষুধ খেয়ে কি রকম হ'লেন বল দেখি? তুমি ঝাড়ান কাড়ান কিছু কোরে ছিলে কি?

শ্যামা। ঝাড়ান কাড়ান কোরেছি; তবে কেলে কোঁড়ায় মাটীর নীচের শিকড় তুলে তার ছাল আদা দিয়ে বেটে বুকে প্রলেপ দিই ছিলাম; তাতেও বেশ উপকার হ'য়ে ছিল, কিন্তু কোথা হ'তে কাল-ডাক্তার বা শমন এনেই গিন্নিকে শমন-ভবন শিগ্গিরই দেখ্‌তে হ'ল। তন্ত্র-মন্ত্রের ফল খুব ভাল, কিন্তু বিশ্বাস চাই!

বামা। সে কথা ঠিক্, আমি জল প'ড়ে কত লোককে দিই; কিন্তু যাদের অবিশ্বাস হয়—যারা বুজ্‌রুকি মনে করে তাদের সারে না। বিশ্বাসই মূলাধার! তন্ত্রমন্ত্র সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, সকলেই বিশ্বাসের বশীভূত! তাই ত দিদি গিন্নির অবস্থা শুনে মনটা যেন বড়ই চঞ্চল হ'চ্চে।

শ্যামা। বুড়া কর্ত্তার একমাত্র আশা ভরসা সতীসাধ্বী পতিব্রতা গিন্নি গেলে বুড়ার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে! এখন আমি কি করি?

বামা। তুমি প্রভাসের পদাঘাত সহ্য কোরে প্রভাস প্রভাস কোরেই চিরদিন মর—আর কি কোরবে?

শ্যামা। ও কথা বল কেন ভাই? ছেলেবেলা হ'তে তাকে মানুষ কোরেছি, তাই কেমন তার ওপর মায়া! নইলে কে তার এমন পীড়ন সহ্য করে? তুমিই বল দেখি, পরের মেয়ের জন্য তুমি এখন দেশে দেশে বেড়াবে কেন? মায়ার এমনই টান্!

বামা আর উত্তর করিতে পারিল না; তখন শ্যামা কহিল "এখন কোথা যাবে বল দেখি?" বামা কহিল "এখন এদিক ওদিক খুঁজবো—পরে চৈত্রমাসে এবার বুধাষ্টমী যোগের সময় ব্রহ্মপুত্রে স্নান কোর্‌তে গিয়ে ঐ অঞ্চলে খুঁজে বেড়াবো—আর যদি সেখানেই পাই, তবে ত শুভগ্রহ! আহা এমন দিন কি হবে?"

শ্যামা সোৎসুকে কহিল "সে সময়ে আমিও তোমার সঙ্গে যাব; অই যোগ ত আর শিগ্‌গির সকল বছর হয় না; বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে একবার ব্রহ্মপুত্রে ডুব দিয়ে আসি। সে সময়ে এখানে এসে আমাকে নিয়ে যাবে ত?" বামা আনন্দের সহিত কহিল "তা আর যাব না? দুই বোনে দূর পথে যাওয়া কত সুখ? তবে আমি কাল্ খুব ভোরবেলাই এখান থেকে চ'লে যা'ব—আবার ঠিক্ চৈত্রমাসে সেই সময় আস্‌বো। তুমি আপাততঃ বুড়া কর্ত্তার এই দুঃসময়ে কোথায়ও ফেলে যেও না; তা'হলে ভগবানের নিকট ত অপরাধিনী হ'তেই হবে, তাহা ছাড়া লোক-সমাজেও মুখ পাইবে না।"

এই কথায় শ্যামার চক্ষে জল আসিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "তা কি আমি প্রাণ থাক্‌তে পারি? গিন্নি গেলে কর্ত্তা যাতে প্রাণে বজায় থাকেন, তা আমার কোর্ত্তেই হবে; কিন্তু দিদি! বুধাষ্টমীর সময় যেন তোমার দিদিকে মনে হয়।"

আরও কতক্ষণ সুখ দুঃখের কথা কহিয়া দুইজনে একত্রে বুধাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে যাইবারই যুক্তি স্থির করিল, এবং পরক্ষণেই পরস্পর স্নেহ-রসে বিগলিত হইয়া এক শয্যায় পাশাপাশি থাকিয়া গলা ধরাধরি করিয়া শয়ন করিল দুটী বোন্—**শ্যামা ও বামা!!**

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঘটনা-স্রোত !

পরদিন প্রত্যুষে বামা চলিয়া গেলে শ্যামা বড় বাড়ী গিয়া দেখিল যে, গৃহিণীর অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ হইয়া আসিতেছে; শ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে—জীবন-আশা আর কিছুই নাই! ডাক্তারবাবুও শ্বাস দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ হরপ্রসন্ন বিষম বিপন্ন হইয়া অনন্য মনে ব্রহ্মণ্যদেবকে বারম্বার ডাকিতেছেন, আর এক একবার বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতেছেন।

বৃদ্ধের ক্রন্দন-সময়ে গৃহিণী ঊর্দ্ধনেত্রে একবার তাঁহার দিকে চাহিলেন। তাহাতে তিনি রোগিণীর আরও নিকটে গিয়া বসিলেন; গৃহিণী অতি কষ্টে তাঁহার পদধূলি লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারায় দুই বিন্দু শেষ অশ্রু তাঁহার নয়ন-প্রান্তে দেখা দিল; পরক্ষণেই বারম্বার ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া জন্মের মতন দুই চক্ষু মুদিত করিয়া গৃহিণী ভবধামের খেলা শেষ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বড় বাড়ী অন্ধকারময় হইল! ধন্য প্রভাস! ধন্য তোমায়! তুমি পিতামাতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে বটে!

বৃদ্ধ অতি কষ্টে প্রতিবেশীগণের সাহায্যে গৃহিণীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শয্যা-শায়ী হইলেন; প্রভাসকে আর কোন সংবাদও দিলেন না।

* * * * *

বড় বাড়ী যে দিন এইরূপ হাহাকার, ছোট বাড়ী সে দিন মহা সমারোহ! বড় বাড়ী মৃত্যু-শয্যা আর ছোট বাড়ী ফুলশয্যা! সংসারের ত এই নিয়ম! কোথায়ও হাসি—কোথায়ও কান্না! কোথায়ও উৎসব—কোথায়ও নিরুৎসব! এই মজার জগতে কেহ হাসে—কেহ কাঁদে! ঘুঁটে যখন পুড়িতে থাকে, তখন গোবর হাসে; কিন্তু গোবরকেও যে আবার এই অবস্থায় পুড়িতে হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে না। তা যদি ভাবিত, তবে আর সংসার এমন শোকের আলয় হইত না। বড় বাড়ীর শোচনীয় পরিণাম কি আর ছোট বাড়ীর প্রভুগণ চিন্তা করেন? না তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন?

রমেশ সেই দিনই অনায়াসে মোহিনীকে বিবাহ করিয়া হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহের একটী আদর্শ দেখাইয়া সংসারকে সমধিক বিস্ময়াপন্ন করিলেন; সেই দিনই তিনি মোহিনীর সহিত তাহার পিসিকেও গৃহে আনিলেন।

গণেশপুরে রমেশেরই একাধিপত্য হইল; এখন কেবল তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাধেশের ধ্বংশ-চেষ্টাই প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল।

* * * * *

ওদিকে প্রভাসচন্দ্র কলিকাতায় গিয়া কাশীবাবুর বিলক্ষণ অনুগত হইয়া পড়িলেন; কাশীবাবু তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণাধিকা দুহিতা আশালতাকে তাঁহারই করে সমর্পণ করিলেন। প্রভাসের সেই অশৌচ অবস্থাতেই আশার সহিত বিবাহ হইল। বালকবালিকা মিলিত হইল—প্রভাস ও আশা সম্মিলিত হইল—তাহাদের ফুল ফুটিল! কাশীবাবু প্রভাসের মুখেই তাহার পিতা-মাতার সহরে বাস করিবার ইচ্ছা আছে শুনিয়াই এ কার্য্য করিলেন। যাহা হউক এখন হইতে কাশীবাবু প্রভাসের পাঠশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইতে লাগিলেন। বিবাহ-সময়ে কাশীবাবু প্রভাসকে তাঁহার পিতামাতাকে সংবাদ দিতে বলিয়াছিলেন; প্রভাস "দিয়াছি—তাঁহারা আসিতে পারিবেন না" বলিয়াই বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু ওদিকে যে প্রভাস মাতৃহীন হইয়াছেন—তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই। অশৌচ অবস্থাতেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল!

* * * * *

নারায়ণপুরে গঙ্গেশবাবু সতীলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া নিজ দোষ ঢাকিবার জন্য যে ভাবে জ্ঞানদার কলঙ্কের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠক বামা বৈষ্ণবীর কথাতেই বুঝিয়াছেন; এক্ষণে তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে এবারে কংগ্রেসের ডেলিগেট হইয়া গিয়া ফিরিবার সময় একটী শিক্ষিতা সুন্দরীকে সহর হইতে লইয়া আসিবেন। তাই তিনি সমবয়স্কগুলি লইয়া 'ঘরগড়া' একটী সভা করিয়া একজন সভাপতি খাড়া করিলেন এবং নিজে ডেলিগেট্ হইয়া তিনখানি কার্ডে সভাপতির সহি করাইয়া লইলেন। একখানি এবারকার কংগ্রেসের সভাপতিকে এবং একখানি কলিকাতা ষ্ট্যাণ্ডিং কংগ্রেস্-কমিটীতে পাঠাইলেন আর একখানি নিজে রাখিলেন। নিজের খানি দেখাইলে তবে কংগ্রেস্-সভায় প্রবেশাধিকার পাইবেন।

* * * * *

বলাই মামা বড় আশায় নিরাশ হইয়া—জ্ঞানদার মিথ্যা কলঙ্কের কথা শুনিয়া দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন এবং জ্ঞানদার অনুসন্ধানই তাঁহার শেষ বয়সের শেষ কার্য্য ভাবিয়া দেশে দেশে তাহারই সন্ধানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন

বামা গণেশপুর হইতে গিয়া যে কার্য্যে নিযুক্ত হইল, মামা পূর্ব্ব হইতেই তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাকেই বলি ভালবাসা! ইহাকেই বলে মায়ার টান্! যেমন মামা—তেমনই বামা।

* * * * *

বামা ও মামা পৃথক পৃথক পথে পথে, গ্রামে গ্রামে যাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সে কোথায়? সে সেই পদ্মার চড়ায় পাগ্‌লীর কুটীরে বসিয়া আছে, আর নিজের ভাগ্য-ফল না ভাবিয়া কেবল সেই অদ্ভুত লীলাময়ী পাগ্‌লীর আদ্যন্ত চিন্তা করিতেছে। এই ভয়ানক নির্জ্জনস্থানে কে যে এই রমণী, জ্ঞানদা তাহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কেমন করিয়া যে এই রমণী তাহার সমুদায় বিবরণ জানিতে পারিয়াছে, তাহাও কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইতেছে না। আবার সময়ে সময়ে ঠিক যেন পাগলের ন্যায় আচরণ করে; কিন্তু তাহাকে যত্ন করিতেও ত কণামাত্র ত্রুটী করে না। তবে এই রমণী কে? জ্ঞানদা বসিয়া বসিয়া কেবল তাহাই ভাবে!

এই রমণীর গুরুদেব একজন ব্রহ্মচারী! তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া রমণীকে কত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যান; জ্ঞানদাও সে সকল একমনে শ্রবণ করে। ব্রহ্মচারীও জ্ঞানদার বিবরণ সমস্তই জানেন এবং পাগ্‌লীর সহিত তাহাকেও কত জ্ঞানোপদেশ দেন। রমণীর গুরুদেবও তাহাকে 'পাগ্‌লী' বলিয়া ডাকেন। একদিন ব্রহ্মচারী আসিয়া রমণীকে বলিলেন "পাগ্‌লি! মা! তুমি এতদিন একাকিনী ছিলে, এখন তোমরা দুইজন হইয়াছ; এবার এই চৈত্রমাসে বুধাষ্টমীতে আমার গুরুদেব সেই মহর্ষি ব্রহ্মপুত্রে স্নানোপলক্ষে আগমন করিলে তাঁহাকে বলিয়া তোমাদের ধর্ম্মাচরণের জন্য অন্য শান্তিময় স্থান নির্দ্দিষ্ট করিব এবং তোমাদের স্বধর্ম্মশিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া লইব।" রমণী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রভুর পাদবন্দনাদি করিলে ব্রহ্মচারী সেদিন আবার অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

গুরুদেব চলিয়া গেলে রমণী আবার পাগলিনীর ন্যায় জ্ঞানদার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই আবার হাসিতে লাগিল। জ্ঞানদা অবাক্ হইয়া আবার অনিমিষ-নয়নে সেই দারুণ রহস্যময়ী পাগ্‌লীর মুখ-কমলের দিকে চাহিয়া রহিল! পাগ্‌লী কহিল "কি দেখ্‌ছিস্ বোন্?" জ্ঞানদা উত্তর করিল "তোমার ভাবভক্তি ও লীলাখেলা!" পাগ্‌লী পুনরায় কহিল "আর কিবা ভয়? বিধাতা হ'য়েছেন সদয়! এবার বুধাষ্টমীতেই ব্যবস্থা হবে।" তখন

দুই রমণী বা দুই ভগিনী কেবল চৈত্রের বুধাষ্টমীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিল।

* * * * *

কাশীবাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা প্রাণাধিকা পত্নী দয়াময়ীকে এবার নিজের নিকট লইয়া গিয়া সুখের দাম্পত্যপ্রেমে বিভোর হইয়া আছেন। আসাম প্রদেশে ডাম্‌ডিম্ চা-বাগিচায় ডাক্তারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অবধি যে তিনি কত কুলী কুলীনীর চিকিৎসা করিতেছেন আর তাহাদের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এতদিন একাকীই সে সকল দেখিতেন; এবার দয়াময়ীকে তথাকার নির্দ্দয়তা দেখাইয়া চমৎকৃত করিতেছেন। দয়াময়ীর সদয়-হৃদয় নির্দ্দয় চা-কর চয়ের আচরণ ও কুলী কুলীনীদিগের করুণ ক্রন্দনে নিতান্তই অধীর হইয়াছে; তিনি সর্ব্বদাই স্বামীকে সে কার্য্য ত্যাগ করিতে যুক্তি দিতেছেন; কিন্তু তাহাও যে মনে করিলেই ঘটে না এবং তিনিও যে কঠিন এগ্রিমেণ্ট-নিগড়ে বাঁধা, তাহা দয়াময়ী কিছুই জানেন না। সেই জন্যই সদত স্বামীকে সেই কথা বলেন।

আশার বিবাহ যে প্রভাসের সঙ্গেই হইয়াছে, তাহা তাঁহারা পত্রদ্বারা অবগত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা আর সে সময় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক যুবক যুবতী চা-বাগিচায় বসিয়া পবিত্র মিলন-সুখে একরূপে সময়াতিবাহিত করিতেছেন।

* * * * *

কালসাগরে বেগবান ঘটনা-স্রোত অনবরতই প্রবাহিত হইতেছে! আমাদের আখ্যায়িকার অন্তর্ব্বর্ত্তী ঘটনা সমুহের মধ্যেও কোথায় কি হইতেছে তাহা বিবৃত করা হইল; এক্ষণে দেখা যাউক কতদূর গড়ায় এবং কোথায় মিশিয়া যায় এই—**ঘটনা-স্রোত!**

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রতিহিংসার পরিশোধ!

কলির কাল-সাগরে ঘটনা-স্রোতে অনেক সময়ে অনেক ঢেউ উঠে; এক এক ঢেউতে এক এক অবতার অমনি নাচিতে আরম্ভ করেন। এবার বড়-দিনের কংগ্রেস ভারতে হইয়া পরে বিলাতে বসিবে বলিয়া একটী ঢেউ উঠিয়াছে; সেই ঢেউতে অনেক হিন্দুকুলগ্লানি মহাপুরুষ নাচিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহার সহিত প্রভাসচন্দ্রও নাচিয়াছেন। প্রভাসের প্রাণে বিলাত গমনের বলবতী বাসনা জন্মিয়াছে; প্রাণের রসবতী আশালতাকে পাইয়া এখন বলবতী আশালতাকে ফলবতী করিবার জন্যই প্রভাস পাগল! তাঁহার হৃদয়ের ধন রসবতী আশালতা—কাশীবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা! আর বড় সাধের বলবতী আশালতা—এক্ষণে বিলাতযাত্রা!

সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, হাটে মাঠে ঘাটে পথে সর্ব্বত্রই মহা হুজুগ বিলাত-যাত্রা! বিশুদ্ধ হিন্দুমতে বিলাত-যাত্রা! অথচ বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি এই হুজুগের মধ্যে একটীও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেবল মুখে হিন্দু অবতার—অন্তরে কিম্ভূতকিমাকার, এমন সকল হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা উপাধিশূন্য 'ফুটোমাদারী'—আছে অল্পমাত্র জমিদারী, ইঙ্গ-বঙ্গবিদ্যায় 'ডালখিচুরী', হিন্দু-কুলমুখোজ্জ্বলকারী মহাত্মাগণই "সি ভয়েজ্", "সি ভয়েজ্" অর্থাৎ 'সমুদ্রযাত্রা' 'সমুদ্রযাত্রা' করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। শাস্ত্রীয় ভ্রম প্রমাণাদি প্রয়োগে এবং বিবিধ ভুলযুক্তি প্রদর্শনে সমুদ্র-যাত্রা যে হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহাই তাঁহারা দেখাইতেছেন। এই সকল বিষয়ে প্রভাসও প্রধান উদ্‌যোগী!

প্রভাসের এত উদ্‌যোগ আয়োজন, এত আশা ভরসা অর্থাভাবে পাছে নিষ্ফল হয়, এই আশঙ্কায় আজ সন্ধ্যার সময়ে তিনি শ্বশুরের নিকট অনুগ্রহ-প্রার্থী হইবার জন্য শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। মনে বড় আশা যে আশার পিতা জামাতার এই মহতী আশাকে অবশ্যই ফলবতী করিবেন; অর্থের অভাব কিছুতেই হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইতে চলিল; কাশীবাবু অদ্য রবিবারে বৈকালে প্রাণাধিক পুত্র চারু ও নববিবাহিতা প্রাণাধিকা কন্যা আশালতাকে লইয়া ষ্টারথিয়েটার

দেখিতে গিয়াছেন; এখনও আসেন নাই। প্রভাস বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া বাটীর দরজায় লাগিল। তাহা হইতে নামিয়া কাশীবাবু চারু ও আশাকে লইয়া বাটীর ভিতর আসিলেন। উপরে উঠিয়া প্রথমেই প্রভাসকে দেখিয়া কহিলেন "কতক্ষণ এসেছ প্রভাস?" বাবাজী অমনি উত্তর করিলেন "অনেকক্ষণ এসেছি।" আশা প্রভাসকে দেখিয়াই ঘোম্‌টা দিয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে প্রস্থান করিল; চারু নিকটে বসিয়া থিয়েটারের গল্প করিতে লাগিল।

কাশীবাবু হাত পা ধুইয়া প্রভাসের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং কহিলেন "আজ থিয়েটারে 'কালাপানি' ফার্স দেখে বড়ই আমোদ পেয়েছি! যত সব কুলাঙ্গার হিন্দুমতে বিলাত-যাত্রা কোরে কালাপানির ঢেউ খেয়েই 'ওয়াক্ ওয়াক্' শব্দে বমি কোর্ত্তে লাগ্‌লো; তাদের কেউ নিয়েছে কোশাকুশি—কেউ নিয়েছে শালগ্রাম তুলসী! কেউ প'রেছে নামাবলীর কোট প্যাণ্টুলান—কেউ প'রেছে তসরের চোগা চাপকান্! জাহাজে চ'ড়ে সেই সব জাম্বুবান ও হনুমান অপরূপ রূপবান ও শ্রীমান্ হ'য়ে শ্রীধাম লণ্ডনধাম যাত্রা কোরেছেন। জাহাজে ব'সে কেউ করে চণ্ডীপাঠ—কারুর কথা 'চোটপাঠ্'—যেন অপরূপ ঠাট! এই রূপে চ'লেছেন শ্রীপাঠ! যেমন বিলাত যাওয়ার হুজুগ উঠেছে, তেম্‌নি উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়েছে! একেই বলে 'যেমন কুকুর, তার তেমনি মুগুর'! বেশ ওষুধ হ'য়েছে"।

জামাইবাবু শুনিয়াই ত অবাক্! যাহার জন্য তিনি বড় আশা করিয়া আশার পিতার নিকট আসিয়াছেন, তাহারই উপর তাঁহার অভক্তি ও অশ্রদ্ধা! যাহা হউক প্রভাস উনবিংশশতাব্দীর সভ্য ছোক্‌রা; কোন কথার প্রতি-উত্তর দিতে তাঁহাদের শঙ্কা কিছুই নাই! তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে উন্মুক্ত-হৃদয়ে কহিলেন "ও সকল কেবল বৃথা আমোদ মাত্র! হিন্দুসমাজের উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্র ও ষ্টার থিয়েটার এই দুইটাই ত দেশের মাথা খাইতে বসিয়াছে; নতুবা এতদিন সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিতে ভারতবর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইত! বাছাধন 'বঙ্গবাসী' কন্‌সেণ্টবিল অর্থাৎ সহবাস সম্মতি আইনের সময় বেশ সুখ পাইয়াছিলেন; ঐরূপ শ্রীঘরের পথে যাইতে না বসিলেও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। কই! 'বঙ্গবাসী' এত করিয়াও ত আইন নিবারণ করিতে পারে নাই—আমাদের অনুমোদিত সাধের আইনে আঘাত করিতে ত পারে নাই! নিজেই শ্রীঘরে যাইতেছিল;

ষ্টার থিয়েটার যে এত কাণ্ড করিতেছে, তাহাতে কেমন করিয়া বিলাত-যাত্রা রহিত করে দেখা যাউক ?”

কাশী। কেন হে বাপু তোমার এত রাগ কেন? তুমি কি বিলাত যাবে নাকি ?

প্রভাস। আজ্ঞে, যাইতে ত সম্পূর্ণই ইচ্ছা! এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ! সেই জন্যই ত আপনার নিকট আসিয়াছি।

কাশী। আমার নিকট তোমার এইজন্য আসার আবশ্যক কি ?

প্রভাস। এই সদ্বিষয়ে ঋণস্বরূপ কিছু অর্থসাহায্য!

কাশী। আমি এত অর্থ কোথা পা'ব ?

প্রভাস। কেন, আপনি ত অনেককে টাকা ধার দিয়া সুদ খাটাইতেছেন।

কাশীবাবু বড় ক্রুদ্ধস্বভাবের লোক। অল্পেতেই রাগিয়া উঠেন; রাগিলে পাত্রাপাত্র বা দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। কাশীবাবু এই কথায় অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন “আমি সুদ খাটাই, তাতে তোমার কি ? তুমি যে এমন বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ, তা যদি জান্‌তাম, তবে আর আমি তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতাম না। এখন মনে হ'চ্ছে যে আশাকে কেন ছেলেবেলায় নুন খাইয়ে মেরে ফেলি নাই। ধিক্ আমাকে!”

প্রভাসও কলিকালের ছেলে; এত সহ্য করিবেন কেন—অমনি বলিয়া উঠিলেন “কি! এত অহঙ্কার! আমিও যদি জানিতাম যে তুমি একজন নির্ব্বোধ কুসংস্কারান্ধ গোঁড়া হিন্দু, তবে কখনই এমন কাজ করিতাম না; আর তোমার কন্যা বাল্যবয়সে বেশী ভালবাসিত বলিয়াই আমার একান্ত বাসনা হইয়াছিল, এখন দেখিতেছি কার্য্য ভাল হয় নাই।”

কাশী। দূর হ! নির্লজ্জ, বেহায়া! তোর যতবড় মুখ ততবড় কথা ?

প্রভাস। আমরা উচিতবক্তা! উচিত কথা সকলকেই বলি!

কাশী। দূর হ! পাজি! আমার সম্মুখ হ'তে এখনই যা; নইলে শিবশরণ তোকে গলাধাক্কা দিতে দিতে বা'র কোরে দেবে। আর তোর মুখদর্শন কোরবো না। আমার মেয়ের কপালে যা থাকে, তাই হবে।

কর্ত্তা ভয়ানক রাগিয়াছেন দেখিয়া এবং জামাতা বাবাজিকে যথেচ্ছা বলিতেছেন শুনিয়া গৃহিণী জামাইয়ের সম্মুখে লজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তাকে বলিতে লাগিলেন “তুমি কি ক্ষেপেছো না কি? কা'কে কি বোল্‌ছো ?

প্রভাস যে তোমার জামাই!” কর্ত্তা কহিলেন “জামাই নহে গৃহিণী—ও আমাদের পরম শত্রু! অই বিধর্ম্মী বিলাত গিয়া বিবি বিবাহ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে।” গৃহিণী কহিলেন “তা আমি বিয়ের আগেই ব’লেছিলাম যে, প্রভাসের সব ভাল—কিন্তু যেন কেমন খিরীষ্টানী মত! তখন ত আর আমার কথা শুন্‌লে না—এখন তার ফলভোগ কোরতেই হবে। তা আর রাগই বা কি—দুঃখই বা কি? এখন বরং ওকে ভাল কোরে বুঝিয়ে ক্ষান্ত কর। রেগে উঠে কেবল আপনার পায়েই আপনি কুড়ুল মাচ্চো।”

কর্ত্তা “যা ইচ্ছে হয় কর” বলিয়া তথা হইতে উঠিয়া অন্য ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। গৃহিণী প্রভাসকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। প্রভাসের আর তিলমাত্রও তথায় থাকিতে ইচ্ছা ছিল না। কেবল একবার আশার সহিত দেখা করিবার জন্যই গৃহিণীর কথায় প্রভাস সে রাত্রে সে বাড়ী থাকিলেন। গৃহিণীর অনেক অনুরোধে কেবলমাত্র একবার আহারে বসিয়াই উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট শয়ন-ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথা যেন ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হইল। ক্ষণপরেই ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল সেই দ্বাদশবর্ষীয়া সুকুমারী বালিকা—আশালতা!

আশা গৃহমধ্যে গিয়া প্রভাসের পদ-প্রান্তে বসিয়া কেবল কাঁদিতেই লাগিল। প্রভাস কহিলেন “কাঁদ্‌চো কেন আশা?” আশার উত্তর নাই। প্রভাস পুনরপি কহিলেন “আমি আর তোমাদের এ বাড়ী আস্‌বো না আশা! এখন তুমি আমার সঙ্গে যা’বে কি আশা?” সেই ক্ষুদ্রমতি বালিকা এ কথার আর কি উত্তর দিবে? অনেক ভাবিয়া কহিল “যা’ব না ত আর যা’ব কোথায়? বড় দিদির মুখে শুনেছি যে মেয়েমানুষের স্বামীই সর্ব্বস্ব—পতিই গতি! তোমার পায়ে ধরি, মিনতি করি, তুমি বিলাত গমনের বাসনা পরিত্যাগ কর। নতুবা অভাগিনীর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।” এই বলিয়া আশা কাঁদিতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেলে অতি প্রত্যুষেই প্রভাস বাসায় আসিলেন। অদ্য আহারান্তে আর কলেজ না গিয়া শ্বশুরের রচনাবলীর বিষয় বিরলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; এমন সময়ে এক পুলিস ইন্‌স্পেক্টর দুইজন কনষ্টেবলের সহিত আসিয়া প্রভাসকে গ্রেপ্তার করিল এবং কহিল “তুমি সহবাস-সম্মতির আইনানুসারের ঘোরতর অপরাধে অপরাধী! তোমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। তুমি বার বৎসরের বালিকার প্রতি পাশবিক

অত্যাচার করিয়াছ; তোমাকে এখনই আদালতে যাইতে হইবে। কথা শুনিয়া প্রভাসের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। স্বকৃত দোষ এবং শ্বশুরের প্রতিহিংসার কথা যুগপৎ তাঁহার মনে বারেকের জন্য উদয় হইল; আবার এই আইন প্রচলনের সময় দেশে যখন মহা হৈ চৈ বাধিয়াছিল, তখন কেবল তাঁহারাই ইহার অনুকূলে মত দিয়াছিলেন; তাই বারেকের জন্য তাঁহার একটী প্রসাদী সঙ্গীতের প্রথম কথা মনে পড়িল—"কারও দোষ নয় গো মা, স্বখাদসলিলে ডুবে মরি শ্যামা"!

তারপর তিন মাস ধরিয়া এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল; আদালতের সে কেলেঙ্কারীর কথা—প্রভাসের সেই দারুণ অপমানের কথা আর লিখিয়া কি হইবে? বহুকষ্টে বহুযত্নে আশার এজাহারে প্রভাস এ যাত্রা একরূপ বাঁচিয়া গেলেন; সেই পতিপ্রাণা বালিকা পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিয়াও পূর্ব্ব প্রণয়ানুরাগে পতিকে বাঁচাইয়াছিল; কিন্তু কাশীবাবুর উপর তাঁহার এমন জাতক্রোধ জন্মিল যে তাঁহাকে সবংশে ধ্বংস করাই প্রভাসের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার সহায়ও সহসা শীঘ্র যুটিয়া গেল; রমেশের ভৃত্য সেই দুর্দ্দান্ত গোলাম সর্দ্দার প্রভাসের বাসায় আসিয়াছে।

গোলামকে দেখিয়া প্রথমেই প্রভাসের প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল; তিনি সভয়ে কহিলেন "কি গোলাম! আবার কি রমেশ দাদা আমাকে মারিবার জন্য তোমায় পাঠাইয়াছেন?" গোলাম কহিল "এবার তা নয়; এবার তোমার রমেশ দাদা আমায় অকর্ম্মণ্য বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বালক রাধেশকে এখনও মেরে ফেল্‌তে পারি নাই, তাই নতুন গিন্নি মনমোহিনীর পরামর্শে আমার এখন জবাব হ'য়েছে। এখন চাকরীর চেষ্টায় কোল্‌কাতায় এসে আপনার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে এসেছি—যদি আপনার সন্ধানে কোথায়ও চাকরী খালি থাকে ত, আমায় যোগাড় কোরে দিতে হবে।" প্রভাস কহি-লেন "তার জন্য আর চিন্তা কি? যদি আমার একটী কাজ উদ্ধার কোরতে পার, তবে চাকরী ত হবেই—তাহা ছাড়া কিছু পুরস্কারও পাইবে।" গোলাম কহিল "কি কাজ?" তখন প্রভাস তাহার কাণে কাণে কত কি কথা কহিল। গোলাম বলিল "তার জন্য আর চিন্তা কি? আমি শিগ্‌গিরই সব শেষ কোরে ফেল্‌বো"।

এ দিকে কাশীবাবু ক্রমশঃই কনিষ্ঠা কন্যার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া তাহাকে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসামে জ্যেষ্ঠা কন্যা দয়াময়ীর নিকট

রাখিতে আসিয়াছেন। সেই পর্য্যন্ত কলিকাতায় আশার কত চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। লজ্জা, অপমান ও মনকষ্টই তাহাকে আরোগ্য হইতে দিল না; এই অবস্থা দেখিয়াই কাশীবাবু জ্যেষ্ঠ জামাতাকে সকল কথা বলিয়া তাঁহার নিকট আশাকে রাখিলেন। এই জামাতার নাম হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি একজন পাশকরা ডাক্তর! ডাম্‌ডিম্‌ চা-বাগানে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন; ইঁহার নিকট আশার চিকিৎসাও চলিবে—জলবায়ু পরিবর্ত্তনও হইবে, এই ভাবিয়াই কাশীবাবু কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং এখানে রাখিতে আসিয়াছেন; কিন্তু কুলীদিগের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি আর বেশীদিন সেখানে থাকিতে পারিলেন না। ত্বরায় কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

যে দিন কাশীবাবু বাটী চলিয়া আসেন, সেইদিনই প্রভাস এই সন্ধান পাইয়া গোলামকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার সময়ে শ্বশুর বাড়ী আসিলেন; দরওয়ানজী তখন রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহার চক্ষে ধূলা দিয়া তাঁহারা বাটীর ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক একটী নির্জ্জন স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। পরে রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে, প্রভাস গোলামকে লইয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিলেন। চৈত্র মাসের শেষ ভাগ—গরম পড়িয়াছে বলিয়া দ্বার জানালাদি সমস্তই খোলা ছিল! দুইজনে কাশীবাবুর শয়ন ঘর লক্ষ্য করিয়া তন্মধ্যে গিয়া দেখিল কাশীবাবু নিদ্রিত এবং পার্শ্বে তাঁহার সেই দশমবর্ষীয় পুত্র চারু শুইয়া আছে। প্রভাস উপরে উঠিবার সময় তাঁহার ভাল কাপড় ও জামা জুতা ইত্যাদি তাঁহাদের সেই লুক্কায়িত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া একখানি ক্ষুদ্র ধুতি পরিয়া মালকোঁচা আঁটিয়াছিলেন এবং হস্তে একখান তীক্ষ্ণধার ছোরা লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই ছোরা খানি শ্বশুরের বক্ষে বসাইয়া প্রভাস স্বয়ং তাঁহার প্রতিহিংসার পরিশোধ লইলেন ও বৈরনির্য্যাতন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন; নিদ্রিত কাশীবাবু তাহাতেই চিরনিদ্রিত হইলেন;—কম্বুলেটোলার কাশী তাহাতেই কাশীপ্রাপ্ত হইলেন।

গোলামও বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এক হস্তে লাঠি ও এক হস্তে ছোরা লইয়া আসিয়াছিল; সে সেই নিদ্রিত বালক চারুকে ছোরার আঘাতে কাটিয়া ফেলিল। আহা! নীরব নিশীথে সেই সুষুপ্ত সুকুমার শিশু শুধু একবার অস্ফুট 'মা' বাক্য উচ্চারণ করিয়াই প্রাণত্যাগ করিল।

গৃহিণী দালানে শুইয়াছিলেন, তিনি এই কাণ্ডের সময় ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; গোলাম অমনি একলাঠি সজোরে তাঁহার মাথায় মারিল; গৃহিণীর প্রাণবায়ু তাহাতেই বহির্গত হইল। তাহার পর দাসী পাচিকার মধ্যেও যে জাগিয়াছিল, সেই গোলামের লাঠিতে পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। গোলাম সর্দ্দার অনেক তন্ত্রমন্ত্র, দ্রব্যগুণ ও কৌশল জানিত বলিয়া নিঃশব্দে এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল।

আবার তাহারা সেই লুক্কায়িত স্থানে আসিয়া সে বেশ ছাড়িল এবং এক স্থান হইতে জল সংগ্রহ করিয়া কোন গৃহমধ্যে সংগৃহীত আলোক সহায়ে অঙ্গের রক্তাক্ত স্থান সকল ধুইয়া ফেলিল। পরে নিজ নিজ বেশ পরিধান-পূর্ব্বক ছোরা দুখানি ফেলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। গোলাম দরজা খুলিয়া প্রভাসকে বাহির করিয়া দিয়া নিজে যেমন বাহির হইতে যাইবে, অমনি শিবশরণ শব্দ শুনিয়া সাড়া দিয়া চকিতের ন্যায় তথায় উঠিয়া আসিল। গোলাম পশ্চাৎ ফিরিয়া সজোরে এক লাঠির আঘাতেই দরওয়ানজীকে ধরাশায়ী করিল; দ্বিতীয় লাঠিতে তাহাকে শমন-সদন সন্দর্শন করাইয়া সেও বাটীর বাহির হইল। ইহাই প্রভাসের মনে ছিল এবং ইহাই প্রভাসের—**প্রতিহিংসার পরিশোধ!!**

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যোগিনী-যুগল!

বহুদিন হইল হিন্দুর সৌভাগ্য-শশী কাল-রাহু কর-কবলিত হইয়াছে; বহুদিন হইল হিন্দুর গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে; বহুদিন হইল হিন্দুর স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; বহুদিন হইল অন্যান্য জাতির প্রসূতি-স্বরূপ হিন্দুর বিদ্যালোক, রাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবরূপ দুইখানি গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন হইয়া চিরন্তনের জন্য অদৃশ্য হইয়াছে; বহুদিন হইল হিন্দুর সর্ব্বস্ব একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিধাতা হিন্দুর সুখসমৃদ্ধি এবং ধর্ম্ম-বন্ধন চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য তাহার উপাদান সমষ্টি এত অমিত হস্তে দিয়াছেন যে তাহা শীঘ্র ফুরাইবার নহে। এত রাজবিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতে—এত ধর্ম্মবিপ্লবের তুমুল তুফানে পতিত হইয়াও হিন্দু নির্জীব অবস্থাতেও সজীব; এত তরঙ্গে

তরঙ্গে তরঙ্গায়িত ও এত প্লাবনে প্লাবনে প্লাবিত হইয়াও হিন্দু 'মরা হাতী লাখ টাকা'!

কত কত বিপ্লবময় ঝটিকায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া এবং কত কত বৈষম্য-সমাকীর্ণ তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া হিন্দু জরাজীর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু আজিও সেই রক্তমাংসহীন পঞ্জরাস্থিময় দেহের ভিতর যে সজীব মহাপ্রাণ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাহাও নিতান্ত নিস্তেজ নহে। প্রাচীন হিন্দুর একটীমাত্রও পবিত্র পরমাণু যতদিন থাকিবে, ততদিন হিন্দু শত সহস্রবার দলিত বিদলিত হইলেও পূর্ব্বের সেই তেজ ও সেই বল কখনই হারাইবে না। এখনও হিন্দুর দেহ দুর্ব্বল হইলেও হৃদয় বলবান্—শরীর নিস্তেজ হইলে প্রাণ তেজস্বী! সেই তেজে তেজীয়ান্ ও সেই বলে বলীয়ান্ বলিয়াই দাসত্ব পরিতপ্ত চিরাভিশপ্ত হিন্দু এত অহিন্দুর মধ্যে পড়িয়া এবং বিধর্ম্মীভাবাপন্ন হইয়া অনেকেই আজিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।

এই দেখ, এবার চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী—মা জগজ্জননী দশ ভুজার বাসন্তী মহাষ্টমী—অন্নহীন কাঙ্গালের মা অন্নপূর্ণার সাধের অষ্টমী বুধবারে পড়িয়াছে বলিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু-নর-নারী ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানোদ্দেশে চলিয়াছে; নিদারুণ শোকে মুহ্যমান্ হিন্দু-নর-নারী ইহ জন্ম বা পর জন্মের জন্য জন্মের শোধ শোক দূর করিতে অশোকাষ্টমী পূর্ণ বুধবারে ব্রহ্মপুত্রে ডুব দিতে যাইতেছে। গোয়ালন্দের উত্তরে যে স্থানে যমুনানামধারী ব্রহ্মপুত্র ও হুরাসাগর নদী পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই তিন নদীর সঙ্গম-স্থানটী সৌন্দর্য্য ও সুষমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! ইহার নাম 'বাইশ কোদালে'! এই বাইশ কোদালের মোহানার ধারে বহু দূরদেশ হইতে সমাগত বহু ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছে। এখনও বুধাষ্টমীর তিন দিন সময় আছে; ইহারই মধ্যে অনেকে দলে দলে আসিয়া এই স্থানেই আশ্রয় লইতেছে; এই মোহানার ধারে অনেকগুলি দোকান ও সরাই স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল দোকান ও সরাইতে বাসা লইয়া এক এক দল লোক বাস করিতেছে। দেখ হিন্দু—দেখ বিধর্ম্মী ও বিজাতীভাবাপন্ন হিন্দু! তুমিই দেখ, ধর্ম্মের জন্য হিন্দু আজও কত কষ্ট সহ্য করিতেছে; পদে পদে দেখিতেছ, তবুও ত চৈতন্য হয় না!

আজ শনিবার সন্ধ্যার সময় চৈত্রের শুক্ল-চতুর্থী তিথিতে একটী সরাইয়ের সম্মুখে ত্রিধারার তীরে তানপুরা হস্তে বসিয়া একজন প্রাচীন পুরুষ! তাঁহার পার্শ্বে দুইটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ও একটী যুবতী বসিয়া আছে; তাঁহারা চারিজনেই

যেন একটী দল! বৃদ্ধ তানপুরায় তান দিতে দিতে সুতানে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন পুরুষটী প্রকৃতির এই রম্যতম ঋতুর রম্যতম সময়ে রম্যতম স্থানে সুরম্য সঙ্গীত-সুধায় সুদূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্তও সকলকে মাতা-ইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মৃদুমন্দ মলয়ানিল মধ্যে গগনপ্রান্তস্থ চতুর্থীর চন্দ্রের দিকে চাহিয়া গাহিতেছেন—

বিজাতী বারিদে ঢাকা ভারত আকাশে,
হেসো না হিমাংশু আর হেসো না উল্লাসে।
যে হাসি হাসিতে শশী ভারত অম্বরে বসি
জানকী বদন হেরি মানস-বিলাসে;
যে হাসি সাবিত্রী হেরে ডুবিত আনন্দ-নীরে
মোহিত দ্রৌপদী প্রাণ তোমার যে হাসে;
যে হাসি হেরিয়ে চক্ষে কালশশী ধ'রে বক্ষে
হাসিত কুঞ্জেতে রাধা হৃদয়-বিকাশে!
যে হাসি হেরিয়ে শশী দূরে যেত দুঃখমসী
নাচিত ভারত-বন প্রমোদ প্রকাশে;
সে হাসি বিহীন মুখে কি হেতু হাসিছ সুখে
ভাসিছ আকাশতলে কি সুখ আশ্বাসে!
হেস না হেস না আর সহে না নয়নে আর
ডুবে যাও শশধর মনেরি হুতাশে!
কলঙ্কী তোমারে কহে মিথ্যা ত কখনো নহে
নতুবা কেমনে পুনঃ হাসিছ আকাশে?
মরুময় এ আবাসে কাজ কি তোমার হাসে?
নিবে যাও চন্দ্রকলা জীবন-উদাসে!

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে তাঁহার পার্শ্বস্থা তিনটী রমণীর মধ্যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দুইটীর যে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা, সে কহিল "ঠাকুরদাদা! এই বুড়া বয়সেও তোমার এত গলার জোর!" বৃদ্ধ কহিলেন "না হবে কেন দিদি! অই টুকুই আমার পুঁজি পাটা! আজন্ম 'আইবুড়া' থাকিয়াই বুড়া দিন কাটাইল; সংসারের স্নেহমমতা কখন পাই নাই—কাহাকে করিতেও হয়

নাই; শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া ভগ্নীপতি ভাগীনেয়র ভাতেই ভারতে মানুষ হইয়া ভারতের সর্ব্বত্রই সঙ্গীতালাপ করিয়া ভ্রমণ করিতাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি এই সঙ্গীত শিখিয়াছিলাম; তাহার পর আজ বেয়াল্লিস বৎসর এইরূপ যেখানে সেখানে গান গাহিয়া বেড়াইতেছি। মধ্যে কেবল ৭।৮ বৎসর গণেশপুর ছাড়িয়া কোথায়ও যাই নাই; সে কেবল আমার খুকিদিদির জন্য। খুকিদিদির জন্ম হইতে তাহার উপর এই মায়া-মমতাহীন বুড়ার অপরিমিত মায়া জন্মিল; বুড়ার বিশুষ্ক হৃদয়-মরুভূমি হইতে যেন কোথা হইতে মায়ার উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল। তখন মনে হইল ভগবান মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি প্রবৃত্তি লুকাইয়া রাখেন; কোন কারণ বা পাত্র উপস্থিত না হইলে আর তাহার বিকাশ হয় না। তখন মনে হইল যদি আমার স্ত্রী পুত্র থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় আমি সংসারের শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসানুদাস হইয়া থাকিতাম। যাহা হউক ভাগীনেয়র উপর রাগ করিয়া এই মায়াবন্ধনও কাটাইয়াছিলাম; কিন্তু আবার একি শাস্তি? কেন কাশী ছাড়িয়া আসিলাম—কেনই বা আসিয়া জ্ঞানদার দেখা না পাইলাম? এখন যে প্রাণ যায়! পরের মেয়ের মায়ায় আমার এইরূপ দায়? হায়! হায়! কেন মানুষ বদ্ধ থাকে মিথ্যা মায়ায়?” স্ত্রীলোকটী কহিল—“আমারও যে প্রাণ যায়! তুমি কাশী গেলে আমিও যে প'ড়েছি সেই মায়ায়! কায়ার সঙ্গে যেমন ছায়া—তেমনই ছিল আমাদের মায়া!—তুমি গেলে আমরা দুজনে যে তেমনই ভাবে ছিলাম! এখন ত সেই সন্ধানেই ব্রহ্মপুত্রে আসা! আসার আশা কি সফল হবে?” পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে বৃদ্ধটী সেই বলাই মামা আর প্রৌঢ়া নারীদ্বয় সেই শ্যামা ও বামা! কিন্তু যুবতীটী যে কে, তাহা পরে জানিতে পারিবেন, বলাই মামা জ্ঞানদাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ব্রহ্মপুত্র স্নানোপলক্ষে আসিতেছিলেন; পরে পথিমধ্যে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

বুড়া বলাই 'বামাকে বলিলেন “আমার গলার জোর ত বুঝ্‌তে পাল্লে, এখন দিদি তোমার স্ত্রীকণ্ঠের মধুর স্বর একবার শুনাও; আর কি করি এই রূপেই দিন্‌টা কেটে যাক্!” বামা তখন মনের উচ্ছ্বাসে মধুরকণ্ঠে মধু বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল—

অসার আশার ক্ষুধা মেটে না কখন,
আশায় গঠিত প্রাণ করে জ্বালাতন।

জনম অবধি আশার ছলন,
আশা না ফুরায় না হ'লে মরণ!
তবু ত বোঝে না হায় এ অবোধ মন।
মরুময় এই আশার সংসার,
আশা-মরীচিকা আছে অনিবার,
দিবানিশি দহে তাহে নর নারীগণ।
বিপদ-জলদে আশার বিজলী,
মানুষের মন ছলনায় ছলি,
হাসায় কাঁদায় কত ধাঁধায় নয়ন।
ভিখারীর মনে ভূপতির আশা
কপালের দোষে পাথারেতে ভাসা
আশা শুধু—আশাময়, না হয় পূরণ।
থাকিব না আর আশাময় ভবে,
সুখী রে হেথায় কে কোথায় কবে,
যাব তথা, আশা যথা না ছলে এমন।

বামার মধুময় কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে স্থানটীতে অনেক লোকের জনতা হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই অদূরে অন্য এক সরাইয়ের নিকট একটী বট-বৃক্ষমূলে আর একজন স্ত্রীলোকের কোমল কণ্ঠস্বর উত্থিত হওয়ায় লোক সকল সেই দিকে ছুটিল। এই কণ্ঠস্বর যেন বামার কণ্ঠস্বর অপেক্ষাও সুমিষ্ট ও সু-উচ্চ! মামা ও বামা সেখানে বসিয়াই সে গান শুনিতে লাগিলেন—

আর ত যাবনা ফিরে, যেতে নাহি আশা,
উড়েছে প্রাণের পাখী ছেড়েছে রে বাসা!
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর ছিঁড়েছে স্নেহের ডোর
গিয়েছে আশার আশা—সু-আশা কু-আশা,
ঘুচেছে জনম তরে মোহের কুয়াষা!
ছুটেছে সকল নেশা সংসারে যায় না মেশা,
ভুলে গেছে ভোলা মন ভোগীজন ভাষা,
না ডুবি মায়ার কূপে থাকি ভাসা ভাসা!

স্বার্থময় লোকালয় বোধ হয় বিষময়
নিশি দিন নিরালয় তাই ভালবাসা
ল'য়েছি সকল ত্যজি এই ভালবাসা!
আগেকার যত সাধ সে সবে সেধেছি বাদ
ত্যজেছি মনের মম যত ছিল আশা,
বুঝেছি রে মানুষের কেন ভবে আসা!
ভস্ম মাখি মুখে বুকে যোগিনী সাজিয়ে সুখে
মিটাব মনের সাধ প্রাণের পিপাসা,
বনফলে ক্ষুধা যা'বে নদীতে পিপাসা।

গান শুনিয়া বামা বলিল "দেখ দাদা! এই গলার স্বর ঠিক যেন আমার গঙ্গাজলের; ইদানী তার গলাত আর তুমি শোননি?" বলাই কহিলেন "তা কি আর হবে? আবার অই শুন, স্ত্রীকণ্ঠে পাগলের ন্যায় কে গান গাচ্চে"—

ধূয়া

দ্যাখ্ দেখি মন, গুণে এখন, কত ধানে কত চাল্,
ঘুঘু দেখেছো শুধু ফাঁদ দেখনি (চাঁদ) এতকাল!
আয়না খুলে দ্যাখ্ না মুখ,
কেমন রে তোর পোড়ার মুখ!
সংসেজে তোর গিয়েছে দুখ,
রং কোরে তোর বেড়েছে সুখ,
ধুক্ ধুক্ ধুক্ কোচ্চে বুক
কা'র পুকুরে দিন দুপুরে ফেলেছিলি জাল!

(আস্থায়ী)

জালে পড়ি ঘুসো চিংড়ি, ভার হ'ল রে কেঁদে বাঁচা,
বাড়ীতে তার পড়ে আবার পুঁইশাকেরই মাচা!
দিয়ে তাতে ফুল বড়ি,
হ'বে ভাল চচ্চড়ী,

ভাবি তাই নড়ি চড়ি
কা'র জালে তুই পড়ি
খাবি খা'বি ধড়ফড়ি
হেসে হনু গড়াগড়ি ;
খিল্ ধোল্লো ফেটে গেল যেন বুকের খাঁচা !
(হাসি) হা—হা—হা—হা—হা—হা !

(অন্তরা)

হাস্‌তে হাস্‌তে কপাল ব্যথা,
পেয়েছি প্রাণে দারুণ ব্যথা !
কা'রে বোল্‌বো মনের কথা ?
কেঁদে কেঁদে বেড়াই রে যথা,
ফিরেও ত কেউ কয় না কথা,
দেখে শুনে কপালগুণে মানুষের মরা বাঁচা !
যে দিকেতে ফিরাইয়ে আঁখি,
কান্নাময় সকলই দেখি,
কতজন ত দিল রে ফাঁকি !
কাঁদে শুধু যারা থাকে বাঁকী,
সংসারে সকলই ত ফাঁকি
উড়ে যায় ত্বরা প্রাণ-পাখী !
শেষের সম্বল হয় রে কেবল কলসী আর কাচা !
(কান্না) মা গো—বাবা গো—ভাই রে—গেলি রে কোথা
এ হুম্—এ হুম্—এ হুম্—আহা—আহা—আহা !
ছিঁচ্ কাঁদুনে তোর নাকে ঘা,
রাজার মা বিয়ুলো কাকের ছাঁ,
কুহু ছেড়ে করে পিক কা—কা—কা !
লোক থাক্‌তে বাড়ী করে খাঁ—খাঁ—খাঁ !
এক রত্তি সত্যি নাই ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা ;

ঝুটা পোরা শুধু ধরা কিছু না—না—না ;
কে জানে কলিতে, কে আছে ছলিতে একমাত্র সাঁচ্চা !
(ধূয়ার সহিত মিল)
হরি, বল্ মন বদন ভোরে,
আর থাকিস্ না ঘুমের ঘোরে,
ল'য়ে যাবে প্রাণ শমন চোরে ;
কে আর তখন রাখ্‌বে ধোরে ?
পারবি না যমরাজার জোরে
তাই বলি ওরে হরিনাম কোরে কাটাস্ চিরকাল !

বামা বলিল "দাদা ! এ কি রকম গান ?" বলাই কহিলেন "বোধ হয় কোন পাগ্‌লী এইরূপ একবার হেসে একবার কেঁদে গান গাচ্চে ; যাই হোক্ পাগ্‌লীর গানেও সার আছে, চল দেখি, দেখে আসি—ব্যাপার কি ?" তখন তাঁহারা চারি জনেই সেই দিকে চলিলেন। সে স্থানটীতে বহু লোকের জনতা হইয়াছিল ; জনতার অন্তরাল হইতে যাহা দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহারা যেন ধরাতলে দাঁড়াইয়া করতলে স্বর্গ পাইলেন। মামা ও বামা এত দিন ধরিয়া যে চারু-চিত্র বুকে করিয়া তাহারই উদ্দেশে দেশে দেশে বেড়াইতে ছিলেন, সেই বিচিত্র চিত্র—সেই অপরূপ আলেখ্য—সেই অনিন্দ কান্তি যে জীবন্ত দেহে বটবৃক্ষ মূলে দণ্ডায়মানা ! যে মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব প্রতিদিন তাঁহাদের হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তাহার যে আজ সশরীরে সাক্ষাৎ পাইলেন। এখনও তাঁহাদের মনে বিশ্বাস হইতেছে না যে ইহা স্বপ্ন কি সত্য ?

তাঁহারা দেখিলেন, জ্ঞানদা গৈরিক বসন পরিধান করিয়া এলো কেশে দাঁড়াইয়া আছে, আর সেই পাগ্‌লী যোগিনী তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাচাইয়া পাগলের ন্যায় নানারূপ ভাবভঙ্গী করিয়া সেই গানটী পুনরায় গাহিতেছে। গৈরিক বসন পরিধান করায় জ্ঞানদার সেই ভুবন ভুলান রূপের জ্যোতিঃ যেন আরও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। একে ত জ্ঞানদার ন্যায় লাবণ্যময়ী ললনা মর্ত্ত্যভূমে দুর্ল্লভ, তাহার উপর আবার সন্ন্যাসিনী সাজিয়া যেন সুরবালাকেও সে পরাভব করিয়াছে ; আহা ! সর্ব্ব শরীরের মধ্যে কোথাও যে একটী অসম্পূর্ণতা অর্থাৎ খুঁৎ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অতুলনীয়া অসামান্যা রূপবতী যুবতী—তাহাতে আবার যোগিনী ! জগতে ইহার আবার উপমা কোথায় ?

পাগ্‌লী যোগিনীর বয়স জ্ঞানদার অপেক্ষা কিছু বেশী! রূপের জ্যোতিঃ জ্ঞানদার অপেক্ষা কিছু হীনপ্রভ হইলেও পাগ্‌লী সুন্দরী! যাহা হউক যোগিনী-যুগলের আকৃতি প্রকৃতি ও বয়ঃক্রম দেখিলে মনে বড় অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়—সংসারীর হৃদয়ে সদাই ঔদাসীন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। বলাই মামা চির-কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া নানা দেশে বেড়াইয়াছেন বটে, কিন্তু কাল্পনিক জগতে কখনই ভ্রমণ করেন নাই। আজ তিনি ইহাদের দেখিয়া কাল্পনিক সংসারে আসিয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার প্রাণের ভিতর এ সংসারের সেই স্বপ্নময়—মোহময়—আবেশময়—কেমন এক প্রকার কল্পনাময় উদাস ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মামা মনের এইরূপ অমানুষিক ভাবের সহিত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে ছিলেন—সেই যোগিনী-যুগল! মামার সহিত শ্যামা, বামা এবং সেই যুবতী স্ত্রীলোকটিও নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল সেই—**যোগিনী-যুগল!**

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নকল নরক!

ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, চতুর্থীর চন্দ্র কিরণ বিতরণ আরম্ভ করিলেন; যোগিনী-যুগলকে আর সুস্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে জ্ঞানদার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। জ্ঞানদাও তাঁহাদের দিকে চাহিয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকা-বৎ দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া জ্ঞানদার মনে হর্ষ, বিস্ময় ও বিষাদ তিন ভাবেরই আবির্ভাব হইল। প্রথমতঃ বহুদিন পরে প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় হর্ষ, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে যে চারিজন প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিত এবং যাহাদের এরূপ ভাবে এ স্থলে আগমন সম্ভব নহে, তাহা-দেরই একত্র সম্মিলন হওয়ায় বিস্ময় এবং তৃতীয়তঃ আর যে এখন তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও জ্ঞানদা তাহাদের সহিত মিশিতে পারিবে না ইহাতেই তাহার বিষাদ! হৃদয়ের এই তিন ভাবেই তাহাকে বিষম ব্যাকুল করিয়া তুলিল; সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলাই মামাকে কহিল "দাদা! তুমি কাশী হইতে কবে আসিলে?" বুড়া বলাই অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্নেহ-প্রাণ-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন "আমার বড় আদরের খুকি-দিদি! তোমারই মায়ায়

পড়িয়া তোমাকেই দেখিতে আমি কতকাল পরে কাশী হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তোমায় না দেখিতে পাইয়া—তোমার অভাবনীয় অন্তর্দ্ধান অবগত হইয়া আমি তোমারই সন্ধানে পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। প্রায় জন্মাবধি চিরদিনই আমি একাকী এ সংসারে বিচরণ করিতেছি; দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি কখনই পাইও নাই—কাহাকে প্রদানও করি নাই; অধিক কি এ জন্মে কখন বেরাল কুকুর বা পাখীটীও পুষি নাই। কেবল তোমারই জন্মাবধি তোমাকেই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিয়াছি। আজ বহুদিন বিস্মৃত সুখ-স্বপ্নের ন্যায় তোমার মুখখানি দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল; এখন বল দিদি! কে তোমার এমন দশা করিল? কে তোমার সুখের পথের কণ্টক হইল? কে তোমায় সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিল? কেন এমন হইল?"

জ্ঞানদা বলাইয়ের কথায় নিরুত্তর হইয়া বামাকে বলিল "গঙ্গাজল! তুমিও কি আমার সন্ধানে আসিয়াছ?" বামা কহিল "তা নয় ত আর কি? দাদা ত কেবল তোমায় শৈশব দেখিয়াই মজিয়াছেন, আমি যে তোমার কৌমার হইতে যৌবন পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে; এক দণ্ড তোমায় দেখ্‌তে না পেলে যে আমি দশ দিক্ শূন্য দেখিতাম; কিন্তু হঠাৎ আমি নিকটে থাকিতেও আমার চক্ষে ধূলা দিয়া কে যে এমন কাজ করিল, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; বল দেখি গঙ্গাজল! ব্যাপার কি?" জ্ঞানদা বামার এই কথাতেও কোন উত্তর না দিয়া শ্যামাকে তাহার পিতা মাতার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। শ্যামা তাহার পিতার কুশল সংবাদ দিয়া মাতার কথা বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। জ্ঞানদা বুঝিল যে তার মা নাই; কিন্তু তাহাতেও তাহার আর দুঃখ নাই! দুঃখ হইলে এতক্ষণ সে কাঁদিয়া ফেলিত।

এতক্ষণ চক্ষের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু আর পারিল না—সেই যুবতী স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিবামাত্রই জ্ঞানদা কাঁদিয়া ফেলিল, যুবতীও কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে জ্ঞানদা কহিল "ঠাকুর ঝি! তুমি এখানে কেমন করিয়া এই সঙ্গে আসিলে? তোমার ত এখানে আসার কোন সম্ভবই নাই।" বামা বলিল "সে কথা পরে বলিব, আগে তোমার কথা শুনি।" পাগ্‌লি এতক্ষণ অবাক্ হইয়া এই সকল শুনিতেছিল; এইবার কহিল "তোমরা কি আমার কুড়ান রতন কেড়ে নিতে এসেছ? তা হবে না—তা হবে না! তবে শুন্‌বে কি—কে এই সাধের পোষা পাখিটীর শিক্‌লি কেটে দিয়েছে?" এই বলিয়া জ্ঞানদার দুর্দ্দশার কথা সমস্তই পাগ্‌লী পরিচয় দিল। জ্ঞানদাও

শুনিয়া ভাবিল—দিদি একেবারে আগা গোড়া সমস্তই কেমন করিয়া জানিল?” দিদি কে? শ্রাবণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রায় নয় মাস হইল দিদির সঙ্গে থাকিয়া কিছুই জানা গেল না।

তখনই সকলেই এক বাক্যে গঙ্গেশের নিন্দা করিতে ও দোষ দিতে লাগিল। জ্ঞানদা কহিল “তাঁহার নিন্দা আমার সাক্ষাতে কেহ করিও না; স্বামী নিন্দা শুনিলেও স্ত্রীলোকের পাপ হয়। আর তাঁহারই বা দোষ কি? দোষ আমার অদৃষ্টের। আবার ইহা দোষ কি গুণ—দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য তাহাই বা কি জানি?” বামা বলিল, “দোষ নয় ত কি? এই দেখ তোমারে তাড়িয়ে দিয়ে আবার একটা পাশ করা মেয়ে বিয়ে কোরে এনেছে, আর সেই মেয়ের ভাইয়ের সঙ্গে আপন বিধবা ভগ্নীর বিয়ে দিতে সদাই ব্যস্ত! এমন কি একদিন গঙ্গেশ ইহার জন্য যুবতী ভগ্নীর প্রতি জোর প্রকাশও কোরে ছিল; তাই ত কামিনী পলাইয়া আমাদের সঙ্গে এসেছে।” জ্ঞানদা আর কাহারও কোন কথায় উত্তর না দিয়া পাগ্‌লীকে চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল। মামা ও বামা দেখিলেন যে, মেয়েটা এই পাগ্‌লীর সঙ্গে থাকিয়া কেমন বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বোধ হইল, জ্ঞানদা যেন এখন সেই প্রেমময়ীর পরিবর্ত্তে প্রকৃতই পাগলিনী বা উদাসিনী হইয়াছে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে যাত্রীমহলে একটী গোল উঠিল যে, এই স্থানটী প্রকৃত ব্রহ্মপুত্র নহে। প্রকৃত ব্রহ্মপুত্র আসাম প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কয়েকজন পুরুষ সেই জনতার নিকট আসিয়া কহিল “যাহারা আসামের প্রকৃত ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যাইবে, তাহাদিগকে আমরা বিনা ভাড়ায় ষ্টীমারে করিয়া লইয়া যাইব; কারণ আসামের যে ঘাটে আমরা সকলকে লইয়া যাইব, সেখানে একটী মেলা বসাইতেছি।” এই কথায় অনেকেই যাইতে ব্যগ্র হইল; পাগ্‌লী, জ্ঞানদা, বামা, শ্যামা, মামা এবং কামিনীও তথায় যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। পরে সময় মত ষ্টীমার আসিলে সেই লোক কয়েকটী তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিল।

জাহাজ এক দিনে দেওয়ানগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও ধুবড়ী ইত্যাদি ছাড়াইয়া দুই দিনে বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে আসামের একটী ঘাটে থামিল এবং সেই লোক কয়েকটী যাত্রীগুলিকে তথায় নামাইয়া লইল। পরে তাহারা তাহাদিগকে উপযুক্ত বাসা দিব বলিয়া কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া একখানি আট-চালার মধ্যে প্রবেশ করাইল। সেখানে একজন ফিরিঙ্গী সাহেব বসিয়া কি

লিখিতেছিলেন। সাহেব সেই সকল যাত্রীর নাম লিখিয়া লইয়া কহিলেন "তোমরা চারি বৎসরের এগ্রিমেণ্টে আবদ্ধ হইলে; কল্য হইতে রীতিমত চা-বাগানে খাটিতে হইবে। শুনিয়াই সকলের চক্ষু স্থির হইল। ছিল যাত্রী—হইল কুলী!

পরদিন হইতে স্ত্রী পুরুষ, বুড়া, যুবা, পাগ্‌লী, যোগিনী প্রভৃতি সকলেই চা-বাগানের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কাহাকেও কাহাকেও বা বেত্রাঘাতও খাইতে হইল। মামা চা-ক্ষেতে কুলী সকলের অত্যাচার দেখিয়া এবং নিজেও কুলী হইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। একটী পুরাতন আসন্ন-প্রসবা কুলী-রমণী কর্ম্মে অপারগ হইল বলিয়া তাহাকে দারুণ বেত্রাঘাত খাইতে হইল; তাহাতে সে প্রসব হইয়া পড়িল; সবেমাত্র রুগ্ন-শয্যা হইতে উঠিয়াছে অথবা রোগের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, এমন সকল কুলীকেও অসহ্য বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে—রোদনের রোলে রাত দিন এই স্থান পরিপূর্ণ! কুলিদের কঠিন অস্থি এই স্থানে চূর্ণ। এইরূপ যে কত অত্যাচারই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইতেছে, তাহা বলা যায় না। বলাই মামা তাঁহার দলস্থ সকলকে এবং জ্ঞানদা ও পাগ্‌লীকে আপনার সহিত কুলী হইয়া খাটিতে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রহরীর ভয়ে চুপি চুপি বামাকে ডাকিয়া কহিলেন "বামা! মায়ার টানে যে একেবারে সব শুদ্ধ নরকে এসে পোড়্‌লাম দেখ্‌চি। এই স্থানইত মর্ত্ত্যের নরক! এইখানেই মর্ত্ত্যের অনেক পাপীর শাস্তি হয়। নকল নরকে পড়েই এখন খাবি খাচ্চি, পরে আসলে পোড়্‌লে আর দেখ্‌চি নিস্তার থাক্‌বে না?"

বামা কহিল "সকল চা-বাগানেই কি এইরূপ অত্যাচার! সকল স্থলেই কি এইরূপ ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া ভাল মানুষকে কুলী করিয়া আনে?" বলাই কহিলেন "সব শেয়ালেরই এক ডাক—যাই হোক্ এখন উপায়? উদ্ধারের উপায়?" বামা বলিল "সে ত বড় সোজা নয়। এ যে দেখ্‌ছি কারাগার! বুড়া খাটিতে খাটিতেই আবার কহিলেন "কারাগার কোথয়? এ সকল যেন মর্ত্ত্যভূমে—**নকল নরক**!

ষোড়শ অধ্যায়।

সহমরণ

আসাম প্রদেশস্থ এই স্থানটীর নাম ড্যাম্‌ডিম্; এখানকার চা-বাগানেই কাশীবাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা হেমবাবু চিকিৎসা কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। তাঁহার বাসাবাটীতে একটী ঘরে রুগ্নশয্যায় শায়িতা আশালতা! তাহার পার্শ্বে দয়াময়ী বসিয়া ব্যজন করিতেছে ও বলিতেছে "আজ ডাক্তর বাবু আসিলে তোমার জন্য আরও ভাল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া লইব"। আশা ধীরে ধীরে কহিল "আর দিদি, ভাল ঔষধ? এ যাত্রা আর আমার রক্ষা নাই তিনি নিজে কত ঔষধ দিলেন, তার পর সাহেব ডাক্তরের নিকট হইতে আনিয়াও ভাল ভাল ঔষধ দিলেন, কিন্তু পোড়া রোগ কিছুতেই সারিল না— দিনেকের জন্যও দেহ সুস্থ হইল না! আমারও আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই দিদি!" কথা শুনিয়া দয়াময়ীর চক্ষে জল আসিল, তিনি রোগীর নিকট হইতে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া কিয়ৎক্ষণ কাঁদিলেন।

ইত্যবসরে হেমবাবু আসিয়া আশার হাত দেখিয়া সমধিক বিমর্ষ হইলেন এবং মনের সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া প্রাণের সঙ্গিনী প্রেমময়ী দয়াময়ীকে কহিলেন "ভয় কি দয়া? তুমি এখনই এত হতাশ্বাস হইতেছ কেন? দেখা যাউক, এই নূতন ঔষধে কি হয়?" পতির প্রবোধ বচনে দয়াময়ী কিছু আশ্বস্তা হইলে হেমবাবু কহিলেন "আজ ডাক্তরখানায় কয়েকটী নূতন ধরণের কুলী অসুখ হইয়া আসিয়াছে দেখিলাম। ইহারা ৪।৫ দিনমাত্র আসিয়াছে, আসিয়াই খাটিতে খাটিতে রোগে পড়িয়া আজ এখানে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটী যুবতী যোগিনী, একটী যুবতী স্ত্রীলোক দুইটী প্রৌঢ়া নারী এবং একজন বুড়া। কুলীসংগ্রহকারকগণ পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে স্নান করাইব বলিয়া ইহাদের ভুলাইয়া আনিয়াছে; বড় সাহেবের নিকট ইহারা কত দরবার করিয়াছিল— কত কান্না কাঁদিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই; অগত্যা কুলী হইয়া খাটিতেছে! ইহারা আমাদের দেশের লোক বলিয়া বোধ হইল"। দয়াময়ী কহিল "তাহাদিগকে এখানে একবার আনিতে পারেন কি? আমার বড় দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে।" তখন ডাক্তার বাবু "পারি বৈকি" বলিয়া স্বয়ং গিয়া ডাক্তারখানা হইতে তাহাদের সকলকেই ডাকিয়া আনিলেন। দয়াময়ী এক খানি সতরঞ্চি পাতিয়া তাহাতে সকলকে বসিতে দিল।

পরে পরস্পরের পরিচয়ে দয়াময়ী বুঝিল যে জ্ঞানদা তাহার ভগ্নীর ননদ; জ্ঞানদাও বুঝিল যে আশার সহিত তাহার দাদার বিবাহ হইয়াছে। আশাও শুনিল যে যোগিনীরূপিণী জ্ঞানদা তাহার ননদ। তখন ইহাদের সহিত দয়াময়ীর বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিল। হেমবাবু তাহাদের উদ্ধারের জন্য এবং যাহাতে তাহাদের খাটিতে না হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারাও আপাততঃ রোগীরূপে ডাক্তারখানাতেই রহিল এবং সর্ব্বদা হেম ডাক্তারের বাসায় যাতায়াত করিতে লাগিল।

এ দিকে আশার পীড়া ক্রমশঃই কঠিনাকার ধারণ করিল—আর তাহার জীবনাশা নাই। সকলেই তাহার রুগ্ন-শয্যার চারি পার্শ্বে বিষণ্ন বদনে বসিয়া আছে; আশা ইঙ্গিত করিয়া জ্ঞানদাকে তাহার সম্মুখে ডাকিল; জ্ঞানদা সম্মুখে বসিলে আশা তাহার মুখখানির সহিত প্রভাসের মুখের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তাহার শুষ্ক অধর প্রান্তে ক্ষীণ হাস্যের রেখা ভাসাইল! পরে তাহার নয়নপ্রান্তেও দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল! কত দিনের কত কথা তাহার মনে পড়িল। সেই একদিন বৈঠকখানা-সংলগ্ন ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে বসিয়া মালা গাঁথিয়া প্রভাসের গলায় দিয়াছিল—তাহার পর সেই কৌমার-মিলনের কত মধুময় ভাব দেখাইয়াছিল, সকলই তাহার মনে পড়িল। মনে হইল, ছেলে বেলায় কেন এত ভালবাসিয়া ছিলাম—কেন এত ভালবাসিয়া ছিলেন? বালিকা বয়সে এমন প্রেমের স্বপন কেন দেখিয়াছিলাম—এমন বালির বাঁধ কেন বাঁধিয়াছিলাম? নহিলে ত এমন আগুন জ্বলিত না! ছি—ছি, আমা হ'তে আদালতে তাঁর অপমান? ধিক্ আমাকে! আর এ ছার প্রাণের আবশ্যক কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞানদার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে দুই চক্ষু হইতে অশ্রু-বিন্দু দুই গণ্ড বহিয়া পড়িল! ক্রমশঃই আশার ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হইল—নিশ্বাস জোরে পড়িতে লাগিল! পরক্ষণেই প্রদীপ নিবিল—কুসুম শুকাইল—আশা ফুরাইল!

দয়াময়ী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—সকলেই শোকাচ্ছন্ন হইল! যোগিনী-যুগলও অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিল না। হেমবাবুই তাহার শেষ জীবনের শেষ কাজ শেষ করিলেন।

আশার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কয়েক দিন পরেই হেমবাবু কলিকাতা হইতে একখানি পত্র পাইলেন। কাশীবাবুর কোন আত্মীয় সেই লোমহর্ষণ হত্যা-কাণ্ডের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত তাঁহাকে লিখিয়াছেন এবং তিনিই যে এক্ষণে

সেই বাড়ী-ঘর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তাহাও লিখিয়াছেন। তাহার পর প্রভাস ও গোলাম সর্দ্দারের ফাঁসীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে পত্রপাঠ যাইতে লিখিয়াছেন। পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। একে আশার শোকে কাতর, তাহার উপর আবার এই ভয়ঙ্কর অভাবনীয় সংবাদ! তাহাতে তাঁহার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সুকঠিন। পত্র দেখিয়া আরও আশ্চর্য্য হইলেন এই যে, ঠিক্ যে সময়ে এখানে আশার মৃত্যু হইয়াছিল—সেই সময়েই সেখানে প্রভাসের ফাঁসী হইয়াছিল।

হেমবাবু ভাবিলেন—তবু ভাল, যে আশা এ সকল জানিতে পারে নাই, তাহা হইলে বোধ হয় মরণের সময় আরও দারুণ যাতনা পাইত। যাহা হউক, দয়াময়ীকে কেমন করিয়া এ সংবাদ দেওয়া যায়? আশার শোকের উপর আবার সহসা এ সংবাদ পাইলে হয় ত তাহার জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন হইবে! এই ভাবিয়া প্রিয়তমা পত্নীকে এ কথা কিছু না বলিয়া বরাবর বড় সাহেবের নিকট ছুটীর প্রার্থনায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু সাহেব কিছুতেই ছুটী দিলেন না; কেবল বলিলেন "এই সে দিন তুমি ছুটী লইয়াছিলে—এখনও তাহার এক বৎসর হয় নাই! আবার এখনই ছুটী?" হেমবাবু কত কাতরোক্তিতে এই সকল শোকাবহ ঘটনার বিষয় বলিলেন, সাহেব কিন্তু কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। তখন তিনি চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তিনিও যে কুলীদিগের ন্যায় এগ্রিমেণ্ট-নিগড়ে বদ্ধ! পাঁচ বৎসর আর তাঁহার কোথাও নড়িবার যো নাই। হেমবাবু সকল দিকে নিতান্তই হতাশাস হইলেন; তাঁহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল! তিনি শূন্য প্রাণে বিষণ্ণ বদনে বাসার দিকে চলিলেন।

আসিতে আসিতে পথিমধ্যে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন; তখনও সন্ধ্যা হয় নাই—অল্প বেলা আছে। তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গিয়া দেখিলেন যে একটী ঝোপের অন্তরালে এক দুর্বৃত্ত একটী যুবতী রমণীকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে; যুবতী চীৎকার করিয়া উঠিতেছে বলিয়া পাষণ্ড তাহার মুখ বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে; হেমবাবু তথায় উপস্থিত হইয়াই কহিলেন "ব্যাপার কি?" দুর্বৃত্ত কহিল "ডাক্তার বাবু! আপনার এ সকল শুনে কাজ নাই—বড় সাহেবের কেরাণী বাবু এর জন্য পাগল হ'য়েছে, তাই ধরে নিয়ে যাচ্ছি।" হেম দেখিলেন যে স্ত্রীলোকটী সেই

যোগিনী-যুগলের সঙ্গের লোক! তখন তিনি সজোরে কহিলেন "এত অত্যাচারেও কি তাঁহাদের ক্ষোভ মিটে না? আহা, কুলিনী শূকরমণীর সেই কাণ্ডের কথাও কি তাঁর মনে নাই? তারপর প্রত্যহই ত প্রায় সাহেব ও সাহেবের বাবুদের জন্য শত শত কুলী-রমণীর সতীত্ব নষ্ট হইতেছে, তাহাতেও কি আশা মিটে না? আমি কিছুতেই ইহাকে লইয়া যাইতে দিব না। তখন দুর্বৃত্ত তাঁহার সহিত বল প্রকাশে উদ্যত হইল; তিনিও দ্বিগুণ বলে তাহার নিকট হইতে যুবতীকে ছাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। ইহাতে তিনি নিদারুণ আঘাত পাইলেন।

এই স্ত্রীলোকটী কামিনী! সে একাকিনী ডাক্তারখানা হইতে যেমন হেমবাবুর বাসায় যাইতেছিল, অমনি দুর্বৃত্ত আসিয়া তাহাকে ধরিয়াছিল। হেমবাবু তাহাকে লইয়া বাসায় আসিলে, সকলের সম্মুখে তাহার বড় লজ্জা হইল। মনে করিল যে আশঙ্কায় সে পলাইয়া আসিয়াছে, এখানেও আবার সেই অত্যাচার। মনে মনে নিষ্পাপ থাকিলেও এই ঘটনায় লোকে ত সন্দেহ করিতে পারে; লোকে ত ভাবিতে পারে যে ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে! এ লজ্জায় আর মুখ দেখাইব কেমন করিয়া? এই ভাবিয়া সে আর কাহারও সহিত কথা কহিল না। মনে ভাবিয়াছিল, সংসার হইতে যেমন চলিয়া আসিয়াছে, সেইরূপ তাহার বড় ভালবাসার বউদিদির সহিত তাহার ন্যায় সন্ন্যাসিনী হইয়া মরণকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে; কিন্তু তাহাতেও তাহার ইচ্ছা হইল না! পাছে লোকে কলঙ্কিনী বলে, এই ভয়ে সে জীবন বিসর্জ্জন দিতেই সঙ্কল্প করিল। জ্ঞানদা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কত বুঝাইল; কিন্তু কেহই আর তাহার সে সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে পারিল না। বলাই মামা অহিফেণ সেবন করিতেন বলিয়া তাঁহার বিছানার নীচে অহিফেণের কৌটা লুক্কায়িত থাকিত, কামিনী তাহা কত দিন দেখিয়াছিল। আজ রাত্রিতে কৌটাটী আত্মসাৎ করিয়া সে গোপনে সমস্ত আফিং টুকু খাইয়া ফেলিল। তাহাতে প্রায় এক ভরি আফিং ছিল।

পরদিন প্রাতে চিকিৎসালয়ে স্ত্রীলোকের বিভাগ মধ্যে কামিনীর কুলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন সকলে আসিয়া দেখিয়া হেমবাবুকে ডাকিতে গেল। হেমবাবু কল্যকার সেই নিদারুণ আঘাতে শয্যাশায়ী হইয়াছেন—আর তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই; তাহার উপর আবার প্রবল জ্বর! হেমবাবু আসিতে পারিলেন না; তখন একজন সাহেব ডাক্তার আসিয়া

কামিনীর কত চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু ক্রমশঃই কামিনীর উদর স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—চক্ষু রক্তবর্ণ হইল—মুখ হইতে ফেণ নির্গত হইতে লাগিল। জ্ঞানদা অম্লান-বদনে তাহার সেবা করিতে লাগিল! পরিশেষে জ্ঞানদার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে সেই নিরাশ্রয়া বিধবা রমণীও প্রাণ-ত্যাগ করিল। এইবার জ্ঞানদা—যোগিনী জ্ঞানদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল; কিন্তু পাগ্‌লী তাহার দিকে একটী ভ্রূকুটী করায় সে নীরব হইল। জ্ঞানদা বুঝিল যে, সে আবার মায়া ফাঁদে পড়িয়া কাঁদিতেছিল বলিয়া পাগ্‌লী দিদি তাহার দিকে কোপ দৃষ্টিতে চাহিয়াছে।

বুড়া বলাই, শ্যামা বামা ও যোগিনী যুগলকে লইয়া কামিনীর মৃত দেহ শ্মশানে ফেলিয়া আসিলেন। কামিনীর ধূলা খেলা ফুরাইল। হা অভাগিনী বঙ্গ রমণি! এই কলিকালে অহিফেনই তোমার একমাত্র সহায় দেখিতেছি। বোধহীনা বঙ্গবালা অল্পাধিক জ্বালা পাইলেই অহিফেন অবলম্বনে আজ কাল অনন্তকালের জন্য অদৃশ্য হইতে সঙ্কল্প করে। অনেকেই আবার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া—সংসার হইতে চির বিদায় লইয়া পরকালের জন্য প্রভূত পাপ সঞ্চয় করে; তাহারা বুঝে না যে, এ জন্মে যে যাতনার অবসান করিতে আত্মহত্যা অবলম্বন করিতেছে, পর জন্মে এই পাপেই আবার তাহাকে ইহার চতুর্গুণ যাতনা পাইতে হইবে।

এদিকে হেম বাবুরও পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল; সে দিন কামিনীকে উদ্ধার করিতে যেরূপ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল, তাহার উপর প্রবল জ্বরে তাঁহার ঘোর বিকার আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা কারণে তাঁহার হৃদয় উৎসাহশূন্য ও তেজ-হীন হইয়াছিল, বিকার না হইবে কেন? প্রলাপ বাক্যের সহিত এক এক বার প্রভাসের হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকার বিষয় বলিয়া উঠিতেছেন ও ছুটী না পাওয়ায় সাহেবের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। এই বিপদের সময়ে বিদেশে আর কেহই নাই; কেবল তাঁহার একমাত্র সার সম্পত্তি দয়া! জননী ভগিনী দয়া—পাচিকা পরিচারিকা দয়া—সুহৃদ সহায় দয়া! হৃদয়ের একমাত্র অতুল রত্ন দয়া—প্রাণের আরাধ্যা দেবী দয়া—এই অন্ধকারময় জীবনাকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা দয়া!

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দয়া স্বামীর শুশ্রূষায় সদাই ব্যস্ত! ক্লান্তি নাই—শ্রান্তি নাই—আলস্য নাই—ঔদাস্য নাই, অনবরত শিয়রে বসিয়া সেবা

করিতেছে। এমন বিপদের সময় বিদেশে অন্য রমণী কাঁদিয়াই আকুলা হইত; কিন্তু বিপদে পড়িয়াই মানুষ সহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার ও গাম্ভীর্য্য শিক্ষা করে। দয়া সেই অমূল্য শিক্ষা পাইয়া ধৈর্য্যের সহিত স্বামী সেবা করিতেছে।

অন্য এক জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা চলিতেছে; ক্ষণ পরেই তাহাতে একটু আরামের চিহ্ন প্রকাশ পাইল—হেমের জ্ঞানের উদয় হইল! হেম কহিলেন "তুমি আমার জন্য এত কষ্ট পাইতেছ, ইহাতে তোমার যে আবার অসুখ হইবে।" দয়া কহিল "আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের ইহাতে কষ্ট হয় না—তুমি সারিলে আবার বিশ্রামের দিন পাইব।" হেম দয়ার গায় হাত দিয়া আবার ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন "দয়া! তুমি রমণীর শিরোমণি! তোমার পরিশ্রম, তোমার ধৈর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমি অতি অধম, তাই তোমার ন্যায় পতিপ্রাণা সাধ্বীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে বা যত্ন করিতে পারিলাম না। দয়া? তোমার ন্যায় সতীকে ভালবাসিয়া যে কি সুখ, তাহা আর বলিবার নহে।" এইবার দয়া কাঁদিয়া ফেলিল; দুঃখের সময়ে আদর পাইলে সকলেরই চক্ষে জল আসে। দয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "আর আমার ওরূপ গুণ ব্যাখ্যা করিও না—আমি তোমার পদানতা দাসী!" বলিতে বলিতে দয়া দেখিল রোগ বাড়িয়া উঠিয়াছে—চক্ষু কপালে উঠিয়াছে—নিশ্বাস ঘন হইয়াছে। দয়া অমনি "ওগো কি হ'ল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখিল হেমবাবু চির-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন—ডাক্তর বাবু জন্মের মতন ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।

চা-বাগানের প্রায় সকল কর্ম্মচারীই হেমবাবুকে ভালবাসিতেন; সকলেই তাহাতে শোক প্রকাশ করিল। বলাই মামা, শ্যামা ও বামা এবং যোগিনী যুগলও শোকে সমাচ্ছন্ন হইল এবং মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; ভাবিল তাহাদেরও উদ্ধারের আশা হেমবাবুর সহিত তিরোহিত হইল।

তখন সকলেই হেম বাবুর মৃত দেহ ব্রহ্মপুত্রের শ্মশানে লইয়া গেল। দয়াময়ীও মুখাগ্নি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে বলিয়া সেই সঙ্গে চলিল; চিতানলে হেম বাবুর দেহ ভস্মসাৎ হইবার উপক্রম হইলে অনেকের অলক্ষ্যে দয়াময়ী স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সেই ব্রহ্মপুত্রের অতল জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—আর উঠিল না! এইবার সকল ফুরাইল!

যদিও ইংরাজ রাজত্বে আর এখন সতী দাহ বা সহমরণ প্রথা প্রচলিত

নাই, যদিও আর এখন হিন্দুর পতিপ্রাণা সতী সাধ্বীর সতীত্বের জয় পতাকা জগতে উড্ডীন হয় না বটে, কিন্তু সকলেই সতীর এই আশ্চর্য্য সহমরণ দেখিয়া সমধিক আশ্চর্য্য হইল এবং বুঝিল যে হিন্দু রমণীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠাই এই—সহমরণ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মামার মরণ!

এই আশ্চর্য্য সহমরণ দেখিয়া শ্মশান হইতে সকলেই চা-ক্ষেত্রে আসিয়া আবার স্ব স্ব কার্য্যে লিপ্ত হইল। কেবল বুড়া বলাই, যোগিনী যুগল এবং শ্যামা ও বামা কিয়ৎক্ষণের জন্য তথায় চিত্রার্পিত পুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের সহিত যে দুইজন প্রহরী ছিল, তাহারা উহাদিগকে শীঘ্র লইবার জন্য বারম্বার "চল", "চল" বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। বলাই তাহাদের নিকট সকাতরে একটু মাত্র সময় ভিক্ষা চাহিলেন এবং সেই অবসরে জ্ঞানদাকে কহিলেন "খুকি দিদি! এইবার ত আমাদের সকল আশা ফুরাইল, এক্ষণে উদ্ধারের উপায় কি?" জ্ঞানদা কহিল "দাদা! তার জন্য আর চিন্তা কি? এ ত সামান্য কারাগার, এই ভয়াবহ ভব-কারাগার হ'তে উদ্ধারের উপায় কিছু ভেবেছেন কি?" বুড়া বলাইয়ের এ কথা বড় ভাল লাগিল না। তিনি মনে ভাবিলেন এই পাগ্‌লী যোগিনীটার সঙ্গে থাকিয়া নিশ্চয়ই খুকি দিদি একেবারে এঁচোড়ে পাকিয়া গিয়াছে; নতুবা এই কচিমুখে এমন পাকা কথা কেন? নিশ্চয়ই জ্ঞানদা জ্ঞান বুদ্ধি হারাইয়া কেমন বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে; তিনি সে ভাব বাহিরে প্রকাশ না করিয়া কহিলেন "সে উপায় ভাবিয়া ছিলাম বৈকি দিদি! যে দিন তোমার পিতার উপর রাগ করিয়া কাশী গিয়া বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেই দিনই ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু কপালের দোষে এ দেশে এসে আবার মায়াফাঁদে পড়িয়াই ত ভবকারাগার ভুলিয়া এই ভাবনায় আকুল হইয়া পড়িয়াছি"।

জ্ঞানদা। কেন আবার মিথ্যা মায়াফাঁদে পড়িলেন দাদা? আমার মায়া কাটাইয়া দিন।

বলাই। তুমি কি মায়া কাটাইয়াছ?

জ্ঞানদা। হাঁ!

বলাই। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যা'বে না।

জ্ঞানদা। না।

জ্ঞানদার এই 'হাঁ' আর 'না' উত্তরে সকলেই অবাক্ হইয়া রহিল; জ্ঞানদাও এই 'হাঁ' আর 'না' বলিয়া হাঁ করিয়া কি যেন আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। তখন বামা কহিল "বলি গঙ্গাজল! তোমার কি একবার সেই শোকাতুর বুড়া বাপকে আর তোমার সেই গুণধর স্বামীকে দেখ্‌তেও ইচ্ছা করে না?" জ্ঞানদা কহিল "না গঙ্গাজল, আর তাঁহাদের দেখা দিতে আমার ইচ্ছা নাই। আর কেন তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া তাঁহাদের দারুণ মর্ম্মবেদনার কারণ হইব? তাঁহারাও কি আর আমাকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন?" এই কথা শুনিয়াই বলাই অমনি বলিয়া উঠিলেন "কে বলে তোমায় কলঙ্কিনী? তোমাকে যে কলঙ্কিনী বলে, সে নিজেই কলঙ্কের মূর্ত্তি! আমরা সকল কথা সবিস্তারে বর্ণন করিলে কখনই তাঁহাদের মনে এরূপ বিশ্বাস বা ধারণা থাকিবে না"। জ্ঞানদা কহিল "দাদা! আপনি আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়; কিন্তু আপনি আজও মানব-চরিত্র কিছুই বুঝেন নাই। একজনের উপর, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে, একবার কুভাবের ধারণা হইয়া গেলে সহস্র বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রয়োগেও কখন কি সেই মনের খট্‌কা টুকু যায়? আমি ত আর দাদা, সেই স্বয়ং লক্ষ্মী সীতার মত সতী নহি, যে পতির অনুমতি অনুযায়ী অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া সাধারণের নিকট সতী বলিয়া পরিচিতা হইব? মা জানকীর সেই কঠোর অগ্নি পরীক্ষাতেই কি রামের মনের ভাব সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াছিল? তাহা হইলে আর রাম রাজাসনে বসিয়াই দুর্ম্মুখ দূতের মুখে প্রত্যহ সীতা সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভাব জানিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন না এবং সেই পঞ্চমাস গর্ভবতী নিরপরাধিনী সীতাকে বনবাসিনী করিতেন না। আবার যখন যুগল কুমার ক্রোড়ে লইয়া মহামুনি বাল্মিকীর সহিত পুনরায় গৃহে আসিলেন, তখনও মহর্ষি সীতার স্বভাব সম্বন্ধে শতমুখে বলিলেও রাম পুনরায় প্রজা সমক্ষে পরীক্ষা দিতে বলিয়াছিলেন। যখন বাল্মীকির ন্যায় মহামুনির মুখে শুনিয়াও তাঁহার মনের সন্দেহ ঘুচিল না, তখন দেবী আর অগ্নি পরীক্ষা না দিয়া একেবারে শেষ পরীক্ষায় জীবলীলা শেষ করিলেন এবং চিরকলঙ্ক দূর করিয়া চিরদুঃখের অবসান করিলেন।"

বলাই কহিলেন "সে সকল কেবল প্রজারঞ্জনের জন্য, রামের মনের ভাব সেরূপ ছিল না"। জ্ঞানদা কহিল "হউক প্রজারঞ্জনের জন্য, কথায় বলে, যার মন চাঙ্গা—তার কাঠেই গঙ্গা! যদি রামের মন খাঁটী থাকিত, তবে সাধারণে যে সীতার স্বভাব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবে, তাহা তাঁহার মনেই স্থান পাইত না। তাই বলি দাদা! আর কেন এ পোড়ার মুখ লোকালয়ে দেখাইব? আপনারা স্বদেশে গিয়া সবিস্তারে সমস্ত বলিলেও সাধারণের মনের ভিতর আমার সম্বন্ধে যে একটী ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা মৌখিক ভাবে দূর হইলেও আন্তরিক ভাবে যাইবে না, ইহাই মানুষের মনের ভাব! মানুষের নিকট আর আমার যাইবার মুখ নাই।" তখন বামা কহিল "তবে কোথায় যাইবে?"

জ্ঞানদা। যে দিকে দুই চক্ষু যায়! জন্ম জন্মান্তরের কত পাপের ফলে এ জন্মে মানুষ হইয়াও মানুষের নিকট মুখ পাইলাম না; পরজন্মে আর যাহাতে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে না হয়, তাহারই চেষ্টা যে পথে হয়, সেই পথে যাইব। বড় সাধের গঙ্গাজল! বড় সাধের ঠাকুর দাদা! তোমাদের যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ বাৎসল্য ও ভালবাসার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আমি বদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা মানুষের অদৃষ্টে সচরাচর ঘটে না; কিন্তু সেই ভাগ্য দোষেই আমি তাহা হইতে বঞ্চিতা হইলাম; আরও আমি তোমাদের প্রাণে দারুণ ব্যথা দিলাম। তোমরা আমারই মায়ায় আমারই জন্য কতকষ্টে আমাকে সন্ধান করিলে, আর আমি আজ তোমাদেরই কাছে তোমাদের সেই মায়া কাটাইয়া চক্ষের জলের সহিত চির বিদায় লইলাম।

বামা। তুমি যে ভাই গঙ্গাজল, কোন্ মায়া-রাক্ষসী পাইয়া আমাদের মায়া কাটাইলে, তাহা কিছুই বুঝিলাম না।

জ্ঞানদা। এখনও কাহাকেও পাই নাই ভাই; সেই জগন্মায়া মহামায়ার সকল মায়াই মিথ্যা জানিয়া তোমাদের মায়া কাটাইলাম; এখন এই সাক্ষাৎ মায়ারূপিণী পাগ্‌লী দিদি যে পথে লইয়া যাইতেছে, সেই পথে যাইতেছি! আশীর্ব্বাদ কর গঙ্গাজল! যে পথে যাইতেছি, সে পথ আমার যেন পরিষ্কার হয়, এবং আমার এই সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। আরও আশীর্ব্বাদ কর দাদা! আমার সেই হৃদয়-মন্দিরের একমাত্র আরাধ্য দেবতা তোমার নাতজামাইয়ের যেন কোন বিপদ না ঘটে; তিনি

যেন আমাকে ছাড়িয়া সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশে তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণাম পূর্ব্বক তোমাদের চরণে নমস্কার করিয়া জন্মের মত বিদায় হইলাম। এই বলিয়া জ্ঞানদা কাঁদিয়া ফেলিল, চক্ষের শতধারায় বক্ষ ভাসিয়া গেল। পাগ্‌লী সেই কান্না দেখিয়া, আর নীরব থাকিতে না পারিয়া ক্রন্দনাকুলা জ্ঞানদার চিবুক ধরিয়া কহিল—

"আর কেঁদো না আর কেঁদো না ছোলা ভাজা দিব,
এবার যদি কাঁদ তুমি, তুলে আছাড় দিব।"

বলিতে বলিতে অমনি সেই চিবুক ধরিয়াই চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে স্থর সংযোগে গাহিতে আরম্ভ করিল—

ছোলা ভাজা দিব আমি কেঁদো না লো আর,
এবার কাঁদিলে তোরে দিবরে আছাড়!
এলি কেঁদে, যাবি কেঁদে,
বাকী দিন কেঁদে কেঁদে,
এ জনমে কিবা ফল হবেরে তোমার।
লক্ষ্য পথে লক্ষ হেসে,
যাও চ'লে অবশেষে,
হেরিয়ে মজার এই ভবের বাজার!
মুছে দিই অশ্রুধার,
কেঁদ না কেঁদ না আর,
কান্না যদি চিরদিন, হাসি কবে আর!

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলেই পাগ্‌লী হো—হো করিয়া উচ্চ হাসি হাসিল ও আবার কি ভাবিতে লাগিল।

বলাই কহিলেন "আর তোমার বলিবার কিছুই নাই; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। আমিও কাশী গিয়া আবার শেষ জীবন কাটাইয়া দিই; এখন এখান হইতে উদ্ধারের উপায় কি করি?" বামা কহিল "দেখুন, যদি কোন প্রলোভনে এই প্রহরীদ্বয়কে বশীভূত করিতে পারেন।" বলাই

কহিলেন "ভাল বলিয়াছ, তাহাই একবার দেখা যাউক;" এই বলিয়া তিনি প্রহরীদ্বয়কে সকলের অন্তরালে ডাকিলেন; তাঁহার নিকট অনেক কালের দুইটী সোণার মোহর ছিল; সেই দুইটী দেখাইয়া তাহাদিগকে কহিলেন "এই দুই মূল্যবান মোহর আমি এক স্থানে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়া উপহার পাইয়াছিলাম, আজি আমি এই রত্ন দুইটী তোমাদের দুইজনকে দিতেছি—তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও"। প্রহরীদ্বয় কহিল "তারপর আমাদের উপায়?" বলাই কহিলেন "তার জন্য আর চিন্তা কি? কৌশলে কি না হয়? তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আরও কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিয়া সেখানে গিয়া এই ভাব প্রকাশ কর যে—'হেম ডাক্তারের মৃতদেহ দাহ করিতে গিয়া শ্মশান হইতেই আমরা পলা-ইয়াছি; তোমরা যেন কত চেষ্টা করিয়াও আমাদের ধরিতে পার নাই; তারপর সেখান হইতে আমাদের অনুসন্ধানে আরও লোক আসিলে, তাহা-দিগকে 'এদিকে গিয়াছে—ওদিকে গিয়াছে' বলিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা অনেক দূর গিয়া পড়িব। তাহা হইলে তোমরাও বাঁচিবে—আমরাও নিশ্চিন্ত হইব।"

প্রহরীদ্বয় যোগিনী যুগলের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "যুক্তি মন্দ নয়, কিন্তু আমরা এই সোণার মোহর চাহি না—ঐ দুইটী হীরার টুক্‌রা যদি আমাদের দুই জনকে দিতে পার, তবে আমরা তোমাদের তিন জনকে ছাড়িয়া দিতে পারি"। বলাই শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন; পরে মনে মনে একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া কহিলেন "আপনি বাঁচিলে বাপের নাম! নিজ বিপদের জন্য তাহাও দিতে পারি, কিন্তু এই বেলা দুপুরের সময় এই গোপনীয় কুৎসিৎ বিষয় যদি কেহ জানিতে পারে, তবে সকলেরই ঘোর কলঙ্কসাগরে ডুবিতে হইবে এবং বিশেষ বিপদও ঘটিতে পারে; তাই বলি যদি কোন নির্জ্জন স্থান থাকে, তবে সেখানে এখন ইহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখ, পরে সময়ান্তে সন্ধ্যার পর যথেচ্ছা ব্যবহার করিও—লোকেও জানিবে না, আমরাও জানিব না"।

তখন প্রহরীদ্বয় বিশেষ আনন্দিত হইয়া কহিল "সেরূপ স্থান নিকটেই আছে; তাহার চাবিতালাও আমাদের নিকট আছে।" এই বলিয়া তাহারা সকলকে শ্মশানের নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গল মধ্যস্থ একটী প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মন্দিরের নিকট লইয়া আসিল। বলাই মামা জ্ঞানদাকে অন্তরালে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কাণে কাণে

তাঁহার কৌশলের কথা ব্যক্ত করিলেন। কথা শুনিয়া জ্ঞানদা তাহার পাগ্‌লী দিদির সহিত সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রহরীদ্বয় আসিয়া অমনি সেই মন্দির-দ্বার বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া চা-ক্ষেত্রে চলিয়া গেল। যাইবার সময় শ্যামা, বামা ও বলাইকে সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পাদবিক্ষেপে বহুদূর চলিয়া যাইতে বলিয়া গেল।

বলাই কিন্তু সময় বুঝিয়া শ্যামা ও বামাকে সেই পরামর্শ দিলেন এবং কহিলেন "তোমরা তাড়াতাড়ি পলায়ন কর; এবং সেই বাইশ কোদালের মোহানার চটিতে আমার জন্য অপেক্ষা করিও। ইহারা আমার সহিত যাউক বা না যাউক, কোনরূপে আমি ইহাদের দুই জনকে এ যাত্রা বাঁচাইয়া যাইব। আমাদের সঙ্গ ছাড়া হইলে উহাদের মনে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবে। খুকীই যেন মায়া কাটাইয়াছে, পোড়া বুড়ার মায়া ত আর যাইবার নহে; যতক্ষণ চক্ষের উপর আছে, ততক্ষণ ত রক্ষা করি; পরে যাহা হয় হইবে—তখন আর দেখিতে আসিব না। এততেও পোড়া মায়া যেন বুড়াকে ছাড়িতেছে না! ও কি, আবার চক্ষে জল আসে কেন? চোখের জল যে কি করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাহাও বুড়া এই বুড়া বয়স পর্য্যন্ত শিখিল না। হৃদয়ের মায়ার উৎস—দুঃখের জলপ্রপাত যেন সামান্য কারণেই উৎসারিত হয়! দূর হ—চ'খের জল! আর কেন আমার এই বুড়া বয়সে জ্বালাতন করিস্? যাহাই হউক, যদি আমি ইহাদের উদ্ধার করিয়া সপ্তাহ মধ্যে তোমাদের সহিত না মিশিতে পারি, তবে জানিও যে নিশ্চয়ই আমার কোন বিপদ ঘটিয়াছে; এই ভাবিয়া তোমরা সপ্তাহ্ পরে চলিয়া যাইও।"

এই বলিয়া শ্যামা ও বামাকে বিদায় দিয়া মামা পুনরায় শ্মশানে আসিলেন, এবং তথা হইতে মৃত-দেহের সহিত আনীত একখানি লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র অর্থাৎ দা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। সেই অস্ত্র দ্বারা তিনি ভগ্নপ্রায় মন্দির-দ্বারের কুলুপ ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই তালা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং শিকল খুলিয়া গেল বটে, কিন্তু সজোরে আঘাত করায় দ্বারের উপরিস্থ ভগ্ন খিলান হইতে তিন চারিখানি বৃহৎ ইষ্টক পড়িয়া মামার মাথা ফাটিয়া গেল, এবং মস্তিষ্কের ঘিলু বাহির হইয়া সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হইল। যোগিনী-যুগল উন্মুক্ত দ্বার পাইয়া বাহিরে আসিয়াই বলাইয়ের অবস্থা দর্শন পূর্ব্বক চমকিতা হইয়া দাঁড়াইল!

তখন জ্ঞানদা দুঃখে ও ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া কহিল, "এ কি সর্ব্বনাশ

দাদা! এ হতভাগিনীর জন্য শেষে কি প্রাণটীও হারাইলে? ধিক্ আমাকে! আমার কি পোড়াকপাল যে, একদিনের জন্যও আমি তোমাদের সুখের কারণ হইতে পারিলাম না। আমারই জন্য আজীবন কত ক্লেশ পাইলে—শেষে কাশী হইতে আসিয়া কত কষ্টে আমার সন্ধান করিলে! আমিই আবার তোমায় মর্ম্মব্যথা দিলাম; আমাকেই ধিক্! এই অভাগিনীর মায়ায় পড়িয়াই তুমি বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ প্রদেশে আসিলে—শেষে এই মায়াতে পড়িয়াই আবার তুমি প্রাণটীও হারাইলে? আমাকেই শত ধিক্ দাদা—সহস্র ধিক্! কেন দাদা! আমায় হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছিলে? কেন দাদা আমায় শৈশবে সোহাগ করিয়া সঙ্গীত শিখাইয়াছিলে? তখন যদি জানিতে দাদা! যে এই পোড়াকপালী তোমার কষ্টের কারণ ও মৃত্যুর কারণ হইবে, তবে যে আমাকে লবণ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিলেই সকল আপদের শান্তি হইত। এই পাপিনীর পাপের সংখ্যা যে ক্রমশঃই বাড়িতেছে দাদা—উপায় কি হইবে দাদা! উঃ কেন এমন হইল—কি হইল?" এই বলিয়া জ্ঞানদা সে দৃশ্য দেখিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

সেই আসন্ন-মৃত্যু-মুখে পতিত বলাই অতি কষ্টে কহিলেন "তোমরা এখনই সত্বর পলায়ন কর, নতুবা তোমাদের জীবন ত যাইবেই তাহা ছাড়া স্ত্রী জাতির সার সম্পত্তি সতীত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে। তা যদি হয়, তবে আমার সকলই বৃথা হইবে—মরিয়াও সুখ পাইব না। এখন আর ওরূপ বিলাপ বা অনুতাপ করিবার সময় নাই, এইরূপ কম্পান্বিত কলেবরে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইবারও দরকার নাই; কাহারও জন্য কেহ মরে না—জীবন মরণ সেই জগজ্জীবন জগদীশের হাত! মরণ কালেও কি কথা না শুনিয়া তুমি আমার মর্ম্মবেদনার কারণ হইবে? যদি কখনও কোন সময় বারেকের জন্য আমার উপর তোমার মায়া জন্মিয়া থাকে, তবে তোমরা শীঘ্র পলাও! তাহা হইলে আমার এই আকস্মিক মৃত্যুতেও আমি অনন্ত শান্তি ও সুখ পাইব। যদি আমার এই শেষ দিনেও আমাকে একটু সুখী করিতে তোমার বাসনা থাকে, তবে শীঘ্র পলাও—শীঘ্র পলাও—শেষ কথা শুন—শীঘ্র পলাও!!"

পাগলী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া জ্ঞানদাকে লইয়া দ্রুতপদে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। তখন বলাই মামা সেই আসন্ন সময়েও প্রসন্ন হইয়া অবসন্ন অঙ্গেই গমনশীলা জ্ঞানদার দিকে লক্ষ্য করিয়া গাহিলেন—

(ওরে) দিয়ে যা, দিয়ে যা মোরে দুটী ফোঁটা নয়ন জল,
তাই হবে রে শুধু মম শেষের সম্বল।
ফুরিয়েছে জীবনের খেলা, ফিরিয়ে নে রে এই বেলা,
ছেলে বেলা মার সেই সোহাগ সরল।

* * * * *

আসা একা যা'ব একা, দিয়ে যারে শেষ দেখা,
একা যেবা, কেবা তার, আছে আর বল।
স্বার্থে ভরা শুধু ধরা, কে বুঝে রে বাঁচা মরা,
আপন গরবে সবে আপনি পাগল।
এ বিরস মরুভূমে, সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
ধূমাকার অন্ধকার হেরি অবিরল;
মনের শেষের কথা, চরমে মরম ব্যথা,
শুধু রৈল প্রাণে গাঁথা বাসনা বিফল।
তুই ওরে পোষা পাখী, প্রাণের পিঞ্জরে থাকি,
পলাইলি দিয়ে ফাঁকি, কাটিয়া শিকল।
গলে দিয়ে মায়া ফাঁসি, শেষে না গেলাম কাশী,
সর্ব্ব শেষে সর্ব্বনাশি কাঁদালি কেবল॥

সঙ্গীতও যেমন শেষ হইল, বলাইয়েরও সঙ্গে সঙ্গে সকল শেষ হইল। শেষে পিপাসায় কাতর হইয়া 'জল—জল' করিয়া নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। জনমের মত তাঁহার জীবলীলা ফুরাইল! কেহ জানিল না—কেহ দেখিল না! নীরবে নির্জ্জনে হইল—**মামার মরণ!**

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মায়ার মরণ!

পাগ্‌লী ও জ্ঞানদা তথা হইতে পলাইয়া দুই দিন অনাহারের পর প্রায় দ্বিপ্রহর রজনীতে সেই বাইশ কোদালের মোহানার ধারে একটী চটীতে আসিয়া আশ্রয় লইল। পরদিন প্রত্যূষে স্নানোদ্দেশে যোগিনীযুগল যেমন সেই ত্রিমোহানার ঘাটে নামিল, অমনি অদূরে আঘাটায় একজন ব্রহ্মচারীর দিকে দৃষ্টি পড়িল। তাহারা তথায় গিয়া দেখিল যে ব্রহ্মচারী একটী মৃতদেহের উপর বসিয়া তপ জপে প্রবৃত্ত আছেন। পাগ্‌লী দেখিয়াই চিনিল যে ইনিই তাহার সেই গুরুদেব! জ্ঞানদাও তাঁহাকে পাগ্‌লীর কুটীরে দেখিয়াছে বলিয়া চিনিতে পারিল। পাগ্‌লী আর থাকিতে না পারিয়া গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিল, এবং এখন তাঁহাকে বিরক্ত করিলে যে তাঁহার তপ জপের বিঘ্ন ঘটিতে পারে, ইহা না ভাবিয়াই তাঁহাকে কহিল "গুরুদেব! এইরূপই কি আপনার মনে ছিল?" ব্রহ্মচারীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল; তিনি সেই শবাসনে বসিয়াই পাগ্‌লীর দিকে একবার আরক্ত-লোচনে কহিলেন। পাগ্‌লী তাঁহার সেই ভীম ভ্রূকুটীতে ভীত হইয়া কহিল "ঠাকুর! না জানিয়া না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা করুন।"

ব্রহ্মচারী তখন সে ভাব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন "কেমন মায়া! মহামায়ার মায়া-ঘোর কেটেছে কি?" এই কথা শুনিবামাত্রই পাগ্‌লীর হৃদয় যেন কাঁপিয়া উঠিল; তখন সে যোগিনী বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই গৈরিক বসনেই ঘোম্‌টা দিয়া যেন কুলের কুলবধূটী হইয়া দাঁড়াইল এবং লজ্জাবতী বঙ্গবধূ-স্বভাবসুলভ মৃদুস্বরে কহিল "প্রভো! তবে এই অন্তিম সময়ে আপনার শ্রীপাদপদ্ম একবার আমার হৃদয়ে অর্পণ করুন, আর সেই যিনি আপনার গুরুদেব সেই ত্রিভুবনবাসী মহর্ষিকে একবার আমায় দেখান; আমি শ্রীগুরুর শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া গুরুর গুরু মহাগুরুর পাদপদ্ম দেখিতে দেখিতে জীবলীলা সাঙ্গ করি।"

জ্ঞানদা এতকাল পাগ্‌লীর সহবাসে থাকিয়াও তাহার আগন্ত কিছুই পায় নাই; আজ আবার নূতন রহস্য দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া রহিল। ব্রহ্মচারী কহিলেন "মনে আমার এইরূপ ছিল না; তবে নিজ নিজ কর্ম্মফলের জন্য

অদৃষ্টের ফলাফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়; তাই কিছুকাল চা-বাগানে গিয়া তোমার সজীবনেই নরক-ভোগ হইয়া গেল।” পাগ্‌লী কহিল “প্রভো! একবার এক দোষের জন্যই ত মর্ত্ত্যে আসিয়া আমি মানবী-যোনিতে জন্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক কঠোর শাস্তি পাইলাম; তাহার উপর আবার এ নরকভোগ কেন?” ব্রহ্মচারী বলিলেন “তোমার এই আত্ম-বিস্মৃতিময় মানবী লীলায় তোমার পতি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তুমি পতি-প্রেমে প্রবঞ্চিতা হইয়াও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, তাহা অসাধারণ! সেই পতিকে অন্তরাল হইতে মধ্যে মধ্যে দেখিবার জন্য পদ্মার চর হইতে গণেশপুর গ্রাম পর্য্যন্ত এতদূর পথও তুমি বারম্বার যাতায়াতে অতি নিকট করিয়া ফেলিয়াছ; তুমি পাগ্‌লী সাজ সাজিয়া পতির উদ্দেশে পতি পদে পুষ্পাঞ্জলী না দিয়া একদিনও জলগ্রহণ কর নাই; কিন্তু একদিন তুমি পতিকে অনেক অসৎকার্য্য করিতে দেখিয়া একবারমাত্র তাঁহার উপর অল্প ক্রোধ করিয়াছিলে, এবং তাঁহার প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য ঘৃণার চক্ষে চাহিয়াছিলে, তাই তোমার মুক্তির সময় মর্ত্ত্য মাঝেই মর্ত্ত্য-মধ্যস্থ এই নকল নরক-ভোগ হইয়া গেল। শাপ মুক্ত হইয়া দিব্য দেহ পাইলে ত আর নরকের নামও শুনিতে হইবে না, তাই তোমার মর্ত্ত্যের পাপ মর্ত্ত্যেই খণ্ডন হইয়া গেল। তোমার সহবাসে থাকিয়া এবং অন্যান্য কর্ম্ম-ফলের জন্ত তোমার সঙ্গীদিগেরও অদৃষ্টে সজীবনে একবার ত নকল নরক-ভোগ হইল, জানি না—পরলোকে আর তাহাদের জন্য আসল নরক ব্যবস্থা হইবে কি না? এখন যাও মা, সেই অমরধামে; যেখানে জরা মৃত্যু, রোগ শোক, আধিব্যাধি, পাপ তাপ কিছুই নাই—সেইখানে যাও! আজ তোমার অন্তিম সময় উপস্থিত! কল্য প্রত্যূষেই তুমি এই ভব-কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।”

পাগ্‌লী কহিল “আপনি যে পূর্ব্বে কুটীরে বসিয়া বলিয়াছিলেন এবার ব্রহ্ম-পুত্রে স্নানোপলক্ষে আপনার গুরুদেব সেই মহাজ্ঞানী মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং তাঁহার নিকট হইতে আমাদের ধর্ম্ম-সাধনার জন্য স্বতন্ত্র প্রণালী ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহারই বা কি হইল?” ব্রহ্মচারী কহিলেন “তাহার আর হইবে কি? তোমার অই কুড়ান রত্ন জানদার জন্যই এখন সে সকল নির্দ্দিষ্ট হইবে। তোমার ত সাধনার শেষ হইয়াছে, তোমার স্বতন্ত্র স্থান—এখন সেই স্বস্থান স্বর্গধাম! তোমার স্বতন্ত্র কার্য্য—এখন কেবল পূর্ব্বের ন্যায় মর্ত্ত্য মাঝে মায়াজাল বিস্তার!”

এইবার জ্ঞানদা কাঁদিয়া ফেলিল এবং কহিল "তবে কি দিদি, তুমিও এই অভাগিনীকে ফেলিয়া চলিলে? আর তবে, এই ভবে কাহার আশ্রয়ে থাকিব?" পাগ্‌লী কহিল "কেন বোন্! আমার গুরুদেব এই তেজঃপুঞ্জ-কান্তিময় ব্রহ্মচারী, যিনি তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তিনিই তোমার আশ্রয় হইবেন—তিনিই তোমায় এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন; সাবধান! যেন পথ ভুলিয়া বিপথে যাইও না।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন "ভয় কি মা! আমি আবার তোমাকে আমার গুরু-দেবের উপর তোমার সকল ভার দিব। দেখিও মা, ভগবান আর তিনি ভিন্ন নহেন; স্বয়ং ভগবানই তাঁহার নিকট চির-বাঁধা।"

তখন জ্ঞানদা কহিল "ঠাকুর! তবে আর আমার চিন্তা কি? যদি আপনারা আমাকে পায়ে রাখেন, তবে আর দিদির মায়ায় কাতর হইব কেন? কিন্তু দিদি যে আমার কোন্ দেবীমূর্ত্তি আমাকে ছলনা করিয়া যাইতেছেন, তাহাত আমি কিছুই বুঝিলাম না ঠাকুর!" ব্রহ্মচারী কহিলেন "সে সকল পরিচয় এখন এই মায়াময়ী পাগ্‌লীর নিকটই পাইবে"।

পাগ্‌লী কহিল "প্রাণের বোন্‌টী আমার, শুনিবি কি আজ সব? তবে শোন্ বলি—আমি সেই তোমার রমেশ দাদার পত্নী; আমার নাম মায়া! তোমার দাদা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে আমি পিতার সহিত তাঁহার চাক্‌রীস্থানে গিয়াছিলাম; তথা হইতে আসিবার কালে নৌকাডুবি হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করেন, কেবল আমিই ভাসিয়া গিয়া পদ্মার চড়ায় আসিয়া প্রাণ রক্ষা করি। তাহার পর জগতে একাকিনী হইয়া সেই চড়াতেই বাস করিতাম এবং পাগ্‌লী সাজ সাজিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতাম। পতিপ্রেমে প্রব-ঞ্চিতা হইয়া আমার প্রাণ পাগলমন পাগল হইয়াছিল; পরে পিতা মাতা প্রভৃতি সকল হারাইয়া হৃদয়, মস্তিষ্ক সকলই পাগল হইয়া গেল; তখন আর বাহিরে মানুষ থাকি কেন? ভিতরে পাগল—বাহিরেও পাগল হইলাম। বিশেষতঃ আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়া কেবল একমাত্র আর সম্পত্তি সতীত্ব রত্নকে রক্ষা করিতে দেহের এই যৌবনশ্রী বিকৃত করিবার জন্য বাহিরে একেবারেই পাগ্‌লী সাজ সাজিলাম—তাই আমি পাগ্‌লী!

পাগ্‌লী হইয়া কতবার গণেশপুর গিয়াছি—কতবার নারায়ণপুর গিয়াছি, তোমার অদৃষ্ট-চক্রের গতির বিষয় ছদ্মবেশে আমি সমস্তই পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। তোমার এই যাতনায়—এই কলঙ্কের কারণই তোমার রমেশ দাদা! পাছে

তোমার গর্ভে সন্তান হইলে তোমার পিতৃ বিষয় তাঁহার করতলে না পড়িয়া তোমার করারও হয়, তাই সেই কুলী-সংগ্রহকারক হৃদয়প্রসন্নের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে তোমার স্বামীর নিকট পাঠান হয়; তাহার পর সেই পাষণ্ডই কৌশলে তোমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া পিত্রালয়ের পরিবর্তে যমালয়ে লইয়া যায়। আমি ইহার সকল যুক্তি, সকল পরামর্শ সকলই জানি; তোমার স্বামীকে আজ্‌কালকার বিষময় পাশ্চাত্য সভ্যতাস্রোতে ভাসাইয়া—গন্ধেশকে জ্ঞানশূন্য করাইয়া হৃদয়ই রমেশের পরামর্শে এই কাজ করিয়াছে; তোমার ন্যায় গৃহোদ্যানের সুন্দর যূথিকাকুসুমটীকে বৃন্তচ্যুত করিয়া দেশান্তরে উড়াইয়া আনিয়াছে। তাহার পর পদ্মার চড়ায় পাইয়া আমিই কুড়াইয়া আনিয়াছি এবং এতদিন সেই ক্ষুদ্রযূথিকার নির্ম্মল পরিমল উপভোগ করিয়াছি; কিন্তু আজ আমার সেই উপভোগ শেষ হইল—আজ আমি তোমাকে ফেলিয়া চলিলাম। যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তোমাকে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি, তুমি আজীবন সেই পদে মতি রাখিয়া তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিও; তাহা হইলে দেখিতে পাইবে—পরিণামে আবার আমরা একত্র মিলিত হইব”।

ব্রহ্মচারী কহিলেন “ইহা ত তোমার পার্থিক পরিচয়! স্বর্গীয় পরিচয় ত কিছুই দিলে না; তাহা আমিই দিতেছি। মা জ্ঞানদা! ইনি সুরবালা দেবকন্যা মায়ার সহচরী! যে মায়াদেবীর মায়ামন্ত্রে এই জগত বিমুগ্ধ, ইনিই সেই মায়ার প্রধানা সহচরী! ইনিই মায়াদেবীর আজ্ঞায় সংসারকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখেন। জীবের ভাগ্য-চক্র—জীবের শেষদশা প্রভৃতি কিছুই জীবকে মনে করিতে দেন না; কেবল স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায়, আত্মীয়কুটুম্বের মঙ্গলচিন্তায় জীবকে ঘুরাইয়া রাখেন ও রোগ শোকাদির যাতনা দিয়া কঠোর শাস্তি দেন। আমার গুরুদেব সেই স্বর্গের দেব-পুরুষ বা মর্ত্ত্যের মহাপুরুষকে ইনিই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সংসারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনিই ইহাকে মর্ত্ত্যে মানবী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের মায়ায় নিজেই জড়ীভূত হইতে অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই মায়াসহচরী শাপগ্রস্তা হইয়া মহর্ষির চরণে কাঁদিয়া পড়িলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন হইবে না—নিশ্চয়ই ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং নিজ ফাঁদে পড়িয়া পাগলিনী হইতে হইবে; তবে, মর্ত্ত্য মধ্যস্থ এক প্রকার নরক ভোগ হইলেই উদ্ধার হইয়া আবার স্বর্গে আসিয়া মায়াদেবীর পার্শ্বে স্থান পাইতে পারিবে। তাই এই মায়া-সহচরী ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া মায়া নামে পরিচিতা হইয়া মায়া-ফাঁদে

পড়িয়াছিল; তাই এই দেবকন্যার কপালে মানুষ স্বামীর সহবাস ঘটে নাই, অথচ পতির মায়ায় পড়িয়া অনেক ছুটাছুটী করিতে হইয়াছে। শেষে পিতা মাতার শোকে—পতিবিরহে পাগলিনী হইয়াই অবশিষ্ট কাল কাটাইতে হইয়াছে। আমার গুরুদেবের মুখে এই সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই পদ্মার চড়ায় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং এখানে আসিলে আমিই মায়াকে রক্ষা করিয়া, ইহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া ইহার গুরুপদে বরণ হইয়াছিলাম। ইহাকে আরও বলিয়াছিলাম যে, 'তোমার নাম আর এখন কেহই জানে না—তুমি এখন পাগ্‌লী নামে পরিচিতা হইয়াছ, তোমার আচার ব্যবহারে জগতের লোক এখন তোমাকে পাগ্‌লী বলিয়া ডাকিবে, আমিও এখন তাহাই বলিব। তবে যেদিন তোমাকে তোমার নাম ধরিয়া ডাকিব, সেইদিন জানিও যে তোমার আয়ুকাল পূর্ণ হইবে এবং সেইদিন তোমার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া তুমি মুক্তি পাইবে'। এক্ষণে মর্ত্ত্যমধ্যস্থ চাবাগানরূপ সকল নরক ভোগ হইয়া গেল, ইহার মুক্তির পথও পরিষ্কৃত হইল। তাই আমি ইহার প্রতীক্ষায় এই শবের উপর বসিয়া আছি। তাই আমার মুখে 'মায়া' নাম শুনিবামাত্রই মায়া পাগ্‌লী বেশ ছাড়িয়া অন্ত-বেশধারিণী। যে পাষণ্ড কুলীসংগ্রহকারক হৃদয়প্রসন্ন জানদার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছিল, ইহা তাহারই মৃত দেহ! দুরাত্মা আবার কতকগুলি কুলী চালান দিয়া নৌকাযোগে এই পথ দিয়া যাইতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে; এখানে উহার মৃত দেহ দেখিয়া আমিই টানিয়া লইয়া উহার উপর বসিয়াছি"।

মায়া কহিলেন "প্রভো! তবে ত উহার শাস্তি যথেষ্ট হইল, উহার মৃতদেহ শৃগাল শকুনীতে না খাইয়া কি প্রভুর আসন রূপেই পরিণত হইল?" ব্রহ্মচারী কহিলেন "প্রাণ বিয়োগ হইলে দেহের সহিত আর তাহার সম্বন্ধ কি? আত্মাই পরলোকে কর্ম্মানুসারে শাস্তি পাইবে। মৃতদেহ আর আমার স্পর্শে কি পুণ্য-লাভ করিবে?"

জানদা কহিল "দিদি! এতদিনে আমার ভ্রম ঘুচিল—এতদিনে জানিলাম যথার্থই তুমি দেবকন্যা! যাও দেবি! দেবধামে গিয়া দেব-মায়া বিস্তার কর, অধিনীর অনুরোধ যেন আমি আর মায়ায় আকৃষ্ট না হই"। মায়া কহিলেন, "না বোন্, তুমি কখনই মায়া-ফাঁদে পড়িবে না; তবে যেমন পতি-ভক্তি তোমার অন্তরে আছে, সেইরূপ যেন আজীবন থাকে; পতির প্রতি অচলা ভক্তি না থাকিলে স্ত্রীলোকের কোন পুণ্যই লাভ হয় না! একদিন একমুহূর্ত্ত

আমি তোমার রমেশ দাদার প্রতি ঘৃণার চক্ষে চাহিয়াছিলাম বলিয়াই আমারও কপালে নকল নরক ভোগ ঘটিল। আমি তোমার পতিভক্তির পরীক্ষা কথা-স্থলে অনেকবার লইয়াছি, সেইরূপ যেন চিরদিন থাকে।”

ব্রহ্মচারী কহিলেন “মায়া! যে দিন তুমি আমার নিকট দীক্ষিতা হও, সেদিন তুমি আমার এবং আমার গুরুদেবের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলে; তখন আমি তোমাকে এক সময়ে পরিচয় দিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম; আজ সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। বলিতে লজ্জা করে—আমি তোমার স্বামী রমেশের বাল্য-প্রণয়িনী মোহিনীর পিতা! সেই মথুর চাটুর্য্যে! মনের ক্লেশে দেশে দেশে সাধু উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতে ছিলাম; পরে নৈমিষারণ্যে সেই মহর্ষির দর্শন পাইয়া তাঁহারই চরণে লুটাইয়া পড়িলাম। তিনিই আমাকে দীক্ষা দিয়া এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন; তাঁহারই কৃপা-বলে আমি ভগবত্তত্ত্ব অনেক অবগত হইয়াছি। পরে জানিতে পারিলাম তিনি সামান্য মানব নহেন; তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবানের একজন পার্ষদ—নাম সুবাহু। নন্দ সুনন্দাদির সহিত ইনিও বিষ্ণুর পার্শ্বে সর্ব্বদা থাকিতেন; কোন বিশেষ অপরাধের জন্য শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যপ্রদেশে সন্ন্যাসীবেশে বিরাজ করিতেছেন; ইনি এখন মর্ত্ত্যে মহর্ষি দেবসখা নামে পরিচিত আছেন। পাপভারগ্রস্তা বসুমতীর দারুণ দুঃখ দূর করাই ইহার একান্ত বাসনা—ধর্ম্ম জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই ইহার দৃঢ় সঙ্কল্প! মধ্যে মায়া সহচরী ইহাকে সংসারী করিবার চেষ্টা করায় ইনি দেবর্ষি নারদের শরণাগত হইয়া সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন; তাই নারদকে সে সময় তিনি গুরু বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে ইনি নারদের মন্ত্রণায় তাহার জন্য তোমার অথবা মায়া সহচরীর যে দুর্গতি করিয়াছেন, তাহা ত তুমি স্বয়ংই স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সে সমস্ত জানিতে পারিলে। এখন মনে প'ড়ছে কি?”

মায়া কহিল “প'ড়েছে বৈ কি। নচেৎ আর আমি এখন আপনাদের পরিচয়ের জন্য তত উৎসুক ছিলাম না কেন? আমি এখন আর জিজ্ঞাসা না করিলেও আপনি বলিতেছেন।”

ব্রহ্মচারী কহিলেন “আমি প্রভুর আশ্রয় লইলে, মহর্ষি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, “তুমি কর্ম্মময় সংসার হইতে নূতন আসিয়াছ, কর্ম্মের অভ্যাস তোমার এখনও যায় নাই; আমার আদেশ মত কোন কোন কর্ম্ম এখনও তোমাকে করিতে হইবে। পরে তুমি তপশ্চারণে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে।’

তখন আমি তাঁহাকে কহিলাম প্রভো! আমার জন্য এখনও কি কি কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে? • প্রভু তখন তোমার জন্য পদ্মার চরে কুটীর নির্ম্মাণ, তোমাকে দীক্ষা দিয়া তোমাকে সাবধানে রক্ষা করা, তোমার নিকট হইতে যে রত্ন পাওয়া যাইবে, তাহাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করা প্রভৃতিই আমার উপস্থিত কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিলেন। এখন আমি তাঁহার সকল আদেশ পালন করিয়াছি; কেবল জ্ঞানদাকে প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারিলেই আমার উপস্থিত কর্ম্ম শেষ হয়, পরে আবার যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ করিয়া তাঁহারই শিক্ষামত যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইব।"

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রী হইয়া পড়িল; অদূরবর্ত্তী ঘাটে কত লোক আসিল—কত লোক চলিয়া গেল, ব্রহ্মচারী সেই শবের উপর বসিয়াই মায়া ও জ্ঞানদাকে আপনাদের আত্মকাহিনী কহিতেছেন; এমন সময়ে সহসা মায়ার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একে কয়দিনের পথশ্রান্ত, তাহার উপর অনাহার, তাহাদের উভয়েরই দারুণ ক্লেশ হইয়াছে; কিন্তু মায়ার শরীর যেন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। যত রাত্রী হইতে লাগিল, ততই তাহার যাতনাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ক্রমে রজনী শেষ হইয়া আসিল; সপ্তর্ষিমণ্ডল পশ্চিমাকাশে লীন হইয়া গেল, আকাশের অন্যান্য অসংখ্য নক্ষত্রাবলীও যেন কোথায় পলায়ন করিল; পূর্ব্বাকাশ ক্রমে উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল—কোকিল ডাকিয়া উঠিল। উষার সমীরণ সদ্য বিকশিত নলিনীদল কম্পিত করিয়া ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল; সেই পবনে নদী-বক্ষে লহরীমালা উত্থিত হইয়া অসাধারণ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই শোভা—সেই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মায়া অবসন্ন-দেহে জ্ঞানদার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সেই নদী-সৈকতেই শয়ন করিল। এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারীর গুরুদেব মর্ত্ত্যের মহর্ষি দেবসখা বা স্বর্গের সুবাহুদেব আসিয়া তথায় দাঁড়াইয়াই কহিলেন "যাও মা! দেবধামে গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আবার দেবমায়া বিস্তার কর! আমি ক্রোধান্ধ হইয়াই তোমাকে জঠর যাতনা দিয়া মানবীজন্ম গ্রহণ করাইলাম এবং অশেষ ক্লেশ দিলাম; তাহাতে কিছু মনে করিও না মা! জানিও সকলই বিধির খেলা"! কথা শুনিবা মাত্রই মায়া ঊর্দ্ধনেত্রে একবার তাঁহারদিকে চাহিল—কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িল! আর কিন্তু তাহার পল্লব পড়িল না। এই বারই তাহার প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন

করিল। জ্ঞানদার কোলে মুখখানি রাখিয়া মায়া মরিয়া গেল—পাগ্‌লী নাম বিলুপ্ত হইল—মায়া মানবীমায়া, মানবীকায়া ছাড়িয়া দিব্যধামে দিব্যবেশে মায়া-সহচরী হইয়া মায়াজাল বিস্তার করিতে চলিয়া গেল।

ক্রমে উষার ঘোর কাটিয়া গেল—পরিষ্কার প্রভাত হইল; পুলিনপ্রদেশ আলোকিত হইল! প্রভাত-পবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা অপূর্ব্ব ক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই সমীরণে সৈকত-শয্যা-শায়িনী মৃত-কলেবরা মায়ার নিষ্প্রভ বদনসংলগ্ন কেশরাজী দুলিয়া দুলিয়া অপরিসীম শ্রী ধারণ করিল! জ্ঞানদা কি জানি কেমন একপ্রকার ভোলা মনে পাগলিনীর ন্যায় একবার পাগ্‌লীর মুখের-দিকে—একবার ব্রহ্মচারীর চরণে একবার নদীবক্ষে—একবার মহর্ষির পাদপদ্মে চাহিতে লাগিল! তাহার হৃদয়মধ্যে যেন একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। একদিকে আশ্রয়-লতিকা স্বরূপ কনকপ্রতিমা মায়ার মরণ—অন্যদিকে নূতন সহকার-তরু শ্রীগুরুর শ্রীচরণ! একদিকে মায়ার মরণে একাকিনী হইয়া অনন্যোপায়—অন্যদিকে মহর্ষি বা সন্ন্যাসীরূপে স্বর্গের দেবতা সহায়! এবম্বিধ উভয় ভাবনায় জ্ঞানদার হৃদয় তন্ময় হইয়া উঠিল; ভাবাবেশে সে আত্মবিস্মৃতা হইয়া পড়িল!

এমন সময় সন্ন্যাসী কহিলেন "জ্ঞানদা! মা! তুমি আজ হইতে আমার শিষ্যা হইলে—আমি তোমার গুরু হইলাম। আজি হইতে তোমার ভব-যাত্রা আমা হইতেই নির্ব্বাহিত হইবে—তোমার সাধনার পথ আমা হইতেই পরিষ্কৃত হইবে।" জ্ঞানদা ক্রোড় হইতে মায়ার মস্তক নীচে রাখিয়া গললগ্নী-কৃতবাসে সন্ন্যাসীর পাদমূলে পতিত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল; সেই দেব-পদস্পর্শে তাহার সর্ব্ব শরীর যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং তাহার বিষাদ-ক্লিষ্ট কালিমা-ছায়াবেষ্টিত অলোকসামান্য লাবণ্য-জ্যোতি যেন বায়ুস্পর্শে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ বিভাসিত হইল।

তখন ব্রহ্মচারী কহিলেন "প্রভো! এক্ষণে আমার প্রতি কি আদেশ হয়?" মহর্ষি কহিলেন "তোমার কর্ম্মযোগ দেখিয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি; শীঘ্রই তোমার ধর্ম্মযোগের ব্যবস্থা হইবে। এক্ষণে আর কয়েকটী কর্ম্ম আছে, তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই সকল দিকে সুবিধা হইবে। দেখ, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই পক্ষে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; পিতা গগন হইতেও উচ্চ; আর কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষে, ইহা ছাড়াও আর একটী প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন—যিনি তাহার স্বামী! সংসারী পুরুষগণ জনক জননীর সেবা না

করিলে এবং জন্মভূমির প্রতি ভক্তি না করিলে তাহাদের ধর্ম্মলাভ হয় না। স্ত্রীলোকের এই তিনের উপর অচলা ভক্তি থাকাও আবশ্যক এবং পতিপদ পূজা করিয়া পতিকেই ঈশ্বর জ্ঞান করা উচিত। নতুবা কোন পুণ্যই লাভ হয় না—শতসহস্র ধর্ম্মাচরণ করিলে এবং ঈশ্বর আরাধনা করিলেও কোনই ফল পাওয়া যায় না। তাই বলি, মথুর! তোমার ও জ্ঞানদার দুই জনেরই জন্মভূমি এক স্থানে। তোমরা উভয়ের মধ্যে কেহই আসিবার সময় জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ কর নাই; আর সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার জন্মভূমি দর্শন নিতান্তই প্রয়োজন? বিশেষতঃ জ্ঞানদা পিত্রালয় দর্শনাভিলাষেই প্রথমে স্বামী-গৃহ হইতে স্বামীর সহিত বাহির হইয়াছিল সেই জন্য তোমাদের উভয়কেই একবার গণেশপুর যাইতে হইবে। তোমার পিতা নাই; জগৎপিতাই এখন তোমার পিতা, তাঁহাকে ভক্তি করিলেই এখন তোমার পিতৃভক্তির পরিচয় দেওয়া হইবে। জ্ঞানদার পিতা এখনও জরাজীর্ণ, এবং শোকাতুর অবস্থায় বর্ত্তমান? তাঁহাকে কৌশলে সঙ্গে লইয়া আসিতে হইবে; কারণ এই বৃদ্ধাবস্থায় আর তাঁহার কেহ নাই, জ্ঞানদাই এখন তাঁহাকে কাছে রাখিয়া সেবা ভক্তি করিবে; নতুবা তাহার ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে না। তোমাদের উভয়েরই মাতা নাই; ধরণীই এখন তোমাদের জননী! তোমাদের জননীর পরমাণু পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতেই মিশিয়াছে—আর বসুমতীই এখন তোমাদের ক্রোড়ে ধরিয়া প্রতিপালন করিতেছেন। জননী ধরণীকে পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিও না।

তাহার পর জ্ঞানদার আর একটী মহৎ কর্ত্তব্য আছে; নারী জাতির পতিই ঈশ্বর—পতিই দেবতা! স্বামী-সেবা করিয়া—স্বামীকে ঈশ্বর ভাবিয়া পতিপদ-পূজা না করিলে ভগবানকে প্রসন্ন করা যায় না। জ্ঞানদাকে সঙ্গে লইয়া নারায়ণপুর গিয়া কোন যাদুমন্ত্র বলে উহার স্বামীকেও সঙ্গে আনিতে হইবে; নতুবা উহার কোন কার্য্যই সিদ্ধি হইবে না। স্বামী ছাড়িয়া যতই ধর্ম্মাচরণ করিবে, কোনটীই সম্পূর্ণ হইবে না।

তোমরা জন্মভূমি দর্শন করিয়া জ্ঞানদার পিতা ও পতিকে সঙ্গে লইয়া আমার সহিত শ্রীক্ষেত্রে গিয়া সাক্ষাৎ করিবে; তাহাতে যদি মাসাধিককালও বিলম্ব হয়, তাহার জন্য কোন ক্ষতি হইবে না; আমি এখন জগন্নাথজীর কাছে অনেক দিন থাকিব—তোমরা না গেলে আমি ফিরিতেছি না। মথুর! এইবার তোমার কর্ম্মযোগের কঠিন পরীক্ষা? এইবার তোমার ক্ষমতার পরিচয় বিশেষ-

রূপ পাইব। এই কার্য্যান্তেই তোমাকে আর কর্ম্মকাণ্ডে ঘুরিতে হইবে না— তুমি আমার আশ্রমে বসিয়া আমার আদেশমত উপাসনা যোগসাধনাদি সম্পন্ন করিতে পারিবে।

তুমিও আমার শিষ্য—এখন জ্ঞানদাও আমার শিষ্যা হইল; তোমরা ভাই ভগ্নীর মত দুইজনে সত্বর কার্য্য-সাধনে চলিয়া যাও; আমি মায়ার মৃতদেহ এই স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটী ক্ষুদ্র মন্দির গাঁথাইয়া দিয়াই শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া যাইব। পরে এই স্থানের নাম মায়াতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন "প্রভো! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য! আপনি যে ধর্ম্ম বল দিয়াছেন, তাহাতে আমার আর কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে। দেখুন, ঐ চরণের কৃপায় কতদূর কৃতকার্য্য হই।" সন্ন্যাসী তখন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জ্ঞানদাকে কহিলেন "বৎস! বাল্যকাল হইতেই তোমার হৃদয় বিনয় ও শিষ্টাচার, দয়া ও দাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রভৃতি সকল গুণেরই আকরস্থান, হৃদয়ের গুণে, চরিত্রের বলে ও পুণ্যের প্রভায় তুমি মানবী হইয়াও দেবীকে জয় করিয়াছ! কিন্তু এই পাপ-সংসার তোমাকে চিনিতে পারে নাই; তাই তুমি সংসার হইতে চির বিদায় লইয়াছ—সংসারের দিকে আর তোমার একবারও যাইতে ইচ্ছা নাই! যেটুকু মায়া তোমার অন্তরে অবশেষে অবশিষ্ট ছিল, এই মায়ার মরণে সেই মায়াও মরিয়াছে; কি করিব মা! যদিও আমি তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছি বটে, কিন্তু আশ্রম-ধর্ম্মের সহিত তোমার এখনও সংস্রব রহিয়াছে; সেইজন্য আপাততঃ তোমাকে বনবাসে ব্রহ্মচর্য্যও পালন করিতে হইবে এবং পিতা ও পতিসেবা করিয়া আশ্রমের ধর্ম্মও রক্ষা করিতে হইবে; পরে যাহা কর্ত্তব্য হয়, ভবিষ্যতে তাহা করা যাইবে।

এক্ষণে যাও মা, স্নান করিয়া এস, আমি তোমার বাহুতে অক্ষয় কবচ বাঁধিয়া দিই, ইহাতে রণে বনে, অনলে অনিলে কিছুতেই শঙ্কা থাকিবে না, হিংস্রক জন্তুগণও মিত্রভাবে তোমার সহিত ব্যবহার করিবে। বাহুতে এই কবচ ধারণ করিয়া—হৃদয় মাঝে সেই সারসম্পত্তি সতীত্ব ও পাতিব্রত্য রত্ন যত্নে রক্ষা করিয়া—তোমার ব্রহ্মচারী দাদার সহিত গিয়া সত্বর আমার আদেশ পালন কর। বারেকের জন্য মাতৃভূমি সন্দর্শন—জন্মের মত জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ—পিতা ও পতিসহ পুনরাগমন—এখন তোমার নিতান্তই প্রয়োজন! শীঘ্র কর সেই আয়োজন, ভাব সেই ভগবচ্চরণ, সেই উদ্দেশ্যে কর গমন, অকারণ ভেবনা আর এই—**মায়ার মরণ!**

ঊনবিংশ অধ্যায়।

গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত।

সন্ন্যাসীর আদেশে ব্রহ্মচারী ও জ্ঞানদা বহুদিন পরে আবার সাধের জন্মভূমি দেখিতে যাইতেছেন; তাহাতে উভয়ের মনে হর্ষ বা বিষাদ কিছুই নাই। সকলই তাঁহারা গুরুপদে সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষায় হৃদয়কে অভ্যস্ত করিতেছেন। যদিও প্রথমেই গণেশপুর যাইলে তাঁহাদের পথ সোজা হইত, কিন্তু অগ্রে তাঁহারা নারায়ণপুরের কার্য্য শেষ করাই স্থির করিলেন।

অবশেষে তাঁহারা নারায়ণপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইয়া একটী অশ্বথবৃক্ষমূলে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন জ্ঞানদা কহিল "আপনি ত জ্যোতিষশাস্ত্র সুন্দররূপ শিক্ষা করিয়াছেন, এখন বলুন দেখি, আমার স্বামী কি অবস্থায় আছেন?" ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ গণনা করিয়া কহিলেন "তোমার স্বামী এখন পাগল অবস্থায় আছেন।"

জ্ঞানদা। আরাম হইবেন কি?

ব্রহ্মচারী। না—কখনই না।

জ্ঞানদা। আপনি এ সকল ত খুব শীঘ্র বলিলেন, তবে শুনিয়াছি যে জ্যোতিষ বড় কঠিন শাস্ত্র।

ব্রহ্ম। যে জানে, তার পক্ষে সকলই সহজ।

জ্ঞানদা। আমি কি জানিতে পারিব না?

ব্রহ্ম। বুঝিয়াছি দিদি, আমার নিকট এখনই তোমার জ্যোতিষ জানিবার বাসনা হইয়াছে; কিন্তু এই শাস্ত্র অতি বৃহৎ ও বিস্তৃত, একদিন বা একমুহূর্ত্তে ইহার কতটুকুই বা জানিবে? পরে মহর্ষির নিকট বিশেষরূপ শিক্ষা করিয়া সেই স্বনামখ্যাত স্ত্রী জ্যোতিষী খনার ন্যায় জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। আপাততঃ আমি ইহার সংক্ষিপ্ত বা মোটামুটী ভাবটুকু তোমাকে বলিতেছি—মনে করিয়া রাখিবে—

প্রত্যেক মানবের জন্ম নক্ষত্রানুসারে দ্বাদশরাশীর মধ্যে এক একটী রাশী হয়; সেই সেই রাশীতে নবগ্রহের এক এক গ্রহ এক এক সময় ভোগ করিয়া সুফল কুফল দিয়া থাকে। ১ মেষ, ২ বৃষ, ৩ মিথুন, ৪ কর্কট, ৫ সিংহ, ৬ কন্যা, ৭ তুলা, ৮ বৃশ্চিক, ৯ ধনু, ১০ মকর ১১ কুম্ভ ও ১২ মীন, এই দ্বাদশ রাশী। আর ১ রবি, ২ চন্দ্র, ৩ মঙ্গল, ৪ বুধ, ৫ বৃহস্পতি, ৬ শুক্র, ৭ শনি,

৮ রাহু ও ৯ কেতু, এই নবগ্রহ। ২৭টী নক্ষত্রের প্রত্যেক ২। সওয়া দুইটীতে জন্মিলে এক এক রাশী হইয়া ১২টী রাশী হয়। যেমন অশ্বিনী ও ভরণী এই দুই এবং কৃত্তিকার সিকি ভাগে জন্ম হইলে মেষ রাশী হয়, আবার কৃত্তিকার বাকী বারো আনা ভাগ, রোহিণী পূরা ও মৃগশিরার অর্দ্ধ এই সওয়া দুই নক্ষত্রে জন্মিলে বৃষ রাশী হয়। এইরূপ পর পর মোট সওয়া দুই নক্ষত্রে জন্মিলেই বারোটী রাশীর পর পর এক এক রাশী হয়। প্রত্যেক রাশীরই সাধারণ ফল ভাল মন্দ গুণে মিশ্রিত আছে, তবে এক এক গ্রহ ভোগ কালে রাশী সকলের সুখ দুঃখের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রত্যেক রাশীতে কোন্ গ্রহ কতদিন ভোগ করে ও কে কিরূপ ফল দেয়, তাহা পঞ্জিকা দেখিলেই ঠিক পাওয়া যায়। কোন্ গ্রহের অধিপতি কে এবং কাহার কোন্ সময় বক্র বা সরল দৃষ্টি ও তাহাতে রাশীর যে ফলভোগ তাহাও পঞ্জিকাতে লেখা থাকে। সে সকল বিষয় পরে পঞ্জিকা দেখিয়া বুঝিতে পারিবে।

সমস্ত মানব-জীবনের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে হইলে, জন্ম নক্ষত্রানুসারে প্রথমে রাশীচক্র ঠিক করিতে হয়; তাহা হইতে কোন্ লগ্নে জন্ম, এবং জন্ম-কালে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশীতে অবস্থিত ছিলেন, এই গুলি ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কোন্ দশার কত অংশে জন্ম, কাহার ক্ষেত্রে, কাহার হোরায়, কাহার দ্রেক্কণে, কাহার নবাংশে কাহার দ্বাদশাংশে এবং কাহার ত্রিংশাংশে জন্ম তাহাও ঠিক করিতে হইবে এই সকল দ্বারাই চিরজীবনের ফলাফল নির্ণীত হইয়া থাকে; কাহার কোথায় কোন্ অরিষ্ট আছে—কাহার কয়টী ফাঁড়া আছে—কাহার কোন্ সময় সুখে বা দুঃখে যাইবে—কাহার কোথায় পাপগ্রহ বা শুভগ্রহের দৃষ্টি আছে—কাহার মৃত্যু কোন্ তারিখে এই সকল বিষয় ঠিক গণনা করিয়া কোষ্ঠীতে লিখিতে পারা যায়। এক এক গ্রহ হোরাধিপতি, যামার্দ্ধাধিপতি, দ্রেক্কণাধিপতি, ক্ষেত্রাধিপতি প্রভৃতি হইয়া এক এক রাশীতে এক এক রূপ ফল দেন। এই সকল গুরুতর বিষয় পরে মহর্ষির নিকট ভালরূপ শিখিতে পারিবে। তিনি যোগাভ্যাসের পূর্ব্বেই উত্তমরূপে জ্যোতিষ শিখাইয়া দেন।

গ্রহগণের দশা বা তাহার অন্তর্দশা ভোগ-কালেই জীবনের ফলাফল সর্ব্বা-পেক্ষা সম্যক্ উপলব্ধি হয়। কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা এই তিন নক্ষত্রে জন্ম হইলে রবির দশা; আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা এই চারি নক্ষত্রে চন্দ্রের দশা; মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী এই তিনে মঙ্গলের দশা; হস্তা,

চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা এই চারিতে বুধের দশা; পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণা এই তিনে বৃহস্পতির দশা; উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী এই চারিতে শুক্রের দশা; অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা এই তিনে শনির দশা, এবং ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্র পদ এই তিন নক্ষত্রে জন্মিলে রাহুর দশা। জন্ম-কাল হইতে রবির দশা ৬ ছয় বৎসর, চন্দ্রের ১৫ পনেরো, মঙ্গলের ৮ আট, বুধের ১৭ সতেরো, বৃহস্পতির ১৯ উনিশ, শুক্রের ২১ একুশ, শনির দশা ১০ দশ ও রাহুর ১২ বার বৎসর থাকে।

দশার ফল—'সূর্য্যোপপ্লব ভৌমার্কি-দশাতিকষ্টদানৃণাং।
গুরুজ্ঞ চন্দ্র শুক্রাণাং যথেপ্সিতফলপ্রদা॥'

অর্থাৎ রবি, রাহু, মঙ্গল ও শনির দশা অতিশয় কষ্টদায়ক হয়; আর চন্দ্র, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্রের দশা অভিলষিত ফল ও সুখদায়ক হয়। দশা-ফলের এই সংক্ষিপ্ত ভাবটী এখন জানিয়া রাখ; পরে শিক্ষার সময় প্রত্যেকের দশাতে কি কি সুখ ও কি কি দুঃখ পাওয়া যায়, তাহা তখন বেশ বুঝিতে পারিবে।

এই স্থুল দশা অপেক্ষা অন্তর্দ্দশার ভোগ-কালে কপালের ফলাফল অধিকতর সুস্পষ্ট জানা যায়। যে দশার মধ্যে যাহার অন্তর্দ্দশা ঠিক করিতে হইবে, সেই দশার ভোগ যত বৎসর হয়, সেই অঙ্ককে তাহার ভাগাঙ্ক দিয়া গুণ করিবে; এই গুণ-ফলকে ৯ নয় দ্বারা ভাগ করিলে যত ভাগফল থাকে, তত মাস তাহার অন্তর্দ্দশা। আবার জন্মকালীন লগ্নের প্রথম হইতে দ্বাদশ স্থানের যে স্থানে যে গ্রহ থাকে, সেই গ্রহ সেইরূপ সুফল কুফল দিয়া থাকে।

জ্ঞানদা কহিল "এই সকল রাশীচক্রানুসারে মানবের জন্মমৃত্যু ও ফলাফল এখন এত তাড়াতাড়ি বুঝা যাইবে না; আপনি আমাকে সাধারণ গণনা ও করকোষ্ঠী দর্শন এই দুইটী বলিয়া দিন।" ব্রহ্মচারী কহিলেন "বেশ কথা, তাহাই বুঝাইয়া দিব। সাধারণ গণনা করিতে হইলে আগে লগ্ন ঠিক করিয়া লইতে হইবে। রাশির নামানুসারে লগ্নও দ্বাদশটী। এক দিবা রাত্রিতে এই ১২টি লগ্নের উদয় হয়। যে মাসের যে রাশী, সেই লগ্নে সূর্য্য উদয় হইয়া উহার সপ্তম লগ্নে অস্তে যায়। অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মেষ রাশী, সেই জন্য ঐ মাসে মেষ লগ্নে সূর্য্য উদয় হইয়া তুলা লগ্নে অস্ত যায়। এইরূপ প্রত্যেক মাসের হিসাব ধরিতে হয়। যে মাসের যে রাশী, তাহা পঞ্জিকাতেই আছে।

তারপর এক দিন রাত্রি অর্থাৎ ৬০ দণ্ডের মধ্যে প্রথম ৪ দণ্ড ৭ পল মেষ

লগ্ন, পরে ৪ দণ্ড ৪৯ পল ৪০ অনুপল বৃষ লগ্ন, ৫।২৮।৪০ মিথুন লগ্ন, ৫।৪০।৪০ কর্কট, ৫।৩৩ সিংহ, ৫।২৯ কন্যা, ৫।৩৭ তুলা, ৫।৪০।২০ বৃশ্চিক, ৫।১৭।২০ ধনু, ৩।৩৩।২০ মকর, ৩।৫৭ কুম্ভ এবং ৩।৪৭ মীন লগ্ন। দিবা রাত্রির মধ্যে যে সময়ে প্রশ্ন করা হয়, সেই সময় কোন্ লগ্নের উদয়, তাহা এই সময় ভাগ দেখিলেই বুঝা যাইবে। এবং সেই লগ্নের গণনা অনুযায়ী ফল নির্ণয় হইবে।

এই লগ্ন তিন ভাগে বিভক্ত। চর, স্থির এবং দ্ব্যাত্মক; মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর চর লগ্ন; বৃষ, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও সিংহ স্থির লগ্ন; মীন, মিথুন, কন্যা ও ধনু দ্ব্যাত্মক লগ্ন। চর লগ্নে প্রশ্ন হইলে প্রশ্নের বিষয় বিফল হয়, স্থির লগ্নে হইলে সিদ্ধ হয় এবং দ্ব্যাত্মক লগ্নের প্রথম ভাগে হইলে সিদ্ধ এবং শেষ ভাগে প্রশ্ন হইলে অসিদ্ধ হইবে; উক্ত ৬০ দণ্ডের মধ্যে বারটী লগ্নের বিভাগ অনুসারে এই তিন লগ্নের সময় ঠিক বুঝা যাইবে।

তাহার পর সকল বিষয়ই গণনা করিবার একটী সাধারণ সঙ্কেত শিখাইয়া দিতেছি। এই সঙ্কেত দ্বারা জয় পরাজয়, জীবনমৃত্যু, আয় ব্যয়, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি সমস্তই বলিতে পারা যায়। যেরূপ প্রশ্ন হইবে, সেই প্রশ্ন-টীতে যতগুলি অক্ষর থাকিবে, সেইগুলি গণিয়া যত হইবে, তাহাকে ছয় দিয়া গুণ করিবে; গুণফল যত হইবে, তাহাতে ৮ যোগ করিয়া ৯ নয় দিয়া ভাগ করিবে। ভাগ করিলে যাহা বাকী থাকিবে সেই সময়ের অধিপতি সেই গ্রহ ধরিতে হইবে; অর্থাৎ ১ বাকী থাকিলে রবি, ২ থাকিলে সোম, ৩ থাকিলে মঙ্গল, ৪ থাকিলে বুধ, ৫ থাকিলে বৃহস্পতি, ৬ থাকিলে শুক্র, ৭ থাকিলে শনি, ৮ থাকিলে রাহু এবং ০ শূন্য থাকিলে কেতু। সোম শুক্র ও বুধ বৃহস্পতি ইহারা শুভগ্রহ অর্থাৎ শুভফল দেয়—কার্য্যসিদ্ধি করে। শনি মঙ্গল, রাহু কেতু ও রবি ইহারা অশুভ ফল দেয় অর্থাৎ কার্য্য নাশ করে। তুমি একটী প্রশ্ন কর, আমি তাহার উত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।"

জ্ঞানদা কহিল "আমার চিন্তিত বিষয় সিদ্ধ হইবে কি না?" ব্রহ্মচারী কহিলেন "তোমার প্রশ্নে মোট ১৬ ষোলোটী অক্ষর আছে, ইহাকে ৬ দিয়া গুণ করিলে ৯৬ ছেয়ানব্বই গুণফল হইল; ইহাতে ৮ আট যোগ করিলে ১০৪ হয়; ১০৪ কে ৯ দিয়া ভাগ করিলে ৫ পাঁচ বাকী থাকে। সুতরাং ঐ সময়ের অধিপতি অর্থাৎ পাঁচে বৃহস্পতি। ইনি শুভগ্রহ, অতএব চিন্তিত বিষয় নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। ইহার মধ্যে আবার একটু ঘোর আছে; যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, 'আমার জ্বর হইয়াছে, সে কি মরিবে?' এই ১৪ অক্ষরকে

৬ দিয়া গুণ করিলে ৮৪ হয়, তাহাতে ৮ যোগ করিলে ৯২ হয়; ইহাকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে ২ বাকী থাকে; অতএব গ্রহাধিপতি সোম বা চন্দ্র হইল। এ স্থলে ইনি শুভগ্রহ হইলেও অশুভ ফল দিতেছেন; কারণ প্রশ্ন হইয়াছে—মরিবার বিষয়, সুতরাং মরিবার বিষয়ে শুভফল দিলে মরণ নিশ্চয়ই হইবে। যদি 'বাঁচিবে কি না?' এরূপ প্রশ্ন হইত, আর তাহাতে এই চন্দ্র গ্রহাধিপতি হইত, তবে সে নিশ্চয়ই বাঁচিত।" —

জ্ঞানদা কহিল "আমার গঙ্গাজল বামার কি কোনও অসুখ হইয়াছে?" ব্রহ্মচারী কহিলেন এই একুশ অক্ষরকে ৬ গুণ করিয়া ৮ যোগ পূর্ব্বক ৯ দিয়া ভাগ করিলে ৮ বাকী থাকে। ৮ এ রাহু গ্রহাধিপতি। সুতরাং অশুভ ফল দেয়। অসুখের প্রশ্নতে অশুভ হইলে সুখেই আছে স্থির হইবে। সুখে আছে কি না প্রশ্ন হইলে অসুখ বা অশুভ বুঝাইত। অশুভ গ্রহও প্রশ্নের ভাব অনুসারে শুভফল দেয়, আবার শুভগ্রহও অশুভ ফল দেয়। এইরূপ সন্ধি না বুঝিয়া গণনা পূর্ব্বক উত্তর দিলে, জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এখন নির্ভুল গণনা হয় না বলিয়াই অনেক শিক্ষিত মহাপুরুষ জ্যোতিষকে অগ্রাহ্য করেন। নতুবা জ্যোতিষ কখনই মিথ্যা হইবার নহে। আবার এই সমগ্র প্রকাণ্ড জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে এই প্রশ্ন গণনার সঙ্কেতটীই সার সামগ্রী। কারণ ইহা দ্বারা সকলই গণনা করা যায়। যদিও সন্তান গণনা, গমন গণনা প্রভৃতি অনেক পৃথক্ গণনা আছে এবং ফুল বা ফলের নাম করিতে বলিয়া তাহা দ্বারাও অনেক গণনা আছে, কিন্তু এই সঙ্কেত জানা থাকিলে সে সকলের তত আবশ্যক হয় না। তবে তাহার দুই একটিমাত্র বলিয়া দিতেছি।

কেহ এই বর্ত্তমান বৎসর তাহার সুখে কিংবা দুঃখে কাটিবে এরূপ প্রশ্ন করিলে, সে যে সময়ে প্রশ্ন করিয়াছে, সেই সময় যে তিথি, সেই তিথির অঙ্ক, যে বারে হয় তাহার অঙ্ক, যে নক্ষত্রে হয় তাহার অঙ্ক, যে যোগে প্রশ্ন হয়, তাহার অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ঐ যোগফলে যে বৎসরের যে শক, সেই অঙ্ক এবং প্রশ্নের অক্ষর যতগুলি তাহাই আবার যোগ করিয়া তাহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিবে। এক বাকী থাকিলে কষ্ট, দুই থাকিলে সমভাবে এবং শূন্য থাকিলে সুখে কাটিবে; তিথির অঙ্ক যথা—শুক্লাপ্রতিপদ ১ ধরিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ ধরিবে, আর নক্ষত্র ও যোগের নাম পরপর পাঁজিতে যেমন লেখা আছে, সেইরূপ প্রথমটীতে এক, দ্বিতীয়টীতে দুই এইরূপ ধরিয়া শেষটী ২৭ সাতাশ পর্য্যন্ত অঙ্ক ধরিয়া লইতে হইবে।

কাহারও কোন দ্রব্য হারাইলে, তাহা পাওয়া যাইবে কি না স্থির করিতে হইলে, প্রশ্নের অক্ষর যত, তাহাকে তিথির অঙ্ক দিয়া গুণ করিয়া, যত দণ্ডের সময় প্রশ্ন হয়, সেই দণ্ড উহাতে যোগ দিয়া ২ দিয়া ভাগ করিবে। এক বাকী থাকিলে পাওয়া যাইবে আর শূন্য থাকিলে পাওয়া যাইবে না। এইরূপ যোগ জমা খরচ ও গুণভাগ জানিলেই এই সকল গণনা হয়। তুমি বাটীতেই ত শৈশবে এই সকল অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিলে, নিশ্চয়ই তুমি এ সকল শিখিতে পারিবে। এখন চল, তোমাকে করকোষ্ঠীর একটুমাত্র আভাস বুঝাইয়া দিয়াই তোমার স্বামী-গৃহে উপস্থিত হই।

করকোষ্ঠি বা সামুদ্রিক জ্যোতিষের একটী প্রধান অঙ্গবিশেষ। কেবল কপাল বা করতল দেখিয়াই মানবের শুভাশুভ ও জীবন মরণ বুঝা যায়। কপাল দেখিয়া গণনা করা বড়ই কঠিন। তাহা পরে সন্ন্যাসীর নিকট শিখিও। করকোষ্ঠিও নিতান্ত সহজ নহে; তবে তাহার সহজ সঙ্কেতগুলি এখন বলিয়া দিতেছি; কঠিনগুলি পরে তাঁহার নিকট দেখাইয়া লইও। পুরুষদিগের দক্ষিণ হস্তের রেখা ও স্ত্রীদিগের বাম হস্তের রেখা পরীক্ষা করিতে হয়। করতলে অঙ্গুলিগুলির নিম্ন ভাগেই যে দীর্ঘরেখা কনিষ্ঠা বা প্রথম অঙ্গুলীর তলদেশ হইতে তর্জ্জনী বা চতুর্থাঙ্গুলীর দিকে গিয়াছে, সেইটীই আয়ুরেখা। যাহার আয়ুরেখা প্রথম বা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নীচে পূর্ব্বভাগ হইতে প্রকাশ হইয়া অনামিকা বা দ্বিতীয় অঙ্গুলীর নিম্ন পর্য্যন্ত যায় তাহার পরমায়ু ১০ দশ বৎসর। যাহার আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ঠিক মূল হইতে উঠিয়া অনামিকার নীচে গিয়া শেষ হয় তাহার আয়ু ১৮ বৎসর; কিন্তু ঐ রেখার মধ্যে যদি যব চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে পরমায়ু ৩০ বৎসর হইবে। আয়ুরেখা প্রথমাঙ্গুলীর মূল হইতে আসিয়া দ্বিতীয়াঙ্গুলীর শেষে গিয়া মিলিত হইলে পরমায়ু ৫০ বৎসর হয়। প্রথমাঙ্গুলীর মূলদেশ হইতে মধ্যমাঙ্গুলীর ঠিক নীচে গিয়া মিলিলে আয়ু ৮০ বৎসর হয়। প্রথমাঙ্গুলীর নিম্ন হইতে তর্জ্জনী বা চতুর্থাঙ্গুলীর মূল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইলে, তাহার পূর্ণ পরমায়ু ১২০ বৎসর হয়।

'রেখয়া ভিদ্যতে রেখা স্বল্পায়ুশ্চ ভবেন্নর!'

অর্থাৎ যাহার আয়ুরেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা ভেদ করে, তাহার কঠিন কঠিন ফাঁড়ায় স্বল্পায়ু হয়। সেই সকল ক্ষুদ্ররেখাবিদ্ধ স্থানের সংখ্যা করিয়া আয়ুর পরিমাণের কমবেশী বুঝা যায়, যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপরে ঊর্দ্ধরেখা সুস্পষ্ট দেখা যায়, তাহার সহস্র ফাঁড়া থাকিলেও আয়ু ৬০ বৎসর হয়। এই ঊর্দ্ধরেখা হস্তমূল

হইতে প্রকাশিত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলীর নীচে গিয়া মিলিত হইলে ধনধান্য পরিবৃত হইয়া যশস্বী, মানী, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও দীর্ঘায়ু হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যরেখায় যব চিহ্ন থাকিলে কিম্বা হস্তমূলে মৎস্যপুচ্ছবৎ রেখা থাকিলে, মানব মানে ধনে শোভিত থাকিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। এই সকল ছাড়া করতলে সন্তান, বিবাহ, পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি অনেক রেখা আছে; পরে সে সকল শিখিও। আবার একরূপ সঙ্কেত অনুসারে এই রেখা সকল গণনা করিলে আয়ু কয় বৎসর কয় দিন এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ও ঠিক বলিতে পারা যায়; তাহা পরে জানিতে পারিবে। এখন এত তাড়াতাড়ি যাহা শিখিলে তাহাই মনে রাখিতে পারিলে পরিণামে জ্যোতিষশাস্ত্র সুন্দররূপে শিখিবার যথেষ্ট সুবিধা হইবে।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী জ্ঞানদাকে লইয়া নারায়ণপুরে চলিলেন। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন যে শ্যামা ও বামা ফিরিয়া আসিয়া এখানেই বাস করিতেছে এবং তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবসা চালাইয়া আনন্দের সহিত কালাতিপাত করিতেছে। পরে তাঁহারা সন্ধ্যার সময় গঙ্গেশ বাবুর বাটীতে আসিয়া দেখিলেন জ্ঞানদার শাশুড়ীকে কালসর্পে দংশন করিয়াছে; তথায় বহু লোকের জনতা হইয়াছে। সেই জনতার ভিতর বসিয়া বামা, রোগিণীর দংশন-স্থানের কিছু উপরে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাগা বাঁধিতেছে—

"ডোর ডোর পাটের ডোর, সিঁদ মুখে পাইলাম চোর,
খাল সুখায় যমুনা সুখায়, তবু না মোর ডোর লুকায়;
কেন রে চোর তুই না শুনিস্ ব্রহ্মার বোল
গুরুর পাও হাড়ির ঝি কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞে ওঠ!"
ধবল ঘোড়া বেতের বান্ধন ছড়ি, বিষ খাইয়া শিব যান গড়াগড়ি,
গঙ্গা বলেন দুর্গা গো তুমি বড় লঘু, বিষ দিয়া বধ কৈলা ঘরের প্রভু,
এ কথা শুনিয়া দুর্গার মনে হইল রিষ—ক্ষয় যা ভস্ম যা—কালকুট বিষ!

তাহার পর হাত চালিয়া আরও কত মন্ত্র পড়িয়া শেষে এই মন্ত্র দ্বারা জল-সার করিতে লাগিল—

ধবল গঙ্গাধর, ধূলায় ধূসর ধরণী ধারণ দে;
দেখিয়া দুর্গতি, আইলেন পার্ব্বতী, শঙ্কর মারিলেক কে?
হাতের ডম্বুর, খসিল শম্ভুর, ধরণী গড়াগড়ি যায়,
পাইয়া শঙ্কা, জটায় গঙ্গা ত্রিবেণীর পথে কেন ধায়?

তোমার কুমারী, আইলেন বিষহরি, পান কর বরিষণ,
উঠ উঠ, শঙ্কর—রাজ রাজেশ্বর পবন চলে ঘনে ঘন।"

যখন জলসারেও কিছু হইল না, তখন শ্বেত করবীর মূল, শিরীষের শিকড়, নাগদানার মূল, সোমরাজ মূল প্রভৃতি বিড় বা ঔষধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। তাহাতেও কিছু হইল না, রোগিণী ঢুলিয়া পড়িল; তখন জ্ঞানদা শ্বাশুড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

শ্বাশুড়ী জ্ঞানদার মুখের দিকে চাহিয়া "মা! আসিয়াছিস্" এই কথাটী অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। অমনি অদূরে কে যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মৃত্যুকালে ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে উচ্চ হাস্যের রব শুনিয়া সকলে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল যে পাগল গঙ্গেশ মায়ের মৃত্যু দেখিয়া হাসিতেছে!

বামা সেই মৃতদেহের কাছে বসিয়াই বৃন্দাদূতীর ন্যায় বলিল "গঙ্গাজল! এখানে এখন কি মনে ক'রে? তুমি ত এখন সন্ন্যাসিনী—কই তোমার সেই পাগলিনী? যে চোখ্ খাগী ক'রেছে তোমায় উদাসিনী? যোগিনী হ'য়ে আবার কেন গৃহবাসিনী? তুমি হ'লে বনবাসিনী—এসে ছিল তোমার এক সতিনী—সে এক কালসাপিনী! বাধিয়ে দিয়ে বিষম গোল—পতিকে করিল পাগল! শ্বাশুড়ীকে করিল দংশন—তাই হ'ল তাঁর এমন মরণ! ভাগ্যে ছিল শেষ দর্শন—তাই তোমার হঠাৎ আগমন! যা বলি, তা শুন দিয়া মন—শ্রবণে জুড়াইবে শ্রবণ! কলিতে অদ্ভুত কাণ্ড, হারায়েছি জ্ঞান—অদ্ভূত! অদ্ভুত! শুন সতিনী উপাখ্যান!

গঙ্গেশ কংগ্রেসে গিয়া যে বাঙ্গালিনী বিবি বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি আসিয়াই বাড়ীর চিরাধিষ্ঠিত শালগ্রাম শীলাকে পায়খানার বিষ্ঠাকূপে নিক্ষেপ করিয়াছেন—তুলসী মঞ্চকে মূত্রকুণ্ড করিয়াছেন—কুক্কুটপক্ষ ও ভগবতীর অস্থিতে পাকশালা পরিপূর্ণ করিয়াছেন—শ্বাশুড়ীকে সর্পাদি-সঙ্কুল একখানি মাটীর ঘরে তাড়াইয়া দিয়াছেন—অবশেষে যবন বাবুর্চ্চির সহিত প্রেম করিয়া, পতিকে কোন ঔষধসংযোগে পাগল করিয়া সেই পাকপটু প্রেমিকের সহিত পলায়ন করিয়াছেন। তোমার শ্বাশুড়ীকে আজ সেই ঘরে কাল সাঁঝের বেলায় সাপে কামড়াইয়াছিল। তাই বলি সেই সাপিনী হইতেই তোমার স্বামীর এমন পাগল মন আর শ্বাশুড়ীর সর্পাঘাতে মরণ!

জ্ঞানদা নীরবে এই সকল শুনিতেছিল; ব্রহ্মচারী কিন্তু সে দিকে কর্ণ-

পাতও করিলেন না। তিনি তাঁহার নিকটে যে কালীর মাথার সিঁদুর এবং গোর স্থানের তুলসীর মূল ছিল, তাহাই ছুলাল ফুলের পাতার রসে মিশাইয়া পাগল গঙ্গেশের কপালে ফোঁটা দিলেন এবং বশীকরণ মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। ইহাতেই পাগল তাঁহার সঙ্গে চলিল; জ্ঞানদাও আর বিলম্ব না করিয়া গঙ্গা-জল এবং শ্বশুরালয়ের নিকট চিরবিদায় লইয়া সেই সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে পথিমধ্যে গঙ্গেশ একবার জ্ঞানদার দিকে চাহিয়াই উচ্চ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল "পাপিয়সি! তুই ত ঘরের বাহির হইয়া কুলটা হইয়াছিস্, কিন্তু এখনও কি তোর পাপের মাত্রা পূর্ণ হয় নাই?"

তাঁহারা গণেশপুর উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে রমেশ রাধেশকে নষ্ট করিতে গিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপর এক ব্যক্তিকে খুন করায় তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের কঠোর দণ্ড হইয়াছে। মোহিনী রমেশের এক বন্ধুর সহিত ব্রাহ্মিকা হইয়া তৃতীয় বার বিবাহ করিয়া তৃতীয় পতি সহ অবলা ব্যারাকে স্থান পাইয়াছে এবং ধাত্রী হইবার ইচ্ছায় ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। রাধেশই এখন এই অতুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী স্বীয় কন্যার গুণপনা শুনিয়া দুঃখিত বা আনন্দিত হইলেন না।

পরে বড়বাড়ীর বৃদ্ধ হরপ্রসন্নের নিকট সকলেই উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানদা অগ্রে পাগল পতিকে প্রণাম পূর্ব্বক পরে পিতৃপদে প্রণাম করিল; কারণ পতির সম্মুখে গুরুদেব থাকিলেও স্ত্রীলোককে অগ্রে পতিপদে প্রণাম করিয়া পরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়; পতি অপেক্ষা পত্নীর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা জ্ঞানদা জানিত। তখন বৃদ্ধ বহু দিন পরে কন্যাকে দেখিয়া আনন্দিত না হইয়া রাগান্বিত হইয়া বজ্র-গম্ভীরস্বরে কহিলেন "রাক্ষসি! এতদিন কোথায় ছিলি? তুই আর আমার কন্যা নহিস্, তুই কুলকলঙ্কিনী!" পাগল অমনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রহ্মচারী তখন আত্মপরিচয় দিয়া আপন অবস্থা ও জ্ঞানদার অবস্থার কথা সমস্তই বৃদ্ধকে খুলিয়া বলিলেন। বৃদ্ধ অনেক দিন পরে মথুরকে পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কন্যার উপর তাঁহার মনের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না। মথুরের মুখে সমস্ত শুনিয়াও, স্ত্রীজাতির সামান্য কারণেই কলঙ্ক স্পর্শে বলিয়া জ্ঞানদাকে তিনি "রাক্ষসী" ভিন্ন অন্য সম্বোধন করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া শ্রীক্ষেত্র যাইবার যুক্তি দিলেন এবং নিজেই সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

বৃদ্ধ তাঁহার এই বয়সে বাটীতে একাকী না থাকিয়া এই যুক্তিই সৎযুক্তি মনে করিলেন এবং যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি রাধেশকে বাড়ীঘর সমস্তই সমর্পণ করিয়া পথের এবং অন্যান্য খরচাদির জন্য কিছু বেশী অর্থ সঙ্গে লইলেন।

ব্রহ্মচারী ত তাহাই চাহেন, নতুবা তাঁহার গুরুর আদেশ পালন হয় কই? তিনি তাঁহার বাস্তু ভিটায় গিয়া নমস্কার করিয়া তাহার নিকট চিরবিদায় লইলেন। পরে হরপ্রসন্নকে সঙ্গে লইয়া সকলে মিলিয়া শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জ্ঞানদাও জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া পিতা ও পতিসহ চলিল।

উপযুক্ত সময়ে সকলেই শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী সকলকেই পুরীধামে জগন্নাথজীকে দর্শন করাইয়া যেমন বাহিরে আসিতেছেন, অমনি মহর্ষি দেব সখার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী কার্য্য সফল হইয়াছে দেখিয়া ব্রহ্মচারীকে শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তাহার পর ত্রিরাত্রি [illegible] থাকিয়া সন্ন্যাসী সকলকে শ্রীক্ষেত্র হইতে যাজপুরের নিকট একটী সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যস্থিত অরণ্যে লইয়া আসিলেন। সেখানে সন্ন্যাসী একখানি কুটীর দেখাইয়া জ্ঞানদাকে কহিলেন "আপাততঃ কিছুকালের জন্য এই মা তোমার সাধনার উপযুক্ত স্থান এবং এই কুটীরই এখন তোমার একমাত্র বাসস্থান। এই কুটীরের মধ্যে একটী সুড়ঙ্গ আছে; সুড়ঙ্গ-পথটী যেন সিঁড়ীর ন্যায় প্রস্তুত আছে। এই সুড়ঙ্গ মধ্যস্থিত সোপান-শ্রেণী অবলম্বনে নীচে গিয়া দিব্য একটী প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী প্রোথিত আছে দেখিতে পাইবে। পূর্ব্বে আমার এক শিষ্য এই বাটীতে বাস করিতেন; তিনি এখন মুক্তি পাইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি এই বাটীতে আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য, তৈজসপত্রাদি এবং শয়নোপযোগী সামগ্রী কিছুরই অভাব রাখিয়া যান নাই। দৈববলে তোমাকে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে বা কোন স্থানে যাইতে হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে এই বাটীতে তোমার বৃদ্ধ পিতা ও পাগল পতিকে রাখিয়া তাঁহাদিগকে সেবা, ভক্তি ও পূজা কর আর সময়ান্তে প্রাতে, সন্ধ্যায় ও গভীর রাত্রিতে উপরে এই কুটীরে বসিয়া আমার উপদেশানুযায়ী সাধনায় প্রবৃত্ত হও"।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী জ্ঞানদার পিতাকে ও পতিকে কুটীরের নিম্নস্থ বাটীতে লইয়া গিয়া আশ্রয় দিলেন ও দিব্য আরাম-সুখে রাখিলেন। জ্ঞানদা ভূগর্ভস্থ সেই প্রাচীন বাটীর শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিতা হইল। তখন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকে তাঁহার আশ্রম সেই নৈমিষারণ্যে পাঠাইয়া নিজে কিছুকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি জ্ঞানদাকে জ্যোতিষশাস্ত্র সুন্দর-

রূপ শিখাইলেন; ব্রহ্মচারী পথে পথে যে জ্যোতিষের বীজ তাহাকে দিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীর নিকট থাকিয়া জ্ঞানদা সেই বীজকে ফুলফলশোভিত তরুরূপে দেখিতে পাইল। পরে তিনি তাহাকে দুই একটী যোগাভ্যাসও আরম্ভ করাইলেন—যে ধর্ম্ম যেরূপে সাধন করিতে হয়, তাহারও পথ দেখাইয়া দিলেন।

জ্ঞানদা একাকিনী থাকিয়া কিরূপে নিঃশঙ্কচিত্তে এই বিজন বনমধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনা করে, তাহা দেখিবার জন্য শীঘ্রই সন্ন্যাসী সে স্থান ত্যাগ করিলেন। জ্ঞানদা একাকিনী হইয়া বৃদ্ধ পিতা ও পাগল পতির সেবা করিতে লাগিল। তাহারা কিন্তু তাহাকে প্রত্যহই "পাপিয়সী ও রাক্ষসী" ভিন্ন কিছুই বলিত না। জ্ঞানদা "তাহাদের সেই তর্জ্জন গর্জ্জনে লক্ষ্য না করিয়া একান্ত মনে স্বীয় লক্ষ্যের দিকেই বারম্বার লক্ষ্য রাখিতে লাগিল।

তাহার পর সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে দেখিয়া যাইতেন—কতপ্রকার শাস্ত্রশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং কিছুকাল পরে তাহাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইবেন বলিতেন।

একাকিনী জ্ঞানদা স্বর্গীয় ধর্ম্মের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া যেন সেই বন-ভূমি আলো করিয়া থাকে। আর তাহাকে দেখিলে এখন মানবী বলিয়া বোধ হয় না। যেন সুরবালা আসিয়া লীলা করিতেছে! গভীর নিশীথে জ্ঞানদার হরিগুণগানে বনভূমি যেন প্রকম্পিত হয় এবং তন্মধ্যস্থ তির্য্যগ জাতি যেন নিস্পন্দ হইয়া থাকে। যে জ্ঞানদা গোড়ায় গৃহস্থের বধূ—এখন সে পুণ্যপুষ্পের পবিত্র মধু! যে জ্ঞানদা লজ্জাশীলা বঙ্গবালা—সে এখন সুপবিত্রা সুরবালা! যে জ্ঞানদা ভবধামে অভাগিনী—সে এখন সংসারেই সন্ন্যাসিনী! যে জ্ঞানদা চিরদুঃখতপ্ত ও চিরাভিসপ্ত—সে যেন এখন হইল নবজীবন প্রাপ্ত!

এই সেই সংগৃহীত মানব লিখিত চিত্রগুপ্তের গুপ্ত গ্রন্থ! এই স্থানেই চিত্রগুপ্তের—**গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত।**

বিংশ অধ্যায়।

মর্ত্ত্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! বহুক্ষণ জ্বালাতন হইয়াছেন; প্রথমে দেব-লীলারূপ স্বর্গসুধা-রসাস্বাদ করিয়া মধ্যে মর্ত্ত্যের নিত্য ঘটনারূপ গরলপান করিতে হইল; স্বর্গের এমন দেবলীলা দেখিতে দেখিতে মর্ত্ত্যের এই মানব-লীলা কি ভাল লাগে? ইহা ত অনুক্ষণ চক্ষে দেখা যায়, দেখিয়া দেখিয়া অরুচি হইয়া গিয়াছে; দেব কথার পরিবর্ত্তে ইহা কি আর ভাল লাগে? তবে এতক্ষণ এই প্রলাপ বকিবার কারণ কি? কারণ অবশ্যই আছে; যমালয়ের তত্ত্ব কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য—বসুমতীর পাপ-ভারের বিষয় বিশদ বর্ণন করাই আমাদের কল্পনা—পাপ-পুণ্যের বিচারালয় ও পাষণ্ড পাপীদিগের শাস্তি পাই-বার স্থানের বিবরণই আমাদের বক্তব্য—মৃত্যু এবং অকালমৃত্যু-স্রোত এত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবার কারণ বর্ণনই আমাদের বর্ণনীয়! কিন্তু যে জীব-জগত লইয়াই যমের বাড়ী—যে জীব-জগত লইয়াই জীবন মরণ—যে প্রাণীপূর্ণ পৃথিবী লইয়াই পাপ-পুণ্য, তাহার বিষয় পূর্ব্বে না বলিলে এ সকল কি বুঝা যায়? তাই এই মর্ত্ত্যপর্ব্বের অবতারণা—তাই এই মানবজীবনের চাক্ষুষ ঘটনা—তাই এই কলিযুগের অদ্ভুত ইতিহাসের বর্ণনা! ইহাতে কি বিরক্ত হইলে চলে? কঠিন কাষ্ঠময় তরু ভেদ করিয়াই কোমল কুসুম বিকসিত হয়। নীরস পদার্থই সরস সামগ্রীর উৎপত্তি স্থান! যাহাই হউক যাঁহাদের মর্ত্ত্যপর্ব্ব নীরস বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাঁহারা আবার সরস সামগ্রী সন্দর্শন করুন।

আসুন পাঠক! আবার সেই স্বর্গের দেব সভায় আসুন! পাপ-পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই স্বর্গের ইন্দ্রালয় সম্মুখস্থিত সুবিস্তৃত সমুজ্জ্বল সভাতল অবলোকন করুন। আহা! সেই ভাবেই স্থাপিত আছে; সেই চারিদিকে দেবদেবিগণ ও সাধুসজ্জন। মধ্যভাগে লক্ষ্মী-নারায়ণ! বামে বসু-মতী—দক্ষিণে দেবর্ষি! সম্মুখস্থ নিম্নাসনে যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্তের পুস্তক পাঠ সমাপ্ত হইলে দেবগণ কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত হইয়া রহিলেন। মর্ত্ত্যের মানব লিখিত মানবের কথা অত্যন্ত মনোহর ও বিশেষ বিস্ময়জনক বলিয়াই সকলের বোধ হইল! চিত্রগুপ্ত কহিলেন "ঠাকুর দেখ

রাজত্বে মর্ত্ত্যের এই অবস্থা—পাপপুণ্যের এই ব্যবস্থা ; আমি ব্যবস্থানুযায়ী সাজান, সত্যঘটনামূলক এই পুস্তকখানি পাইয়াছিলাম বলিয়াই আপনাদিগকে মর্ত্ত্যের এইরূপ সু ও কু ঘটনা ভালরূপ জানাইবার সুবিধা হইল। কলিতে মর্ত্ত্যের অবস্থা, আচার ব্যবহার, আইন-কানুন, সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি, পতিহত্যা, স্ত্রীহত্যা, পিতামাতার প্রতি পুত্রের অসদাচরণ, স্ত্রীস্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার, বিচ্ছেদ মিলন, সতীত্ব ব্যভিচার, অবৈধ প্রণয়, শিক্ষা, দীক্ষা, জ্যোতিষ চিকিৎসা, তন্ত্র-মন্ত্র, বশীকরণ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাপ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নকল নরকরূপ চা-বাগান, দেবদ্বিজে অভক্তি অশ্রদ্ধা, পরস্ত্রী-হরণ, অভক্ষ্য ভোজন, অসেব্য সেবন, কুপথে গমন ও কুক্রিয়া অবলম্বন প্রভৃতি সমস্তই এই পুস্তক পাঠে অবগত হইলেন। এক্ষণে চৌর্য্য লাম্পট্য, ভ্রূণ-হত্যা, স্বার্থপরতা, শঠমিত্রতা, দাম্ভীকতা, কুটিলতা, অহঙ্কার, গর্ব্ব, মাৎসর্য্য, মাদক সেবন, বেশ্যাগমন প্রভৃতি আরও অনেক পাপ-চিত্র আমি পুস্তকাকারে না পাইয়া পৃথক পৃথক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আবার অকালে যে ব্যক্তি যে দিন যম-পুরে নীত হইয়াছে, সে কি কারণে অসময়ে যমালয়ে আসিল সেই দিনই তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমার গুপ্ত-গ্রন্থ পাঠ শেষ হইল ; এক্ষণে আদেশ হইলে সেই সকল গুপ্ত-চিত্র ও বিবরণী বা তালিকা দেখাইব"।

দেবগণের মধ্যে অনেকেই কহিলেন "সে সকল পরে দেখা যাইবে ; আপাততঃ যে পুস্তক পাঠ করিলে তাহাতেই আমরা ভয়ানক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। এ বিষয়ে যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা কি বলেন দেখা যাউক"। তখন শালগ্রাম ও তুলসী প্রভৃতি দেবগণ কহিলেন "প্রকৃতই আমাদের বিষ্ঠা-কূপে ও মুত্র-কুণ্ডে পড়িতে হইয়াছে তাহা ছাড়া আমরা সমস্ত গ্রাম্য দেব-দেবী-গণই যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই, তাহার কি আর সংখ্যা আছে ?"

নারদ ভগবান্‌কে কহিলেন "আপনার বৈকুণ্ঠস্থ পার্ষদ সেই শাপভ্রষ্ট সুবাহু, যিনি এক্ষণে মর্ত্ত্যে দেবসখা নামে পরিচিত, তিনিও ত সভায় উপস্থিত আছেন ; তাঁহাকেও এই গ্রন্থের ঘটনা একবার জিজ্ঞাসা করা হউক"। মহর্ষি দেবসখা দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে কহিলেন "প্রভু আর কেন কষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, আমিই বলিতেছি যে, আমিই যখন এই ঘটনায় লিপিবদ্ধ তখন আর ইহাতে সন্দেহের বিষয় কিছুই নাই। "প্রকৃতই এইরূপ ঘটিয়াছে এবং আমি এইরূপ করিয়াছি"। তখন নারায়ণ কহিলেন "তুমি যখন সেই জ্ঞানদা নাম্নী সাধ্বীকে দীক্ষা দিয়াছ, তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া না আসিলে

কেন?" মহর্ষি কহিলেন "ঠাকুর! একদিন আমার আশ্রমে বসিয়া বসুমতীও এই কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইলে তাহার যে সাধনার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহার বৃদ্ধ পিতা ও পাগল পতিকে সেবা কে করে? ইহারা জীবিত থাকিতে ত তাহার কোথায়ও নড়িবার ক্ষমতা নাই; তাহা হইলে যে আপনার নির্দ্দেশিত পথ ছাড়াইয়া যাইবে—তখন যে তার সকল সাধনা মাটী হইবে। সেই জন্যই আমি তাহাকে সঙ্গে আনি নাই; বসুমতীর পাপ-ভার লাঘবের জন্য স্বর্গে যে এই কাণ্ড হইবে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াই শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথজীর সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলাম। তথায় রাক্ষস রাজর্ষি বিভীষণ স্বর্গে এই দেব-সভায় আসিবার পূর্ব্বে আপনার বা জগন্নাথজীর সহিত এ সম্বন্ধে যে, কি পরামর্শ করেন, তাহা শুনিবার জন্যই বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলাম। তাই আমি শ্রীক্ষেত্রে যাইবার কালেও আমার সেই প্রিয় শিষ্যা সন্ন্যাসিনী বামা জ্ঞানদার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক বেশীক্ষণ বাক্যালাপের সময় পাই নাই; আবার ফিরিবার কালেও পাছে আমার আশ্রমে নারদ ঋষি নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া ফিরিয়া যান বলিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া বেশী কথা কহিতে পারি নাই। সে তখন শুকদেব-গোস্বামীর বর্ণিত কলির ভবিষ্যৎ কাহিনী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহারও উত্তর তাড়াতাড়িতে দিয়া আসিতে পারি নাই। বরং সে আমার সঙ্গে আসিতে চাহিলে তাহারদিকে ক্রোধের চক্ষে চাহিয়া আমার সহিত বাচালতা প্রকাশ হইতেছে বলিয়া তিরস্কারও করিয়াছিলাম। পরে আসিবার কালে কেবলমাত্র বলিয়াছিলাম।

'ধরা জরা, জ্যান্তে মরা আছেত মা তিন
ভুলো না তাদের তুমি কভু কোন দিন।
করিবে কর্ত্তব্য কার্য্য হ'য়ে একমন,
পাইবে বাঞ্ছিত বস্তু যা তব মনন!'

ধরা অর্থাৎ বসুমতী, জরা অর্থাৎ জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পিতা, জ্যান্তেমরা অর্থাৎ পাগল পতি; পাগলেরাই জীবিত অবস্থাতেই মৃতের ন্যায় কাল কাটায়। যখন তাহারা আর জগতের কোন কার্য্যেই আসিল না, তখন তাহাদের জ্যান্তেমরা বা জীবন্তে মৃত ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? তাই বলিয়াছিলাম যে কোন দিন কোন সময়েই এই তিনকে ভুলিও না। যাহার ক্রোড়ে পালিত হইতেছ, সেই ধরাকে অগ্রে পূজা করিবে, পরে বৃদ্ধ পিতাকে ও পাগল পতিকে সেবা করিবে। এই কর্ত্তব্য কার্য্য করিলেই বাঞ্ছিত বস্তু নিশ্চয়ই পাইবে। আমি

তাহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া এবং তাহার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পরে দিব বলিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছি।

পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে সমস্তই বুঝিয়াছেন; এই জন্যই গ্রন্থারম্ভে সন্ন্যাসীর সেই শেষ কথা কয়টী বেশ করিয়া স্মরণ রাখিবার জন্য বলা হইয়াছিল। জ্ঞানদাই সেই সন্ন্যাসিনী বামা আর এই বিষ্ণুর পার্ষদ বৈকুণ্ঠবাসী দেব-পুরুষ সুবাহুদেবই সেই সন্ন্যাসী। মর্ত্ত্যে ইনি মহর্ষি দেবসখা নামেই পরিচিত। ইহার শ্রীক্ষেত্র গমন কালে বটবৃক্ষমূলে বামা ইহার সহিত কথোপকথন শেষ করিয়া কুটীরে আসিলে সেই বিজন বন মধ্যে বজ্রগম্ভীর স্বরে "রাক্ষসি! এতক্ষণ কোথায় ছিলি" বলিয়া যে শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, সেই শব্দ বামার বৃদ্ধ পিতার, আর খল খল হাস্যের রবের সহিত "পাপিয়সি! এখনও কি তোর পাপের মাত্রা পূর্ণ হয় নাই" বলিয়া যে শব্দ সে শুনিয়াছিল, তাহা তাহার পাগল পতির। সেই জন্যই সে তাহাতে তখন লক্ষ্য না করিয়া আপন কার্য্যে মন দিয়াছিল। 'এ সকল রহস্য সকলে এখন বুঝিলেন কি? এই জ্ঞানদা যে বৃদ্ধ পিতা ও পাগল পতিকে লইয়া কিরূপ ভাবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করে এবং এই ভরা যৌবনে ফুটন্ত গোলাপটীর ন্যায় অতুল রূপের-রাশী লইয়া কিরূপে স্বধর্ম্ম রক্ষা করে, তাহা পাঠক গ্রন্থারম্ভে সুস্পষ্টই দেখিয়াছেন। এখন এই মানবী জ্ঞানদা কর্ম্মফলে চরিত্র বলে দেবী বলিয়া পরিচিতা না হইবে কেন? সজীবনেই হউক আর জন্মান্তরেই হউক, কর্ম্মফলেই মানবী—দেবী এবং কর্ম্মফলেই মানবী—দানবী! কর্ম্মফলেই মানুষ—দেবতা এবং কর্ম্মফলেই মানুষ—কৃমিকীট!

মহর্ষি দেবসখার কথা শেষ হইলে দেবর্ষি, চিত্রগুপ্তকে কহিলেন "কই চিত্রগুপ্ত! তুমি যে বলিয়াছিলে, তোমার সংগৃহীত মর্ত্ত্যের মানবলিখিত এই গুপ্তগ্রন্থ পাঠে দেবর্ষির দেখা বিভীষিকার বিষয়ও জানা যাইবে; আমি যে সেই দিক্‌ভ্রমে দিশাহারা হইয়া পাতাল পথে পড়িয়া কয়েকটী বিষম বিভীষিকা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, তাহার বিষয় ত কিছুই বলিলে না"। চিত্রগুপ্ত কহিলেন "সে সমস্তও এই গ্রন্থেরই ঘটনার অন্তর্গত; চাক্ষুষ দেখিতে চাহিলে দেখাইতেও পারি—শুনিতে চাহিলে শুনাইতে পারি।" নারদ কহিলেন "দেখিতে পাইলে আর শুনিতে কে চাহে?" চিত্রগুপ্ত কহিলেন "তাহা হইলে যে যমালয়ে যাইতে হইবে—পাপীদিগের দণ্ড-স্থান দেখিতে হইবে।"

নারদ ভাবিলেন—তবে কি তাঁহাকে আবার নরক ভোগ করিতে হইবে

না কি? পাতালপুরী হইতে উঠিবার সময় চক্রী যেমন চক্রান্তে নরকের পথে লইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ নরক পুনরায় দেখিতে হইবে না কি? যাহা হউক এবার যদি আবার নরকে যাইতে হয়, তবে এই দেবসভাস্থ সমস্ত দেবগণকেই কৌশলে সঙ্গে লইতে হইবে। "বসুমতীর কার্য্যোদ্ধারও করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে দেবগণকেও নরকে লইয়া যাইতে হইবে; নতুবা তাঁহার নরক দর্শনের প্রতিশোধ হয় কই?

এইরূপ ভাবিয়া নারদ ভগবানকে কহিলেন "ঠাকুর! এস্থলে আমার একটী বিশেষ বক্তব্য আছে। বসুমতীর পাপ-ভার লাঘবের জন্য—অকালমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য এবং শমনের শাসন সমালোচনার জন্যই স্বর্গে এই বিরাট দেব-সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বসুমতী যে এক্ষণে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত—কিরূপ পাপ-ভারাক্রান্ত, তাহা বোধ হয় এই মর্ত্ত্যের মানবলিখিত চিত্রগুপ্তের সংগৃহীত গুপ্তগ্রন্থ পাঠেই অবগত হইলেন; আবার গ্রাম্য দেবদেবীগণও আপনার পার্ষদ প্রমুখাৎ এই পুস্তকের সত্যাসত্যেরও প্রমাণ পাইলেন। তাহার উপর চিত্রগুপ্ত আরও যে পাপ-চিত্র এবং বিচিত্র তালিকা দেখাইবেন বলিতেছেন, তাহাতে আরও যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন; কিন্তু আমার মতে আর নকল চিত্র না দেখিয়া আসল চিত্র দেখিলেই ভাল হয়। তাহাতে ধর্ম্মরাজ যে পাপ পুণ্যের কিরূপ বিচার করিতেছেন, তাহা জানাও যাইবে, আবার শমনের শাসন-প্রণালীও চাক্ষুষ দেখা যাইবে। যখন কলিতে আর আপনি অবতাররূপে দেখাদিয়া দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিতেছেন না; শমনের উপরই সমস্ত ভার ন্যস্ত, তখন আর ব্যস্ত হইয়া কি হইবে? স্বর্গের এই বিরাট দেবসভা কয়েক দিনের জন্য যমালয়ে যাউক; তথায় যমরাজের বিচারালয় ও বিচারফল, শমনের শাসন-প্রণালী ও শাস্তির স্থান এবং চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা ও কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া সভাস্থ সকলেই স্বচক্ষে সন্দর্শন করুন। পরে পুনরায় এই স্বর্গে আসিয়া—অথবা এতদূর আর না আসিয়া তন্নিম্নস্থ পাতাল প্রদেশে কোন রমণীয় স্থানে এই সভা সংস্থাপিত হউক এবং সকল বিষয়েরই মীমাংসা হউক। চিত্রগুপ্ত যমরাজকে ও নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবার জন্যই নিজের সংগৃহীত কলিযুগের এই অদ্ভুত ইতিহাস বা পাপ-ভারাক্রান্ত বসুমতীর দুর্দ্দশাময় জীবনী স্বরূপ এই মর্ত্ত্যের কাহিনী বা গুপ্তগ্রন্থ পাঠ করিলেন এবং আরও বিবিধ বিচিত্র চিত্র ও পাপের তালিকা দেখাইতেও উদ্যত হইয়াছেন। প্রবল পাপ-প্রস্রবণ হইতেই যে এত মৃত্যুস্রোত প্রবাহিত

হইতেছে, এইটী প্রমাণ করাই চিত্রগুপ্তের উদ্দেশ্য; কিন্তু কত দুগ্ধপোষ্য বা অচিরজাত শিশু এমন কি পাপ করে যে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই তাহারা ভবধাম হইতে চলিয়া যায়? তাই বলি, এ সকল ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া স্বকর্ণে শুনিলেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়। এক্ষণে আপনার ও সভাস্থ সকলের যাহা মত হয়, তাহাই করুন।”

নারদের কথা শেষ হইলে সভাস্থ সকলে সেই প্রস্তাবেই মত দিলেন। নারদ যে সকলকেই একবার কৌশলে নরকে লইয়া যাইবেন, ভিতরের এই রহস্য কেহই কিন্তু বুঝিলেন না। ভগবান কিন্তু সমস্তই বুঝিলেন, অথচ এইরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে উপস্থিত কার্য্য সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন বিবেচনা করিয়া তিনি যেন বুঝিয়াও বুঝিলেন না। অবিলম্বে যমরাজকে অস্থায়ী সভাস্থল সংস্থাপন করিবার জন্য যমালয়ে পাঠাইলেন। ধর্ম্মরাজ সভাপ্রাঙ্গন গঠন করিবার জন্য তাঁহার মাতামহ বিশ্বকর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া সত্বরই স্বভবনে চলিয়া আসিলেন।

তখন পাতালস্থ সপ্তলোকবাসীগণ মধ্যে যাঁহারা সভায় আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্ব, স্ব লোকে সভাস্থল নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভগবান কিন্তু মহাত্মা বলিরাজার ভবনেই শেষ সভা-প্রাঙ্গন গঠন করিবার প্রস্তাব করিলেন; তাহাতে আর কাহারও আপত্তি রহিল না। যমালয় পরিদর্শনের পর শেষ মীমাংসার স্থল সেই সভাস্থলই সকলের মনোনীত হইল। সকলেই তখন সেই ভূলোকের সর্ব্বদক্ষিণাংশে মৃত্তিকার নিম্নে যমালয়ের দিকে চলিলেন—স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য অতিক্রম করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন।

দেখিতে চলিয়াছেন যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব—পথ দেখাইয়া সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছেন চিত্রগুপ্ত! স্বর্গীয় সৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত—এই স্থানেই আমাদেরও—**মর্ত্ত্যপর্ব্ব সমাপ্ত!**

চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা

বা

যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব

(পাতাল পর্ব্ব)

"কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতি দুস্তরে।
নিস্তারবীজমেতাবৎ হরিমন্ত্রস্য সাধনম্॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
হরিদীক্ষাং বিনা দেবি! কৈবল্যায় সুখায় চ॥"

প্রথম অধ্যায়।

পাতাল পথে!

এস, এস, ভবের জীব যমের বাড়ী এস; জ্বালা যাতনা, ভয় ভাবনা, ভোগ বাসনা, কর্ম্ম কামনা সকল ভুলিয়া যমের বাড়ী এস; আজ যাহার যাহার ডাক পড়িয়াছে, সকলেই যমের বাড়ী এস; কত লোক আগে চলিয়া গিয়াছে—কত লোক পরে চলিয়া যাইবে; গত কাল্‌ও কত লোক গিয়াছে—আগামী কল্যও কত লোক যাইবে, আজিকার দিন তোমাদের ডাক পড়িয়াছে, তোমরা যমের বাড়ী এস; বালক হও—যুবক হও, প্রৌঢ় হও—বৃদ্ধ হও, ধনী হও—দরিদ্র হও, পণ্ডিত হও—মূর্খ হও, পুরুষ হও—স্ত্রী হও, সুন্দর হও—কুৎসিত হও, ভদ্র হও—ইতর হও, আজিকার দিন আর কেহ কাল অকাল না ভাবিয়া—উচ্চ নীচ বা ভালমন্দের তারতম্য না করিয়া—বংশ বা পদমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যমের বাড়ী এস। এ পথে সবাই সমান—এ পথে যানভেদ বা শ্রেণী বিভাগ

নাই—এ পথে সকলেরই এক গতি! পরে কর্ম্মফলানুসারে ধর্ম্ম-রাজের সূক্ষ্ম বিচারে নীচও উচ্চাসন পায় এবং উচ্চেরও নীচ গতি হয়। তাই বলি, এ পথে কোন ভয় নাই; সাহসে ভর করিয়া, বুকে বল বাঁধিয়া আজ যমের বাড়ী এস।

ওকি ও—যমের বাড়ীর নামে শিহরিয়া উঠিলে কেন? যমের বাড়ী আসিতে হইবে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলে কেন? যখন সেখানে যাইতেই হইবে, তখন আর কেন বলিতেছ যে—মরণের চেয়ে আর গালাগালি নাই? যদি বল, যখন যাইতে হয়, তখনই যাইব; তা বলিয়া পূর্ব্বেই অমন অমঙ্গলের কথা কেন? কি আশ্চর্য্য! গলা ঘড়ঘড় করিতেছে—প্রবল শ্বাস উপস্থিত হইয়াছে—যমদূতগণ শিয়রে দাঁড়াইয়া বারম্বার ‘এস এস’ বলিয়া ডাকিতেছে, তবু বলিবে যে, যমের বাড়ী অমঙ্গলজনক বাক্য? ছি! মানুষ! তুমি জ্ঞান হারাইয়া এ সময়ে সকলই হারাইলে?

ওকি ও—অত মুখ শুকাইতেছে কেন? বলিতেছ, ‘আমি ত সুকার্য্য কিছুই করি নাই; মৃত্যুর জন্য ত প্রস্তুতও ছিলাম না; হঠাৎ আমায় যমদূতগণ ধরিতেছে কেন? আমি জবাব দিব কি বলিয়া?’ কেন মানব? ও কথা কেন? এ সংসার ত কর্ম্মক্ষেত্র, সৎকর্ম্ম করিলে না কেন? আশীলক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়াছ—ক্রমোন্নতিতে তুমি ত সংসারের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীব—সকল সুকার্য্যের উপযোগী করিয়াই ত বিধাতা তোমাকে ভবধামে পাঠাইয়াছিলেন, তবে কিছুই করিলে না কেন? এসংসার যে তোমার চিরকালের জন্য নয়, এ মাটীর দেহ যে তোমার চির-দিনের তরে নয়; ইহা ত তুমি নিত্যই বুঝিয়াছিলে তবে তুমি কি বলিয়া নীরব নিস্পন্দ ও নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলে, বল দেখি? যে দিন তোমার ডাক পড়িবে, সে দিন তুমি কি হিসাব দেখাইবে, এ ভাবনা কি একবার মনেও উদয় হয় নাই? ধন্য এ সংসার! ধন্য তুমি! এ সংসারে যে কি নেশার ঘোরে পড়িয়া কি ঘুম ঘুমা-

হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিতে হয়, তাহা জানি না। কত সামান্য কার্য্যে এই মাটীর দেহ মাটী করিয়াছ, কিন্তু আসল কার্য্য কিছুই কর নাই কেন? এই দুর্ল্লভ মানব-জীবনটী যদি সৎকার্য্যে কাটাইয়া দিতে, তবে আজ যাবার দিনে কত স্থখে যাইতে পারিতে বল দেখি; এখন আর ভাবিলে কি হইবে? তখন পাপ-কার্য্যে মতি হইয়াছিল কেন? পুণ্যকার্য্য করিলে যদি তোমার কিছু ক্ষতিও হইত—ধন মান প্রভুত্ব নাও থাকিত, তবু ত আজ এত মুখ শুকাইত না। আজ তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন তুমি ডাক দেখি, তোমার সেই অপরিমিত অর্থে—সেই অবিসম্বাদিত প্রভুত্বে; ডাক দেখি সেই সাধের সম্মানে—প্রাণের স্বজনে, ডাক দেখি সেই তেজ-দম্ভে—সেই মোহ-মাৎসর্য্যে; আজ তাহাদের কাহাকেও পাইবে না; হায় রে! দুদিনের জিনিসে যত্ন করিয়া চিরদিনের রত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছ! তোমার ত সকলই ছিল, হৃদয়ের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলির যথার্থ ব্যবহার কর নাই বলিয়াই ত, সে সকল 'মর্চ্যে' ধরিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে; নিজের হাতে নিজের জিনিস কি এরূপ করিয়া নষ্ট করিতে হয়? চিরসম্বল কি স্বহস্তে কেউ বিসর্জ্জন দেয়? আর ত সময় নাই—ভাবিয়াও উপায় নাই; এস, এস, যমের বাড়ী এস!

ওকি ও—এখন চক্ষে জল কেন? যাহাদিগকে অকুল পাথারে ফেলিয়া—শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইতেছ, তাহাদের জন্য কান্না না কি? তাহাদের জন্য আর কাঁদিয়া কি হইবে? তাহাদের পালন করিবার জন্য—তাহাদের যত্ন করিবার জন্য যিনি তোমার প্রাণে স্নেহ ভালবাসা বা মায়া মমতা দিয়াছিলেন, তিনিই আবার তাহাদের জন্য অন্য উপায় করিবেন; তোমার তাহাতে দুঃখ কেন? এস, এস, যমের বাড়ী এস।

আবার ও কি? অত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছ কেন? কত কষ্টে উপার্জ্জিত এত ধন-জন, মান-সম্ভ্রম ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারিলে না বলিয়াই কি অত বড় করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতেছ?

হায়! নির্ব্বোধ নর! এ ছার শিশুর খেলনা, ভোজবাজীর জিনিসের জন্য এত অনুতাপ কেন? এখন এস, এস, যমের বাড়ী এস।

তোমাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া যাহারা এখন মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া গলা ছাড়িয়া কাঁদিতেছে, তাহারা বোধ হয় এখন ভাবিতেছে, তাহাদিগকে আর এ পথের পথিক হইতে হইবে না। পরে আবার প্রকৃতির নিয়মেই তাহারা প্রশান্ত হইবে—রাত দিন দেখিয়া আবার সকল শোক্ দূর করিবে। এখন ভাবিতেছে তাহারা তোমা বিনা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? পরে আবার তাহারাই ক্রমে ক্রমে কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই অথবা শীঘ্র চলিয়া না গেলেও আবার অন্য মায়াডোরে তাহাদের অন্তরে তোমার স্মৃতি-মাত্রও শেষে থাকিবে কি না সন্দেহ; তাই বলিতেছি সে সকল ভাবনা না ভাবিয়া তুমি সচ্ছন্দে চলিয়া এস; এস, এস, যমের বাড়ী এস?

এ বাড়ী ছাড়িয়া যে বাড়ী যাইতে হইবে, সে বাড়ী অতি ভয়ানক স্থান! সেই বাড়ী—যমের বাড়ীর পথও আবার ততোধিক ভয়াবহ! ভূলোক হইতে যমালয়ের এই পথের পরিমাণ প্রায় ৯৯ নিরেনব্বই হাজার যোজন। এই সুদীর্ঘ পথ উত্তপ্ত বালুকাময়; ইহার চতুর্দ্দিকে যেন শত শত দাবানল জ্বলিতেছে! এই পথ দিয়া যমদূতগণ পাপীর পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে করিতে দুই তিন মুহূর্ত্তের মধ্যে যমালয়ে লইয়া যায়। ভূলোকের সর্ব্ব দক্ষিণাংশে মৃত্তিকার নিম্নে জলের উপরই যমালয় অবস্থিত। ইহার চারিদিকে সেই কল্লোলিনী বৈতরণী নদী পরিখারূপে পরিবেষ্টিত! এইস্থান কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্ধকারময়! সর্ব্ব স্থলেই যেন নানা বর্ণের অগ্নিশিখা সমূহ প্রজ্জ্বলিত আছে; কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথায় পীত বর্ণের অগ্নিশিখা ধূ ধূ জ্বলিতেছে। নীল বর্ণের শিখাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী! ইংরাজ কবি মিল্টন ও বাঙ্গালী কবি মধুসূদন কল্পনাপ্রভাবে প্রেতপুরীর বর্ণনা বিশদরূপে যাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাহইতেও এ স্থান অতি ভয়ঙ্কর! কোটী কোটী বক্রমুখ ঊর্দ্ধলোম যমদূতগণ জীবের

স্থূল দেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্ম শরীর সমূহ ভূলোক হইতে অবিরত লইয়া আসিতেছে; আবার রাজাজ্ঞা পাইবামাত্রই মর্ত্ত্যধামে চলিয়া যাইতেছে। কোটী কোটী বিকটাকার প্রহরীগণ অনুক্ষণ অপরাধী জীবাত্মার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতেছে। যমপুরীর সেই ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া গভীর হুঙ্কার ধ্বনি অনবরতই উঠিতেছে; আবার ইহার এক পার্শ্বস্থ নরক সমূহের ভিতর হইতে যাতনাক্লিষ্ট জীবাত্মার কাতর ক্রন্দনের গম্ভীর রবে শমন-ভবন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মানুষ মনে করে, এই খানে আসিলেই বুঝি সংসারের সকল যাতনার অবসান হয়; কিন্তু সে কেবল পুণ্যাত্মার পক্ষে; পাপীর দুর্গতি এখানে সংসার অপেক্ষা শতগুণ বৃদ্ধি হয়।

এই ঘোরান্ধকারময় যমপুরীতে বৈতরণী তীরে ধর্ম্মরাজের অত্যুচ্চ লৌহময় অট্টালিকা অবস্থিত আছে। পুরী মধ্যে ধর্ম্মরাজ-মহিষী কালিন্দী সহচরীগণ সহ সদালাপে সদাই বিভোরা, তাহার বহির্দ্দেশে বিচারালয়। অপূর্ব্ব মণিমণ্ডিত সিংহাসনে যমদণ্ড হস্তে যমরাজ বসিয়া থাকেন; তাহার পার্শ্বদেশেই চিত্রগুপ্তের বিচিত্র আসন; উজ্জ্বল অয়স্কান্ত মণিতে সমগ্র যম-ভবন যেন আলোকিত! অন্ধকারময় স্থানে এই আলোকেই চিত্রগুপ্ত তাঁহার গুপ্ত তালিকায় জীবের পাপ পুণ্যের জমা খরচ ঠিক করিয়া কৈফিয়াত কাটিয়া রাখেন এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে খাতা দেখিয়া তলব দেন। অসংখ্য যমদূতগণ এই বিচারালয়ের চারিদিকেই ঘুরিতেছে ফিরিতেছে; এবং বিচার শেষ হইলেই অপরাধী পাপীগণকে বন্ধন পূর্ব্বক ইহার পার্শ্বস্থ অদূরবর্ত্তী নরক সমূহ মধ্যে লইয়া যাইতেছে। বিচারে যে জীবের যে নরকে বিধান হইয়াছে, তাহাকে সেই নরকে লইয়া যাইতেছে। এ সকল ব্যাপার অতি অপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর! মানুষ ইহলোকের সুখে বা দুঃখেই উন্মত্ত হয়, পরলোকে যে আবার এমন কাণ্ড আছে, তাহা কি সকল সময় সকলের মনে উদয় হয়? মৃত্যুর পর মানব-দেহ ত শ্মশানে বা গোরস্থানে যায়, কিন্তু তাহার সেই

ভিতরকার দেহ যে এখানে আসিয়া এইরূপ দশাগ্রস্ত হয়, তাহা বোধহয় অনেকের মনেই হয় না ; অধিক কি আধুনিক কলির মানব ত পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সর্ব্বদা সন্দিহান !

যমরাজ তাঁহার মাতামহ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা এই বিচারালয়ের সম্মুখেই এক বিস্তৃত সভা প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। এই সভাস্থল সুচারু শোভাস্থল হইল বটে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বলিয়া সেরূপ সুদৃঢ় হইল না। এই প্রাঙ্গণ সমুজ্জ্বল মণিমাণিক্য দ্বারা আলোকিত হইল। ইহারই এক পার্শ্ব হইতে নরকের নিকট দিয়া পাতালে যাইবার যে প্রশস্ত পথ আছে, তাহারও দুই পার্শ্ব সুসজ্জিত করা হইল। কারণ এ স্থানের কার্য্য শেষ করিয়া দেবগণ এই পথেই পাতালে যাইবেন। যমালয় হইতে পাতালের এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঁধা পথে কাহারও সমাগম নাই ; নীরব নিস্তব্ধ—এক শব্দ—কেবল অদূরবর্ত্তী নরক-মধ্যস্থ নানা প্রকার কোলাহলের একটীমাত্র অস্পষ্ট শব্দ। এই পথের ধারেও এক এক স্থানে কোন কোন ঘোর পাপীর পরীক্ষা-ক্ষেত্র বা শাস্তি-স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ঘোর পাপীগণকে প্রথমে এই সকল স্থানে পরীক্ষা দিয়া নরকে আসিতে হয় ; এখান হইতেই তাহাদের কঠোর শাস্তির আরম্ভ হয়।

পাতালের এই পথ অতি মসৃণ ও সরল, অথচ ভয়াবহ ! দেবর্ষি নারদ পাতালবাসীগণকে স্বর্গের দেবসভায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া ভূলোকে আসিতে দিক্ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন—নরকের এই পথে ! এই পথ-পার্শ্বস্থ শাস্তি-স্থান সমূহের বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখিয়া এবং নরকের তীব্র পুতি গন্ধে অধীর হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াও পড়িয়াছিলেন—এই পথে ! পবনদেবের সহিতও সাক্ষাৎ হয়—এই পাতাল-পথে ! নারদও কিন্তু সেই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবার জন্য চক্রান্তে দেবগণকে যমপুরী হইতে পাতালে লইয়া যাইবেন এই—

পাতাল-পথে !

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা।

শমনসদনে সভা-প্রাঙ্গণ প্রস্তুত হইলে দেবদেবীগণ স্বর্গ হইতে সকলেই সেই সভাস্থলে সমাগত হইলেন এবং সেখানের ন্যায় এখানেও স্ব স্ব আসনে উপবেশ করিলেন। তখন দেবর্ষি কহিলেন "চিত্রগুপ্ত! এখন দেখাও তোমার গুপ্তচিত্র বা তালিকা, শুনাও তোমার গুপ্তকথা?" চিত্রগুপ্ত কহিলেন "আর আমার কিছুই দেখাইবার বা শুনাইবার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে ক্ষণকাল আমাদের বিচার কার্য্য দেখিলেই আপনারা সকলেই অবগত হইবেন।" দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্থিরচিত্তে তাহাই অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন যমদূতগণ অসংখ্য জীবাত্মাসমূহকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া আসিয়া বৈতরণীর প্রবলস্রোতে নিক্ষেপ করিতেছে! কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী বৈতরণীর উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া এই স্থানটীতে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; সর্ব্বদক্ষিণাংশে বৈতরণীর এক এক ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে পড়িয়া পাপাত্মাগণ অগাধ বারিরাশী মধ্যে যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে! যমদ্বারে মহাঘোর বৈতরণীর এই স্থানটীই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক! প্রথমে পাপীগণ পার হইয়া যাইতেই এখানে দারুণ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এই সুগভীর সমুদ্রসদৃশ শঙ্কাজনক স্রোতঃস্বতী সলিলে সাঁতার দিতে সর্ব্বজীবের সর্ব্বশরীর শিথিল হইয়া যাইতেছে; পরে পরপারে প্রহরীপালঃপ্রহার করিতে করিতে সেই অবশ অঙ্গ সঙ্গে লইয়া শমন সমীপে লইয়া আসিতেছে।

বৈতরণীর উত্তর, পূর্ব্ব বা পশ্চিম প্রান্ত এত ভয়াবহ নহে; পুণ্যাত্মাগণ অক্লেশে তাহা পার হইয়া পরপারে স্বর্গদ্বারে শান্তিনিকেতন পাইতেছে এবং তথা হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্বর্গধামে স্থান পাইতেছে। বসুমতী পাপ-পুরুষ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এইদিকের বৈতরণী পার হইয়াই প্রথমে স্বর্গদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন; পরে নারদ দূর হইতে দেবগণকে তাঁহার অবস্থা দেখাইয়া তথা হইতে তাঁহাকে ঊর্দ্ধে আনিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। উপরের স্বর্গে বা নীচের নরকে—যেখানেই যাও, এই তরলাতরঙ্গিণী বিচিত্রা বৈতরণী সকলকেই পার হইয়া প্রেতপুরীর প্রান্তবিশেষে পদার্পণ করিতেই

হইবে। মৃত্যুর পরেই ত স্বর্গ বা নরকভোগ! মৃত্যুর অর্থই আবার বৈতরণী পার হইয়া যমালয়ে আগমন; পরে কর্ম্মফলে স্বর্গ বা নরক—দর্শন। তবে যাঁহারা পরমপুণ্যাত্মা বা সাধুপুরুষ, তাঁহাদিকে আর বিচারালয়ে আসিতে হয় না; বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাদিগকে পশ্চিমপথে বৈতরণী পার করাইয়াই একেবারে স্বর্গে লইয়া যায়। আর যাঁহারা পৃথিবীতে অনেক পুণ্যকার্য্য করিয়াছেন, যাঁহারা জগতে সৎকার্য্যেই সময় কাটাইয়াছেন, তাঁহারা বিচারান্তে পূর্ব্বপ্রান্তে বৈতরণীতটে নিম্নস্থ মনোরম শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম করিয়া স্বর্গ সুখভোগ করেন এবং তথায় বসিয়াও পারলৌকিক সাধনা সম্পন্ন করেন ও কিছুকাল পরে উর্দ্ধস্থ স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা পাপপুণ্য ভিন্ন জ্ঞান করিয়া উভয় কার্য্যই সম্পন্ন করেন, তাঁহারা তাহার তারতম্য অনুসারে শাস্তি ও শান্তি ভোগ করে; দক্ষিণ সীমায় শাস্তি আর উত্তরে শান্তি পাইয়া পরে আবার জঠর যাতনায় পড়িয়া জীব-জগতে আসিয়া থাকে এবং স্বীয় সুকৃতি বা দুষ্কৃতি অনুসারে পরে স্বর্গ বা নরকভোগ করে। যাহারা কেবল পাপ-পথের পথিক হইয়া পথের সম্বল হারাইয়া ফেলে, তাহারাই কেবল সুদীর্ঘকাল সুদুস্তর নরকার্ণবে পতিত হইয়া হাবুডুবু খায়; পরে বহুকাল এই দুঃসহ নরক-যাতনা সহ্য করিয়া পাপক্ষীণ হইয়া আসিলে, নিবৃত্তিরূপমার্গ দিয়া পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় পূর্ব্বক জননীজঠরে প্রবিষ্ট হয়। এবং সে সংসারে আসিয়াও বহুক্লেশ পায়। পাপ এতই ভয়ঙ্কর! আর পাপীর এতই দুর্গতি!

দেবগণ দেখিলেন যমদূতগণ যমরাজ-সম্মুখে প্রথমে যে সকল জীবাত্মাগুলি বন্ধন-পূর্ব্বক লইয়া আসিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অকাল গর্ভ-স্রাবের অসম্পূর্ণাবয়ব মানবদেহ অর্থাৎ ভ্রূণ! কতকগুলি পূর্ণ-গর্ভাবস্থাতেই মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; কতকগুলি সূতিকা-গৃহ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে; কতক-গুলি ২।৩।৪।৫ অথবা ততোধিক বৎসরের বা এক বা বালিকামাত্র! চিত্রগুপ্ত ইহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল, পিতামাতার সহিত জন্মান্তরে শত্রুতা, বিধবার গর্ভে অবৈধ উপায়ে জন্ম ও মৃত্যু, কীটযোনি হইতে ক্রমোৎকর্ষতা লাভ করিয়া শেষে মানব-দেহে পরিণতি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বিচার করিয়া বহু জন্মের বিবিধ পাপের উল্লেখ করিলেন এবং তাহাদের কাহাকেও বা বারম্বার এইরূপ জঠর-যাতনা ভোগ করিতে বলিলেন, কাহাকেও বা আবার নীচ যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে বলিলেন, কাহাকেও বা নরক মধ্যে নিক্ষেপের আদেশ দিলেন, কাহাকেও বা বারম্বার যাতায়াত হইতে অব্যাহতি দিয়া নক্ষত্র

লোকে নির্ব্বাসিত করিলেন, কাহাকেও বা একেবারে মুক্ত করিয়া নির্ব্বাণের জন্য সল্লোকে পাঠাইলেন।

এই বিচার দেখিয়া দেবগণ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, জনক-জননীর পাপ, শিশুদিগের জন্মান্তরীন পাপ, অতি মৈথুন, অস্বাভাবিক অভিগমন, অপক্ব বীর্য্যে সন্তানোৎপত্তি প্রভৃতি কলির নানাবিধ অত্যাচারই এই অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ। তাহার পর দেখিলেন যুবক-যুবতীগণের জীবাত্মাগণ আসিয়া কেহ বলিতেছে—"কেন আমায় এত শীঘ্র লইয়া আসিলেন? আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার আমি ভিন্ন যে আর তাহাদের কেহ নাই; এখন তাহাদের কে দেখিবে?" কেহ বলিতেছে—"এই সাধের সংসারের সকল সুখ কেন আমায় ভাল করিয়া ভোগ করিতে দিলেন না, আমি যে অল্পদিনমাত্র বিবাহ করিয়াছি, সে বিধবা বালিকার দশা কি হইবে?" কেহ বলিতেছে আমার জননী আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াই বিধবা হইয়াছিলেন, তাহার পর কত কষ্টে আমাকে মানুষ করিয়া আমার বিবাহ দিয়াছেন; এখন তাঁহার দশা কি হইবে, তাই ভাবিতেছি। কেহ বলিতেছে "আমার জন্য একটী ঘরই উৎসন্ন হইয়া গেল।" কেহ বলিতেছে "আমি যে আমার পিতামাতার বড় সাধের মানুষ করা ধন, তাঁহারা যে আমার জন্য পাগলের ন্যায় হইয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক অবিরল রোদন করিতেছেন; আমার সেই সাধের সঙ্গিনী, সবে মাত্র প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে—কেবলমাত্র প্রথম প্রেমের উন্মেষ দেখা দিয়াছে; সেও আজ আমার বিয়োগে আত্মহত্যার উদ্যতা হইয়াছে; কেন কেন, ধর্ম্মরাজ! আমাকে এত শীঘ্র লইয়া আসিলেন, এই কি ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম-সঙ্গত বিচার!" কেহ বলিতেছে "আমার এত অলঙ্কার, এত বিচিত্র বসন, এত স্বামী-সোহাগ কেন আমায় দুদিন ভোগ করিতে দিলে না?" কেহ বলিতেছে "এত সাধের ঘর বসত, এত সাধের স্বামী পুত্র কাহাকে বিলাইয়া দিয়া আসিলাম বল দেখি? আমি যে কেবল শাঁখা সাড়ী ও সিঁতার সিঁদুর লইয়াই সেই স্নেহময় প্রেমময় পরম পুরুষ পতিদেবতাকেই ইহকালে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতাম; কেন, ধর্ম্মরাজ! আমাকে সেই পতি পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন? কি পাপে আমার এমন দুর্গতি হইল বলুন? আমি ত আজও কিছুই জানি না; জানি কেবল সেই সতীর দেবতা পতি! তবে আপনার এ মতি হইল কেন? যাই দেখি একবার রাজরাণীর কালিন্দীর কাছে; তিনিও কি নিদয়া হইবেন?" কেহবা বলিতেছে—"আমি যে পতি

পুত্র রাখিয়া হাসিতে হাসিতে মরিতে পাইয়াছি, ইহাই আমার সৌভাগ্য; দেখিও ধর্ম্মরাজ! তাহাদিগের দিকে যেন অসময়ে দৃষ্টি দিও না।" এইরূপ কত জীবাত্মা কতই কাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে; চিত্রগুপ্ত তাহাদিগকে কেবল কহিতেছেন "সংসারের মায়া-ঘোর হইতে আসিয়া এখনও কি সেই মায়ায় কাতর হইতেছ? আলোক হইতে অন্ধকারে আসিলেই আঁধারটী আরও ঘোরতর দেখায়, সেইরূপ সংসারের সেই অভেদ্য মায়া-ব্যূহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এখনও সেই মোহের ঘোর কাটিতেছে না কি? ও সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন আসল কথা কও; কি পাপে যে এখানে আসিলে, তাহারই নিকাশ দাও!" তাহার পর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সভেদে কত লোক আসিল; সেই শত শত কত লোকেরই জীবনের কত দিনের ঘটনা এবং অতি সামান্য গুপ্ত কথা বা গুপ্ত ঘটনাটী পর্য্যন্তও চিত্রগুপ্ত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। জীবাত্মাগণ বুঝিল যে তাহাদের স্বকৃত কোন পাপ কার্য্যই লুকায়িত নাই; সকলই এখানে তালিকাবদ্ধ আছে। চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা শুনিয়া পাপাত্মাগণের মুখ শুকাইতে লাগিল; সংসারের সেই মায়া-ঘোর কাটিয়া গেল! তখন মনে হইল, যাহা-দিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহারা কেহই নহে; তাহারাও আবার এইরূপে এখানে আসিবে! জীব-পালনের জন্য বিধাতার বিচিত্র কৌশলই—এই মায়া! ভবের জীবকে শোক-যাতনায় ক্লেশ দিবার প্রধান কারণই—এই মায়া! পাপ-পথের পথিক হইবার প্রধান প্রলোভনই—এই মায়া! সেখানে এই মায়ার শিকলে বদ্ধ হইয়াই আজ এখানে এই দুর্গতি!

চিত্রগুপ্ত ইহাদের পাপপুণ্য সমস্তই বিবৃত করিলে, ইহারা তাহা সমস্তই স্বীকার করিল এবং স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে সকলেই শাস্তি গ্রহণ করিল। যাহার যে নরকের বিধান হইল, তাহাকে সেই নরকে যমদূতগণ বাঁধিয়া লইয়া গেল। আবার পরক্ষণেই আর একদল যমদূত আর একদল জীবাত্মা লইয়া আসিল; তাহাদের সহিত সশরীরে সজীবনে এক স্ত্রীমূর্ত্তিও আসিয়া উপস্থিত হইল। যমরাজ তাহা দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত যমদূতগণকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। যমদূতগণ করযোড়ে কহিল "প্রভো! আজ দুইজন বিষ্ণুদূতের সহিত বড়ই বিরোধ হইয়াছিল; এই যে একটী যুবক আর একটী বৃদ্ধ দেখি-তেছেন, ইহাদের উভয়েরই অন্ত কালপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমরা ইহাদিগকে এখানে ধরিয়া আনিবার জন্য গমন করিলে এই কামিনী কিছুতেই ইহাদের ছাড়িতে চাহে না; কেবল বলে 'আমার গুরুদেব আসিলে লইয়া যাইও

অথবা আমায়ও ঐ সঙ্গে লইয়া চল।' 'গুরুদেব' কথাটী রমণীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইবা মাত্রই দুই জন বিষ্ণুদূত আসিয়া আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। আমরা কহিলাম ইহারা পাপাত্মা, বিশেষতঃ এই যুবক ঘোর পাপাসক্ত, ইহাদের প্রতি তোমাদের কোনই অধিকার নাই। বিষ্ণুদূতয়দ্ব কহিল 'নাই বটে, কিন্তু যে সাধ্বী স্ত্রী ইহাদিগের দেহ স্পর্শ করিয়াছে, তাহার জন্য আর ইহারা যমালয় যাইবে না। তোমরা ফিরিয়া যাও। আমরা তাহা না শুনিয়াও ইহাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া বিষ্ণুদূতদ্বয়ও এই রমণীকে সশরীরে এখানে লইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে যাহা বিধান হয় করুন।"

যমরাজ সমস্ত অবগত হইয়া কহিলেন "ছি! তোমরা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ; কতযুগ গত হইল সেই কান্যকুব্জদেশের দাসী পতি ব্রাহ্মণ অজামিলের কথা কি তোমাদের মনে নাই? অজামিল ঘোর পাপী ছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে তাহার 'নারায়ণ' নামক পুত্রকে বারম্বার 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকায় তাহাকে আর আমার দূতগণ স্পর্শও করিতে পারে নাই! বিষ্ণুদূতগণের সহিত আমার দূতগণ বাক্‌বিতণ্ডা করায় আমি সেবার বিশেষ লজ্জিত হইয়াছিলাম। এবং অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। এবারও আবার সেইরূপ বিপদ দেখিতেছি; আবার কেন এমন মতি হইল বল দেখি? এখন চল, তাঁহাদের নিকট গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর; আমিও সঙ্গে যাইতেছি।"

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ স্বগণ সহ বিষ্ণুদূতদ্বয় সমীপে আগমন করিলেন; দেখিলেন দেব-সভার এক পার্শ্বে তাঁহারা দুই জন স্বর্গীয় লাবণ্যের ছটায় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহাদের শিরোদেশে কিরীট, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, পদ্ম-পলাশ তুল্য আয়ত আঁখি যুগলে জ্বলন্ত জ্যোতি! চারি হস্তে চারি অস্ত্র বা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম! গলদেশে পদ্মমালা, কটিদেশে পীত বর্ণের কৌষেয় বসন শোভা পাইতেছে! যমরাজ সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে সম্মান-প্রদর্শন করাইয়া দূতগণের দোষগুলি মার্জ্জনা করিতে বলিলেন এবং নিজেও ক্ষমা চাহিয়া এই ব্যাপারের বিষয় অবগত হইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। বিষ্ণুদূতদ্বয় কহিলেন "এই সাধ্বী ধার্ম্মিকা রমণী ভগবানের পার্ষদ সুবাহুদেবের শিষ্যা, ইহার হৃদয়ে দেব-জ্যোতি প্রবেশ করিয়াছে; সেই জন্যই এই রমণীর সংসর্গে থাকিয়া ইহাদেরও পাপ দূর হইয়া গিয়াছে। এই যুবকই রমণীর পতি—আর এই বৃদ্ধ ইহার পিতা! সংসর্গগুণে পাপীরও সদ্গতি—পুণ্যাত্মারও

অধোগতি!" যমরাজ সমস্তই বুঝিলেন, কারণ ইহাদের কথাও দেবসভায় প্রসঙ্গ-ক্রমে উঠিয়াছিল। তখন তিনি সেই যুবক ও বৃদ্ধের জীবাত্মাদ্বয় বিষ্ণু-দূতদ্বয়কে দিয়া সসম্মানে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

চিত্রগুপ্ত সেই সৌভাগ্যশালিনী জ্ঞানদাকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী দেবীগণ-পার্শ্বে দেবসভায় লইয়া গেলেন; জ্ঞানদা গুরুদেবের পাদপদ্মে প্রথমেই প্রণাম করিল, পরে বসুমতীর পদধূলি লইয়া সমস্ত দেবদেবীগণকেই প্রণাম করিল। এখন আর—কে বলিবে মানবী জ্ঞানদা? এখন তাহাকে সুরপুরবাসিনী সুর-রমণী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পুণ্য-প্রভায় পতঙ্গও পশু হয়—পশুও মানব হয়—মানবও দেবতা হয়! এই ত বিধির বিধান! এই ত আশীলক্ষ যোনির ক্রমোন্নতি! হায়রে! অন্ধ মানব এই সকল জানিয়া শুনি-য়াও অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া আগুনে হাত দেয়! পতঙ্গবৎ পাপাগ্নিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দেয়!

স্বর্গের সুবাহুদেব বা মর্ত্ত্যের মহর্ষি দেবসখা সেই সন্ন্যাসী, জ্ঞানদাকে কহি-লেন "এস বৎসে! দেব-সহবাসে; ভগবতপ্রেমে বিভোরা হইয়া পাছে তুমি কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিয়া যাও—অর্থাৎ পাছে তোমার পিতা ও পতিপদসেবায় বিঘ্ন ঘটে, তাই তোমার গুরুদেব তোমাকে অশেষ ক্লেশ দিয়াছে; উপবাসে বন-বাসে স্বামী-সহবাসে একাকিনী রাখিয়াছে; 'জরা' ও 'জ্যান্তেমরার' প্রতি যে দুইটী কর্ত্তব্য ছিল, তাহার অবসান হইল; এক্ষণে কেবল 'ধরা' ও ধরানাথ লইয়াই কাল-যাপন কর। ঐ দুই কর্ত্তব্যের জন্যই তোমাকে তখন দেব-সভায় লইয়া আসি নাই; অধিকন্তু তোমার উপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশও করিয়া-ছিলাম। এখন আর তোমার সে সকল শঙ্কা কিছুই নাই—তুমি নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কর। তোমার পিতা ও পতি তোমারই গুণে মুক্তপুরুষ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন"।

মহাবিষ্ণু, মহেশ্বর এবং পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ সকলেই জ্ঞানদাকে আশীর্ব্বচনে আশ্বস্তা করিলেন; বিশ্বেশ্বরী লক্ষ্মী ও মহেশ্বরী মহামায়া সস্নেহ বচনে তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। যিনি শাপভ্রষ্টা হইয়া মর্ত্ত্যে মায়া নামে পরিচিতা ছিলেন ও পরিণামে পাগ্‌লীবেশে পুলিন-প্রদেশে জ্ঞানদাকে যোগিনী-সাজে সাজাইয়াছিলেন, তিনিই জ্ঞানদার এই সৌভাগ্যের সোপান-স্বরূপ, সেই মায়া-সহচরী জ্ঞানদাকে সশরীরে পাইয়া আনন্দে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। মর্ত্ত্যে সেই বিশাল পদ্মা-নদীর চড়ায় একদিন যাহাকে ক্রোড়ে ধরিয়া রাখিয়া-

ছিলেন, আর আজ এই বিশাল বৈতরণী নদীর তীরে শমনসদনে সভাস্থলে সেই সাধের সঙ্গিনী, প্রাণের ভগিনী যুবতী যোগিনীকে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া প্রাণের সাধ মিটাইলেন এবং তাহাকে মায়া-দেবীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। মায়া-দেবী জ্ঞানদাকে কোলে লইয়া তাহার চিবুকে হাত দিয়া সাদর সম্ভাষণে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন এবং আপন গলার মোহন-মালা খুলিয়া জ্ঞানদার গলায় পরাইয়া দিলেন; পরে মায়া-দেবী আবার মহামায়ার পাদপদ্মে সেই ফুটন্ত স্বর্গীয় পদ্মটী উপহার দিলেন। দেবী ভগবতী সেই নারী ভাগ্যবতীকে সস্নেহে অমৃতপান করাইলেন; অমৃতপান করিয়া মরজীব জ্ঞানদা আজ অমর হইল! ধন্য নারীর নারী জন্ম! ধন্য সতীর পতি সেবা! ধন্য ধনির ধর্ম্মের জ্যোতি! ধন্য জ্ঞানদার জ্ঞানগরিমা! জ্ঞানদা প্রকৃতই জ্ঞানদা! ইহা অপেক্ষা জ্ঞানবতী জ্ঞানদা আর কি জ্ঞান দিবে?

তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন "চিত্রগুপ্ত! মর্ত্ত্যের মানবলিখিত তোমার সংগৃহীত সেই গুপ্তগ্রন্থের গুপ্তকথা গুপ্তভাব ও গুপ্তরহস্য এখন বিশেষ-রূপে বুঝিলাম; বুঝিলাম—ইহাই তোমার যথার্থ গুপ্তকথা, ইহাই প্রকৃতই চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা"! আবার জীবমাত্রেরই গুপ্তকথা যে তুমি ব্যক্ত করিতে পার, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিলাম; কারণ অদ্যকার জীবাত্মাগুলির বিচারকালে তুমি তাহাদের যে সকল গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলে, তাহা শুনিয়া সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি তোমার নিজের গুপ্তকথাটী বলিলেই তৃপ্তি লাভ করা যায়"। চিত্রগুপ্ত কহিলেন "আমার গুপ্তকথা কি আপনার অজানিত আছে? তবে বোধ হয় সভাসমক্ষে কীর্ত্তন করিবার জন্যই বলিতেছেন। যাহাহউক আমার কথা আর কি বলিব? যখন যমালয়ে পাপীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন ধর্ম্মরাজ একাকী তাহাদের বিচার-কার্য্যে অপারক হইয়া বিষম ব্যাকুল হইলেন এবং ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাহার উপায় স্থির করিয়া দিতে বলিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্ট চারি-বর্ণের যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কাহাকেও এ কার্য্যের উপযোগী না দেখিয়া স্বীয় কায় হইতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া পঞ্চমবর্ণের সৃষ্টি করেন। লেখা-পড়ার কার্য্য, বিচার কার্য্য ও দেবদ্বিজ-সেবার কার্য্য এই বর্ণের দ্বারাই হইবে স্থিরীকৃত হইল। সেই অবধি যমালয়ের লেখা-পড়ার বা হিসাব-পত্রের কার্য্য ও বিচারভার আমারই উপর ন্যস্ত আছে। ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমার বংশধরগণই মর্ত্ত্যে কায়স্থজাতি বলিয়া পরিচিত। শুনি-

তেছি কলিতে এখন তাহারা ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা সৎশূদ্র নামে অভিহিত হইতেছে; শূদ্রের ন্যায় একমাস অশৌচ গ্রহণ ও উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছে। বলিহারী কলিযুগ! ধন্য বলি তাহার মাহাত্ম্যকে"! দেবর্ষি কহিলেন "এখন সকলে কি আর এই চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা অবগত আছে? যাহারা জানে, তাহারাও তাহা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবাইয়া দিয়াছে। চিত্রগুপ্ত যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সর্ব্ব-জাতির পূজ্য ও প্রণম্য তাহা কি কেহ এখন জানে? মহাবীর ক্ষত্রিয়কুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হইতেও কায়স্থকে শ্রেষ্ঠ জানিতেন বলিয়াই চিত্রগুপ্তকে পূজা ও স্তব করিয়াছিলেন; মহামুনি পুলস্ত্য শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারেই চিত্রগুপ্তের পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; চিত্রগুপ্তের এইসকল গুপ্ত তত্ত্ব এখন কে অবগত আছে? চিত্রগুপ্তকে পূজা করিলে, প্রণাম করিলে, তাঁহার স্তব পাঠ করিলে যে জীবন পবিত্র—দেহ পবিত্র—গৃহ পবিত্র হয়—যমযাতনার অনেক লাঘব হয়, তাহা কি সকলে জানে? সকল বিষয়েই শাস্ত্রের বিধান জানিয়া কার্য্য করিলে কি আর কলিতে জীবের এত দুর্গতি বা নিগ্রহ হয়? এখন বেশ বুঝিয়াছি, তোমাদের বিচার-প্রণালী সুপ্রণালীতেই চলিতেছে—তোমাদের কার্য্যভার ন্যায্যভাবেই সুসম্পন্ন হইতেছে! অকাল মৃত্যুর আধিক্য বা রোগ-শোকের প্রাচুর্য্য একমাত্র পাপ হইতেই হইতেছে; তোমাদের দোষ কিছুই নাই। আমার ন্যায় সভাস্থ সকলেই বোধ হয় এই বিষয় বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন; এক্ষণে শমনের শাস্তি-স্থানগুলির অবস্থা অবলোকন করিলেই সকলের সকল সন্দেহ নিশ্চিতরূপে ভঞ্জন হইবে"।

দেবসভাস্থ সকলেই দেবর্ষির এই প্রস্তাবেই মত দিলেন। যমরাজের শাস্তি-স্থান দেখিতে ও যমালয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে অনেকেই উন্মত্ত হইলেন। অনেকেই আবার তাহাতে তত আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কেবল আলোচনা করিতে লাগিলেন আমূল চিত্রগুপ্তের গুপ্তগ্রন্থ পাঠ হইতে—**চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথা!!**

তৃতীয় অধ্যায়।

যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব।

যমরাজ নিজের নির্দ্দোষীতা আরও ভালরূপে প্রমাণ করিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র দেবগণকে দণ্ড-স্থানগুলি দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমে বৈতরণীর পর-পারস্থ একটী উদ্যান দেখাইয়া কহিলেন "অই উদ্যানে যে সকল প্রেতাত্মা দর্শন করিতেছেন, উহারাই প্রকৃত প্রেত ও প্রেতিনী! তিথি নক্ষত্র বিশেষে মানুষ মরিলে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি না হইলে, গয়ায় পিণ্ড না পাইলে জীবাত্মা সদ্গতি না পাইয়া প্রেতাত্মা হইয়া সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; বৈতরণী পার হইয়া এখানেও আসিতে পারে না; সর্ব্বত্র মল মূত্র মধ্যে অবস্থান কনিতে ভাল বাসে; আবার সময়বিশেষে, স্থান ও পাত্র বিবেচনায় মানব-দেহ আশ্রয় করিয়া বাস করে। ইহাকেই লোকে 'ভূতে পাওয়া' বা প্রেতিনীতে পাওয়া' বলে।

পরমেশ-সৃজিত প্রকৃত ভূত-যোনী ভূবলোকে ও পাতালে বাস করে; তাহারা কিন্নর গন্ধর্ব্বাদির ন্যায় এক প্রকার জাতি বিশেষ; তাহাদের দ্বারা কোন অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই। এই প্রেতাত্মিক ভূতগণ মর্ত্ত্যে লোকালয়েও উৎপাত করে; কিন্তু উপযুক্ত ওঝার প্রক্রিয়া বিশেষে পলায়ন করে। আবার পিণ্ড পাইলে ইহাদের গতিও হইয়া থাকে। এই ভৌতিক কাণ্ড মর্ত্ত্যের মানবগণ মধ্যে অনেকেই অবিশ্বাস করে; আবার অনেক জ্ঞানবান লোককেও বিশ্বাস করিতে দেখা যায়। বিশ্বাস না করিবার ত কোনই কারণ নাই। ভূত, প্রেতিনী, ব্রহ্মদৈত্য এবং পেঁচো পেঁচী সকলই এই প্রেতাত্মিক ভূতের অন্তর্গত। অই যে খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ প্রেতিনী ও ভূতগুলি দেখিতেছেন, উহারাই মর্ত্ত্যে পেঁচো পেঁচী নামে অভিহিত! সূতিকাগৃহস্থ শিশুসন্তান সমূহের দিকেই ইহাদের দৃষ্টি! মর্ত্ত্যে অনেক স্থলে এই পেঁচো পেঁচীকে প্রসন্ন করিবার জন্য পূজা হইয়া থাকে; বহু দূরদেশ হইতেও বহু ব্যক্তি সন্তান রক্ষার জন্য সস্ত্রীক আসিয়া সেই সকল সাধকের বাড়ী উপস্থিত হয় এবং পূজা দিয়া ঔষধাদি লইয়া যায়। এ সকল বিধান যে মর্ত্ত্যবাসী কোথায় পাইল, তাহা জানিনা; যাহারা অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ কার্য্য করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে কৃতকার্য্যও হয়। তাই বলি, পেঁচো পেঁচী এক প্রকার প্রেতাত্মিক ভূত-যোনী বিশেষ; সূতিকাগৃহের ক্লেদ রাশীর মধ্যে

থাকিতেই ইহারা ভাল বাসে। সদ্গতি না হইলে ইহাদেরও উদ্ধার হয় না। আজ কাল মর্ত্ত্যে এই ভৌতিকখেলার বড় প্রাদুর্ভাব! ভূতের আবির্ভাব ও ভূতের তিরোধান করিতে সক্ষম, এমন সকল প্রেত্নতত্ত্ববিদ (স্প্রিচুয়ালিষ্ট) অনেকেই দেখাদিয়াছেন; মিস্‌মেরাইজ করিয়া অর্থাৎ হস্তাদি সঞ্চালনের এক প্রকার প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা জীবিত মনুষ্যের হৃদয় মধ্যে মৃত মানবের আত্মার আবির্ভাব কেহ কেহ করিয়া থাকেন। আবার ইতি মধ্যে আমেরিকাবাসীগণ প্লান্‌চেট্ নামক এক প্রকার ভূত আনাইবার কল ভারতে পাঠাইয়া ভারতের নির্ব্বুদ্ধিতার পরীক্ষা করিয়াছিল। ভারতবাসী অনেকেই অর্থব্যয় করিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছিল; মনে ভাবিয়াছিল, দুই জন মিলিয়া এই কল কিছুক্ষণ নাড়িলেই ভূত আসিয়া তাহাদের ভূত-ভবিষ্যৎ লিখিয়া দিবে। কিন্তু মূলে সমস্তই ফাঁকী—সকলই বুজ্‌রুকী বুঝিয়া এখন তাহারা নিবৃত্ত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় চিট্ অর্থে বঞ্চনা করা আর প্লান্ অর্থে মতলব, কৌশল বা উপায়; তাই উহার নাম হইয়াছে "প্লান্‌চেট্" বা "প্লান্ টু চিট্" অর্থাৎ ঠকাইবার কৌশল! এইরূপ ভূত-প্রেত লইয়া মর্ত্ত্যে মধ্যে মধ্যে অনেক কাণ্ড হইয়া থাকে। মর্ত্ত্যে যাহাই হউক, অই দেখুন সেই প্রেতাত্মিক ভূতের আড্ডা! পিণ্ডাদি পাইলে ইহারা এখানে আসিয়া পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করে; আত্মহত্যাকারীগণের মধ্যে অনেকেই প্রথমে এই ভূত-যোনী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সহজে তাহাদের গতি হয় না; অনেক কষ্টে যদি কখন তাহার সদ্গতি হয়, তবে এখানে আসিয়াও সে ভয়ানক নরক-যাতনা পায়।

অই দেখুন, সভার দুই পার্শ্বে অনতিদূরেই আমার দণ্ডস্থান নরক-সমূহ সারিসারি স্থাপিত রহিয়াছে। দেখুন, দক্ষিণ পার্শ্বে—বৈতরণী, রৌরব, মহা-রৌরব, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, কালসূত্র, কুম্ভীপাক, কৃমি ভোজন, অসিপত্র বন, অন্ধকূপ, শূকরমুখ, সন্দংশ, সারমেয়াদন, তপ্তশূর্ম্মি, পূয়োদ, প্রাণরোধ, অয়ঃ-পান, অবীচি, লালাভক্ষ বিশসন, এবং বজ্রকণ্টকশাল্মলী এই এক বিংশ প্রকার নরক আর বাম পার্শ্বে সূচীমুখ, দন্দশূক, শূলপ্রোত, ক্ষারকর্দ্দম, পর্য্যাবর্ত্তন, অবট-বিরোধন এবং রক্ষগণ-ভোজন এই সাত প্রকার নরক অবস্থিত আছে। সর্ব্বশুদ্ধ এই আটাশ প্রকার নরকেই পাপীর দণ্ড-বিধান করা যায়। এতদ্ব্যতীত পাতালে যাইবার পথে কতকগুলি পরীক্ষা-স্থান আছে, তাহাতেও কঠোর শাস্তি দেওয়া যায়। এক্ষণে কি পাপে কোন্ নরকগামী হইতে হয় এবং কোন্ নরক কিরূপ ভয়ানক তাহা এক এক করিয়া অবলোকন করুন।

১। বৈতরণী—এই নদীরূপা নরক, সমুদায় নরকের পরিখা স্বরূপ! কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তুগণ নিয়ত এই নদীতে পরিভ্রমণ করিতেছে; বিষ্ঠা, মূত্র, নখ, চুল, হাড়, মেদ, মাংস ও চর্ব্বি সর্ব্বদাই ইহাতে ভাসিতেছে। সকল পাপীগণকে প্রথমেই এই নদীতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া সাঁতার দিয়া সভয়ে শমনসদনে আসিতে হয়; যাহারা সৎকুলোদ্ভব হইয়া স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় এবং কেবল পাপকার্য্যেই লিপ্ত থাকে, তাহারা পরলোকে আসিয়া বৈতরণীতে পড়িয়া ঐ সকল মল-মূত্রাদি ঘৃণিত বস্তু ভক্ষণ করে।

২। রৌরব—মহা হিংস্র সর্প হইতেও অতিশয় ক্রূর ভারশৃঙ্গ নামে এক প্রকার প্রাণী আছে, তাহার নাম রুরু! পৃথিবীতে মানুষ যে সকল প্রাণীগণের প্রতি হিংসা করে অর্থাৎ বিনাশ করে, সেই সকল প্রাণীই রুরু হইয়া এই নরকে বাস করে; তাই ইহার নাম রৌরব।

যে জীব যে প্রকারে যে মানুষ কর্ত্তৃক হিংসিত হয়, সেই জীব রুরু হইয়া সেই প্রকারে সেই মানুষকে এখানে হিংসা করে।

৩। মহারৌরব—এখানে ক্রব্যাদ নামক রুরুগণ মাংস গ্রহণার্থ বিবিধ যাতনা দিয়া জীবাত্মাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়।

যে পাষণ্ড পৃথিবীতে প্রাণী পীড়ন পূর্ব্বক পরিবারবর্গের ও আপনার ভরণ-পোষণ করে, সে এই মহারৌরব নরকে নিপতিত হয়।

৪। তামিস্র—এই নরক ঘোর অন্ধকারময়! পাপীগণ ইহাতে পতিত হইয়া পানাহারাভাবে কাতর এবং দণ্ডাঘাত ও তর্জ্জন গর্জ্জনে পীড্যমান হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়।

যে পুরুষ পরধন, পরস্ত্রী বা পরের পুত্র অপহরণ করে, যমদূতগণ তাহাকে ভয়ঙ্কর কাল-পাশে বন্ধন করিয়া বল পূর্ব্বক এই নরকে ফেলিয়া দেয়।

৫। অন্ধতামিস্র—এই ঘোরান্ধকারময় নরকে পাপীর স্মৃতি ও বুদ্ধি নষ্ট হয়; তাই ইহার নাম অন্ধতামিস্র!

যে পুরুষ কোন স্ত্রীর পতিকে বঞ্চনা করিয়া সেই স্ত্রীকে উপভোগ করে, যে ব্যক্তি 'এই দেহই আমি' 'এই ধন জন মানসম্ভ্রম সকলই আমার' বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক প্রাণীগণের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করে ও কেবল আপনার দেহের ও পুত্রকলত্রাদির ভরণ-পোষণ করে, সে যমদূতগণ কর্ত্তৃক বহু যাতনা পাইয়া এই নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৬। কালসূত্র—এই নরকের পরিধি অযুত যোজন! ইহা তাম্রময় অত্যুষ্ণ সমভূমি!

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিদ্বেষ, বিদ্রোহ বা বিপক্ষতা ব্যবহার করে, সে এই কালসূত্র নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ-হিংসক ব্যক্তি এই নরকে পতিত হইয়া উপরে সূর্য্যকরে ও নীচে অগ্নিসন্তাপে সন্তাপিত হয়; ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহার দেহের বাহ্য ও মধ্যভাগ সর্ব্বদা দগ্ধ হয়। সেই পাপী কখন দণ্ডায়মান থাকে, কখন উপবেশন করিয়া থাকে, কখন শয়ন করিয়া থাকে, আবার কখন বা চারিদিকে ধাবমান হইয়া ভ্রমণ করে। পশু-শরীরে যত লোম আছে, তত সহস্র বৎসর তাহাকে এই যাতনা ভোগ করিতে হয়।

৭। কুম্ভীপাক—এই নরকে যমদূতগণ পাপীকে উত্তপ্ত তৈলে পাক করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ইহলোকে উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সজীব পশু, পক্ষী বা যে কোন প্রাণীর বধসাধন পূর্ব্বক তাহাদের মাংস পাক করে, সেই নির্দ্দয়, নরাধম ও রাক্ষস-নিন্দিত ব্যক্তিও পরলোকে কর্ম্ম-দোষে কুম্ভীপাকে পড়িয়া তপ্ত তৈলে সিদ্ধ হয়।

৮। কৃমি ভোজন—এই নরকে লক্ষ-যোজন বিস্তৃত একটী কৃমি-কুণ্ড আছে; পাপীগণ কৃমি হইয়া এই কুণ্ডে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত হইলে বণ্টন করিয়া সকলকে না দিয়া ভোজন করে এবং যে মনুষ্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, অর্থাৎ যে, জীবনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচবারও কোন যাগ-যজ্ঞ করিয়া কাহাকেও কিছু না দেয় বা খাওয়ায়, সে এই কৃমি-ভোজন নরকে নিপতিত হইয়া নিজে কৃমি হয় ও ঐ সকল কৃমি ভোজন করে। অত্রস্থ কৃমিগণও আবার এই পাপীরূপ কৃমিকে ভোজন করিতে উদ্যত হয়। এই প্রকার যতক্ষণ না তাহার পাপ ক্ষয় হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সেই অকৃত প্রায়শ্চিত্ত পাপী নানা যাতনা ভোগ করে।

৯। অসিপত্র বন—এই নরক একটী ভয়ানক তালবন; প্রত্যেক তালপত্রের দুই পার্শ্বই তীক্ষ্ণধার তরবারি বা অসির ন্যায়!

যে ব্যক্তি বিপদকাল উপস্থিত না হইলেও বেদমার্গ-উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শাস্ত্র-পথ ছাড়িয়া পাষণ্ড ধর্ম্ম অবলম্বন করে, আমার ভয়ঙ্কর দূতগণ তাহাকে এই নরক মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কষাঘাতে তাহাকে অস্থির করে। সেই সুদারুণ

প্রহারের যাতনায় পাপী যেমন ইতস্ততঃ ছুটীয়া বেড়ায়, অমনি দুই দিকেই খরধার বিশিষ্ট সেই তালপত্র সকল অসিতুল্য হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকে।

১০। অন্ধকূপ—এই নরকও ঘোর অন্ধকারময়! ইহার কোন স্থানেই একটী মাত্রও আলোকরেখা দেখা যায় না।

যে ব্যক্তির বিধিদত্ত বিবেক বলে অন্তের বেদনা বুঝিবার ক্ষমতা আছে, সে যদি অনর্থক মশক মৎকুণাদি জীবগণের পীড়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে এই নরকে পড়িতে হয়। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মশক, মৎকুণ এবং মক্ষিকা প্রভৃতি যে কোন প্রাণী অই ব্যক্তি কর্ত্তৃক হিংসিত হয়, তাহারা চারিদিক হইতে এই নরকে তাহার প্রতি হিংসা করিতে থাকে। ঘোর অন্ধকারে তাহার নিদ্রা নষ্ট হইয়া যায়; সে কোথায়ও অবস্থানের স্থান পায় না—ঘোর অন্ধকারে অনবরত ভ্রমণ করিয়া নিয়ত ক্লেশ পায়।

১১। শূকর-মুখ—এই নরকে শূকরের মুখের তুল্য মুখবিশিষ্ট আমার দূতগণ ইক্ষুদণ্ড নিষ্পীড়ন করিয়া রস বাহির করার ন্যায় পাপীকে পীড়ন করে।

যে রাজা বা রাজপুরুষ অথবা যে কেহ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়, দূতগণ তাহাকে এই শূকর-মুখ নরকে ফেলিয়া উক্ত প্রকারে নিপীড়ন পূর্ব্বক বিষম দণ্ড দেয়।

১২। সন্দংশ—এই নরকে আমার কয়েক-জন বিকটাকার দূত লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সন্দংশ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে।

যে ব্যক্তি বল পূর্ব্বক অথবা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে অপরের সুবর্ণ রত্নাদি অপহরণ করে, এই নরকে পড়িয়া দূতগণ কর্ত্তৃক উক্ত অগ্নিপিণ্ড ও সন্দংশাঘাতে তাহার দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়

১৩। সার-মেয়াদন—এই নরকে সাতশত বিংশতি সংখ্যক কুক্কুর করাল বজ্রতুল্য মহাদংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া আছে।

যে ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে, গৃহে অগ্নি দেয় কিম্বা প্রাণ-বিনাশার্থ বিষপান করায়, তাহাকে এই নরকে উক্ত কুক্কুরগণ কেবল চিবাইতে থাকে।

১৪। তপ্ত-শূর্ম্মি—যে পুরুষ অগম্যা-স্ত্রী গমন করে কিম্বা যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে উপগত হয়, এই নরকে দূতগণ দুই জনকেই কশাঘাত করিয়া তাড়না করে এবং পুরুষকে উত্তপ্ত লৌহময়ী স্ত্রী প্রতিমার আর স্ত্রীকে অগ্নিবৎ-পুরুষ প্রতিমূর্ত্তিতে আলিঙ্গন করায়।

১৫। পুযোদ—এই নরক এক প্রকার পূঁযের নদীবিশেষ! অনবরত ইহাতে কেবল পূঁয রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

যাহারা আপন আপন শৌচ আচার ও নিয়ম নষ্ট করে, লজ্জা ত্যাগ করিয়া পশুবৎ স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়ায়, তাহারাই এই নদী নরকে পড়িয়া পূঁয রক্ত খায়। যাহারা পরনিন্দা ও পরগ্লানি করে এবং লোকের সুনাম ও সুযশ অপহরণ করিয়া অনিষ্ট চেষ্টা পায়, তাহারাও পূঁয রক্ত খাইয়া এই নরকে কষ্ট পায়।

১৬। প্রাণ রোধ—যে সকল ব্রাহ্মণ, কুক্কুর ও গর্দ্দভ পালনপূর্ব্বক মৃগয়া দ্বারা বিহার করিয়া বিহিতকাল ছাড়াও মৃগ বধ করে, তাহারাই এই নরকে পড়িয়া আমার দূতগণ কর্ত্তৃক বাণ দ্বারা বিদ্ধ হয়।

১৭। অয়ঃ পান—যে ব্যক্তি ব্রতস্থ হইয়া অজ্ঞতা প্রযুক্ত মদ্যপান করে, কিম্বা যে ব্যক্তি নেশার বশীভূত হইয়া, লাম্পট্যাচরণের সহায়তার জন্য স্বেচ্ছায় সুরাপান করে, দূতগণ তাহাকে এই নরকে লইয়া গিয়া তাহার পদদ্বয় বক্ষঃস্থলে আনিয়া বন্ধন করে এবং অগ্ন্যুত্তাপে দ্রবীভূত লৌহ দ্বারা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ সেচন করিতে থাকে।

১৮। অবীচি—যে নরকে স্থলও পাষাণপৃষ্ঠস্থ বীচি বা তরঙ্গশূন্য জলের ন্যায় প্রকাশমান হয়, তাহাকে 'অবীচিমৎ' নরক বলে।

যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্যদানসময়ে, ক্রয় বিক্রয়কালে কিম্বা দানসময়ে কোন প্রকারে মিথ্যা কথা কহে; পরলোকে আমার দূতগত তাহাকে অধঃশিরা বা নিম্নমস্তক করিয়া নিরালম্বে শতযোজন উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে এই অবীচি নরকে ফেলিয়া দেয়। তথায় ফেলিয়া তাহাকে তিল তিল করিয়া কর্ত্তন করিতে থাকে। কিছুকাল এইরূপ যাতনা দিয়া আবার তাহাকে গিরিশিখরে উঠাইয়া তথা হইতে নরকে নিক্ষেপ করে। এই পাপী এই নরকে এইরূপ নানা যাতনায় নিপীড়িত হইতে থাকে। জালিয়াত, জুয়াচোর, শঠমিত্র ও পরানিষ্টকারী ব্যক্তিও এই অবীচিতে পড়িয়া এইরূপ দশাগ্রস্ত হয়।

১৯। লালাভক্ষ—দ্বিজকুলোদ্ভব যে ব্যক্তি কামপরায়ণ হইয়া সবর্ণা ভার্য্যাকে শুক্র পান করায়, আমার দূতগণ তাহাকে এই লালা-প্রবাহিনী নদীরূপা নরকে নিক্ষেপ করিয়া, লালা ও শুক্র পান করায়।

২০। বিশসন—যে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি কেবল দম্ভ প্রকাশের জন্য যজ্ঞে পশু ছেদন করে, তাহারা পরলোকে আসিয়া বিশসন নরকে

পতিত হয়। আমার দূতগণ এই নরকে বিবিধ যাতনা দিয়া তাহাদের অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়।

২১। বজ্রকণ্টকশাল্মলী—এই নরকে রাশী রাশী বজ্রতুল্য কণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ আছে। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে পশ্বাদি-যোনিতে উপগত হয়, দূতগণ তাহাকে এই নিরয়ে নিক্ষেপপূর্ব্বক উক্ত শাল্মলীর উপর আরোহণ করাইয়া টানিতে থাকে।

এক্ষণে বামপার্শ্বস্থ অই সাত প্রকার শাস্তিস্থান বা নরক অবলোকন করুন।——

১। সূচীমুখ—যে ব্যক্তি জগতে ধনমদে 'আমিই শ্রেষ্ঠ' এইরূপ গর্ব্ব করিয়া লোকের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে; পাছে কেহ অর্থ অপহরণ করে, এই ভয়ে আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনদিগের প্রতিও আশঙ্কা বা সন্দেহ করে, অর্থব্যয় চিন্তায় যাহার মুখ ও বুক সততই শুকায় এবং যে যক্ষের ন্যায় কেবল অর্থের রক্ষামাত্র করে, সেই ব্যক্তি মরণান্তে এই সূচীমুখ নরকে পতিত হয়। এখানে আমার অনুচরগণ সেই কৃপণ ধনরক্ষক পাপীকে তন্তুবায়দিগের ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সূচী বিদ্ধ করিয়া সূত্র বয়ন করে। যাহার অন্তর স্বার্থে ভরা, সে যদি প্রথমে নিঃস্বার্থভাব দেখায়, তাহারও পরিণামে এই দশা হয়।

২। দন্দশূক—যে ব্যক্তি উগ্র-স্বভাব হইয়া প্রাণীগণের উদ্বেগ জন্মায় অর্থাৎ যাহাকে দেখিলেই মনুষ্য বা অপর প্রাণী সর্ব্বদা শঙ্কিত হয় ও অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা করে, সে মরণান্তে যমপুরীতে নীত হইয়া এই নরকে পতিত হয়। এখানে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্প সকল তাহাকে ইন্দুরের ন্যায় ধরিয়া গিলিয়া ফেলে।

৩। শূলপ্রোত—সংসারে সকল জীবেরই জীবিত থাকিতে বাসনা আছে; কিন্তু যাহারা দুর্ব্বল জীবজন্তু বা কীট পতঙ্গাদিকে কেবল ক্রীড়া-কৌতুকের সামগ্রী মনে ভাবিয়া আমোদচ্ছলে তাহাদিগকে সূত্র বা শূলে বিদ্ধ করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা এই নরকে পড়িয়া শূলাদিতে বিদ্ধ এবং ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত হয়। চারিদিক হইতে তীক্ষ্ণধার চঞ্চুবিশিষ্ট পক্ষীগণ তাহাকে আঘাত করিতে থাকে; তখন তাহার স্বকৃত পাপ স্মরণ হয়।

৪। ক্ষার কর্দ্দম—সংসারে স্বয়ং অধম হইয়া যে আপনাকে মহৎ বলিয়া অহঙ্কার করে এবং জন্ম ও তপস্যা, বিদ্যা ও বর্ণ, আচার ও আশ্রম দ্বারা

শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিকে অসম্মান করে, সেই পাপী মরণান্তে এই ক্ষার কর্দ্দমময় নরকে নিম্ন-মস্তক হইয়া নিপতিত হয় এবং ঘোরতর যাতনা ভোগ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে বন্ধুত্ব দেখাইয়া শেষে শঠতাপূর্ব্বক তাহার অন্তর বাহিরের গুপ্ত-তত্ব সকল কৌশলে অবগত হইয়া শত্রুতা সাধন করে, সেও এই নরকে পতিত হয়।

৫। পর্য্যাবর্ত্তন—যে ব্যক্তি গৃহস্বামী বা গৃহিণী হইয়া অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তিকে আগত দেখিয়া ক্রোধান্ধ হয় এবং আরক্তলোচনে বক্রভাবে তাহার দিকে দৃষ্টি করে, সে ব্যক্তি এই নরকে পতিত হয় এবং কঙ্কাদি পক্ষী-গণ বজ্রসম চঞ্চু দ্বারা তাহার চক্ষু দুইটী বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া দেয়।

৬। অবটবিরোধন—অন্ধকারময় গর্ত্ত বা গুহাদিতে যে ব্যক্তি প্রাণীগণকে আবদ্ধ রাখিয়া যাতনা দেয়, সে পরলোকে এই নরক মধ্যস্থ ঐরূপ স্থানে রুদ্ধ হইয়া গরল মিশ্রিত অনল ও ধূম দ্বারা গুরুতর যাতনায় নিপীড়িত হয়।

৭। রক্ষোগণ-ভোজন—যে সকল পুরুষ পৃথিবীতে অন্য পুরুষের প্রাণ হিংসা করে এবং যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষ পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা এই নরকে নীত হইয়া তমোরূপ রাক্ষস হয়। পরে পৃথিবীতে যাহা-দিগকে ইহারা বধ করিয়াছিল, তাহারাই আবার এখানে তীক্ষ্ণধার তরবারি দ্বারা ইহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করে এবং আনন্দের সহিত ইহাদের রক্তপান করিতে করিতে নাচিতে থাকে।

এ সকল নরকে কোন জাতিভেদ বর্ণভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ নাই। অধিক কি, স্ত্রী পুরুষও সকল স্থলে পৃথক্ পৃথক্ রাখি নাই। পাপের ফল সকলকেই সমানভাবে ভোগ করাই। তবে, যে সকল স্ত্রীলোক বেশ্যানামে পরিচিতা হইয়া একেবারে কুলের বাহির হয়, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র একটী সুবৃহৎ বিষ্ঠা-কুণ্ড বামপার্শ্বস্থ এই সপ্ত নরকের পার্শ্বেই অবস্থিত আছে; আবার যাহারা কুলে থাকিয়াও সতীত্ব-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, তাহাদের শাস্তি আরও ভয়ঙ্কর! এই কুণ্ডে ফেলিয়া তাহাদিগকে উত্তপ্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ঘন ঘন আলি-ঙ্গন ও সহবাস করিতে দেওয়া যায়।

আবার অই পাতাল-পথে পরীক্ষা-স্থান সমূহ অবলোকন করুন। এই স্থানেই দেবর্ষি নারদ পাতাল হইতে আসিতে দিক্ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন এবং পরীক্ষা স্থানের পাপীদিগের শাস্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই

মাত্র চিত্রগুপ্ত যে গুপ্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেন, তন্মধ্যস্থ পাপীগণের শাস্তিই দেবর্ষি দেখিয়াছেন; প্রথমতঃ সেই সুগভীর কূপ হইতে ধূমপুঞ্জ ভেদ করিয়া যে দুই জন দীর্ঘাকার ভীমমূর্ত্তি উঠিয়াছিল, তাহারা আমারই দূত! এক জনের স্কন্ধে যে বিষ্ঠা মাখান সুন্দরী কামিনী ছিল, সে সেই—মোহিনী! আর অন্য স্কন্ধে যে কাটা মুণ্ড ঐ রমণীর দিকে চাহিয়া খল খল হাসিতে ছিল, সে তাহার সেই সহস্তে বিনাশ করা—স্বামী! রমেশের মৃত্যু কারাগারেই হইয়াছিল, আর মোহিনী তাহার কিছু পূর্ব্বেই মরিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ আর এক জন দূত নিজ দেহের রক্ত পূঁয পানকারী যে দুই জন যুবাকে তুলিয়াছিল, তাহারা সেই পাষণ্ড রমেশ এবং হৃদয়প্রসন্ন। শেষোক্ত রাক্ষসীর ন্যায় স্ত্রীমূর্ত্তিটী সেই কচি মেয়ে আশালতা আর পুরুষটী সেই প্রভাস! তাহার পর গোলাম সর্দ্দারাদির দুর্দ্দশা দেখিবার পূর্ব্বেই নারদ ঠাকুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দেবর্ষির দেখা বিভীষিকার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবগণ তখন বুঝিলেন যে, নারদ প্রকৃতই চক্রীর চক্রান্তে পাতালপথে নরকে পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহারাও নারদের চক্রান্তে নরকে পড়িয়াছেন। যখন নরকে আসিতেই হইল, তখন সে গুলি ভাল করিয়া দেখিয়া যাওয়াই উচিত মনে করিয়া দেবগণ যমরাজ বর্ণিত সমস্ত নরকগুলি দেখিতে লাগিলেন; তথায় পাপীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল! পাপীগণ দুঃসহ যাতনা পাইতেছে আর কেবল বলিতেছে "কেন কুকর্ম্মে মতি হইয়াছিল, এখন যে আর সহ্য হয় না! হায় হায়—কি হইল?" এই বলিয়া তাহারা অবিরল রোদন করিতেছে। জ্ঞানদা তাহার দাদা প্রভাস ও রমেশ এবং মোহিনী ইত্যাদির পারলৌকিক দুর্দ্দশা দেখিয়া নীরবে কাঁদিয়া ফেলিল। তবে গুরুদেবের মুখে বলাই মামার স্বর্গবাস হইয়াছে শুনিয়া সে কিছু আশ্বস্তা হইল। দেবগণের হৃদয়ই যখন পাপীর দণ্ড দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন জ্ঞানদা ত কাঁদিতেই পারে। দেবর্ষি নারদ ভগবানকে কহিলেন "ঠাকুর! শীঘ্র পাতালে গিয়া যাহা হয় একটী সুব্যবস্থা ও সুমীমাংসা করুন; বসুমতীও পাপ-পীড়ন হইতে উদ্ধার হউন আর পাপীদেরও একটী মুক্তির উপায় হউক! যাহাতে ভবের জীব আর পাপ-পঙ্কে লিপ্ত না হইতে পারে, আর পাপীর এই কঠোর শাস্তির লাঘব হইতে পারে, এমন সকল উপায় শীঘ্র বলিয়া দিউন। পাপীর দুর্দ্দশা আর দেখা যায় না—সত্বর এ স্থান হইতে চলুন।"

অন্যান্য দেবদেবীগণও নারদের এই প্রস্তাবে মত দিয়া ভগবানকে সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে বলিলেন। নরকের তীব্র পূতীগন্ধে এবং পাপী-দিগের যাতনা-নিপীড়িত কাতর ক্রন্দনে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। সভাস্থ দেবদেবীগণ এবং অন্যান্য সকলেই এক্ষণে যমরাজকে নিঃসন্দেহে নির্দ্দোষী জ্ঞান করিলেন। তখন পাপকেই মূলাধার জ্ঞান করিয়া বসুমতীর প্রতি অত্যাচারকারী সেই পাপ-পুরুষের প্রতিই সকলে হইলেন ক্রোধে উন্মত্ত! আর বিশেষরূপে বুঝিলেন এই—**যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব!**

চতুর্থ অধ্যায়।

পাতাল পরিভ্রমণ!

এদিকে মহারাজা বলি দেবাদেশ পাইয়া সুতলে স্বভবনে আসিয়া সভার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি স্বীয় সুরম্য প্রাসাদ সম্মুখে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাতাল-শিল্পিগণকে সুবিস্তৃত সভাপ্রাঙ্গন প্রস্তুত করিতে বলিয়া স্বয়ংই কতিপয় অনুচরমাত্র সমভিব্যাহারে পাতালস্থ সপ্তলোক পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পাতালবাসী প্রত্যেককে স্বভবনে সভাস্থলে লইয়া আশাই তাঁহার উদ্দেশ্য! যাঁহারা দেবসভায় দেবসঙ্গে আছেন, তাঁহারা ব্যতীতও বিস্তর পাতালবাসীকে সভায় আগমন সম্বন্ধে নিমন্ত্রণ করিতে নিজেই বাহির হইয়াছেন। তাঁহার অন্তরে এমন বিমল আনন্দ আর কখন হয় নাই। যে ভগবান বামনরূপে ছলনা করিয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে তাঁহার ত্রিভুবন গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার দেহমাত্রকেও বরুণের কঠোর পাশ দিয়া বন্ধন পূর্ব্বক গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, পরিশেষে পাতালপ্রদেশে পুনরায় যিনি তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়া নিজেই তাঁহার দ্বারদেশে দ্বারবানরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষই স্বীয় সমুদায় অংশকলা বা বিভূতিবর্গকে সঙ্গে লইয়া সম্পূর্ণমূর্ত্তিতে তাঁহার ভবনে অধিষ্ঠান হইবেন, সেই সঙ্গে কত শত সাধু সজ্জন, কত সহস্র ঋষি তপস্বীগণ, কত লক্ষ পুণ্যাত্মা ও কত কোটী মুক্তাত্মা আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করিবেন, সেই আনন্দে বিভোর হইয়া তিনি নিজেই আজ পাতালের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন। দৈত্যেন্দ্র বলি পূর্ব্বাপর তাঁহার পিতামহ প্রহ্লাদের ন্যায় রাজ্য ঐশ্বর্য্যকে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করেন;

দিবানিশি সেই দুরারাধ্য দুর্জ্জেয় দেবতা-চরণই তাঁহার সাধনার ধন। তাই তিনি মনের উল্লাসে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে, এই সৌভাগ্য পাইবার আশে পাতাল-প্রদেশে দেশে দেশে বেড়াইতেছেন।

প্রথমে তিনি পাতালের মূলদেশে ত্রিশহাজার যোজন অন্তরে 'অনন্ত' নামধারী ভগবানের এক অংশ বা কলা সঙ্কর্ষণ দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিম্নে আর কোন আধার নাই; তিনি নিজেই নিজের আধার! আবার তিনিই এই সমগ্রবিশ্বেরও একমাত্র আধার! এই সহস্র শীর্ষ অনন্তদেব নাগরূপ সহস্র মস্তকে এই ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন। নাগপতিগণ প্রধান প্রধান ভক্তদিগের সহিত একান্ত ভক্তিযোগে তাঁহাকে নমস্কার করিতেছেন! নাগপতিদিগের কর্ণে অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডল শোভা পাইতেছে; সেই কুণ্ডল-প্রভায় তাঁহাদের গণ্ডস্থল অতি সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে! নাগরাজের কুমারীগণ নিজ নিজ কল্যাণ কামনায় সজলনয়নে অনন্তদেবের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতেছে। ভগবান সঙ্কর্ষণের রজতস্তম্ভস্বরূপ বাহুযুগলে নাগকন্যাগণ অগুরুচন্দন ও কুঙ্কুমাদি লেপন করিতেছে এবং সুমধুর সঙ্গীত সুধায় তাঁহার শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত করিতেছে! তাহাদের সেই অপ্সরী নিন্দিত বিলাস বিভ্রম, হাবভাব, হাস্যের রেখা এবং চক্ষের কটাক্ষ মোক্ষদাতার সমক্ষে সাতিশয় সুন্দর ও সুললিত দেখাইতেছে।

এই অনন্তধামে অনন্তগুণসাগর অনন্তদেব, শেষ, সঙ্কর্ষণ, হলায়ুধ, বলদেব ও আদিদেব অনন্ত এই পঞ্চনামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার কটীতে নীলাম্বর, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুদ্বয়ে বলয়, পৃষ্ঠদেশে হল এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালিকা শোভা পাইতেছে! সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার নবীন অম্লান তুলসী থাকায় ভক্ত-মধুকরগণের প্রেম-মধুপানেচ্ছা বড়ই বলবতী! আহা! কত কত সুর, অসুর, সিদ্ধগন্ধর্ব্ব, মুনি-ঋষি ও নাগবিদ্যাধরগণ সেই প্রেমময় পরমপুরুষের প্রেম-মধুপ্রাপ্তির আশায় ভক্তিভাণ্ড ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। দৈবযোগে দৈববলে বলীয়ান বলিরাজও তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ভগবচ্চরণে ভক্তিভাণ্ড ধরিলেন এবং স্বীয় বক্তব্যবিষয় বলিয়া এই দেবধামেরই পার্ষদগণ, ভক্তবৃন্দ ও নাগকন্যাদিগকে তাঁহার সঙ্গেই পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তদেব সানন্দচিত্তে সত্বর তাঁহার প্রার্থনা পূরণ পূর্ব্বক বলিকে বিদায় দিলেন। দৈত্যপতি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই পাতালে উঠিলেন।

মর্ত্ত্যবাসীগণের মনে হইতে পারে সমগ্র পাতালপ্রদেশ অন্ধকারময় ও

বিশুষ্ক! কিন্তু পাতালের এক এক স্থল স্বর্গাপেক্ষাও রমণীয়! ভূগর্ভস্থ সপ্ত-লোক বা সাতটী বিবরের প্রত্যেকটীই অযুত যোজন অন্তরে অন্তরে অবস্থিত। এই সপ্তলোকস্থ সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ শ্রেণী, কমনীয় কানন কলাপ, অত্যদ্ভুত উদ্যান রাজী, বিচিত্র বিহারভূমিসমূহ এবং শোভাময় ক্রীড়াস্থল সকল স্বর্গাপেক্ষাও অধিক মনোহর! সন্ততি ও সম্পত্তি, আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য এবং শান্তি ও ভোগ-সুখে সপ্তবিবরই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী! দৈত্যদানব ও নাগগণ এই সপ্তলোকের সর্ব্বস্থলেই গৃহস্থালী পাতাইয়া পরমসুখে বাস করিতেছে; তাহাদের স্ত্রী-পুত্র, বন্ধুবান্ধব এবং দাসদাসীগণও নিত্য অনুরক্ত ও সতত আনন্দিত। মায়াবী ময়-দানব নির্ম্মিত অত্যুজ্জ্বল মণিমাণিক্য খচিত অগণ্য অট্টালিকা অনেক স্থানেই অবস্থিত আছে! অত্রস্থ উদ্যানসমূহের মধ্যে কোন কোনটী যেন নন্দন কানন-কান্তি অপেক্ষাও অধিকতর সুশোভিত! সেই সকল উদ্যানস্থ লতাযুক্ত বৃক্ষ-শাখাসমূহ পুষ্প ও ফলের স্তবকে এবং কোমল কিশলয়ভরে অবনত হইয়া এমন শোভান্বিত হইতেছে যে, দর্শনমাত্র পরম পুলকে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে! অত্রস্থ সরোবর সকল নির্ম্মলজলে পরিপূর্ণ; কমল, কুমুদ, কুবলয় ও কহ্লার তাহার চতুর্দ্দিকে বিকসিত! আবার নীলোৎপল ও রক্তোৎপল মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া থাকায় সরসীসমূহের সৌন্দর্য্য ও শোভা শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। অত্রস্থ অধিবাসীগণ দিব্য ওষধি-রস অহর্নিশি অশনপান করায় কখন আধিব্যাধি বা রোগশোকাদির দ্বারা পীড়িত হয় না; কখনই তাহাদের মাংস লোলিত ও জরা হয় না; সুতরাং তাহাদের শরীরও বিবর্ণ হইতে দেখা যায় না কিম্বা বয়সের নিমিত্ত অবস্থাভেদও কখন হইবার সম্ভাবনা নাই। দুর্গন্ধ, ঘর্ম্ম, বা অনুৎসাহ তাহাদের কখনই নাই। ভগবানের সুদর্শনচক্র ব্যতীত মৃত্যুও তাহাদের উপর আধিপত্য করিতে পারে না। এই সকল ভূ-বিবরে চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ নাই; সুতরাং এখানে অহোরাত্র কাল বিভাগ নাই; আবার অন্ধকারও কোন স্থানে দেখা যায় না! মহাসর্প অনন্তের মস্তকস্থ প্রধান প্রধান রত্ন রাজীর রমণীয় আলোকে পাতালস্থ সপ্তলোকই আলোকিত।

ভূগর্ভস্থ সপ্তলোক বা সাতটী বিবরের প্রথম লোকের নাম অতল! তাহার নিম্নে বিতল, তন্নিম্নে সুতল, তন্নিম্নে তলাতল, তাহার নীচে মহাতল, তাহার নীচে রসাতল ও তন্নিম্নেই পাতাল! পাতালের নিম্নে বহু দূরে সেই অনন্ত বা শেষ নামক ভগবান সঙ্কর্ষণ দেব!

মহাত্মা বলি এই দেবদর্শনপূর্ব্বক পাতালে উঠিয়া তথায় বাসুকী, শঙ্খ,

কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, বাস্বল, অশ্বতর এবং দেবদত্তাদি বৃহৎ বৃহৎ ফণাধারী নাগরাজগণকে নিমন্ত্রন করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। এই সকল নাগের মধ্যে কাহারও মস্তক পাঁচ, কাহারও সাত, কাহারও দশ এবং কাহারও বা হাজার। তাহাদের ফণার মহা মহা সমুজ্জ্বল মণি দ্বারা পাতাল বিবরস্থ আঁধাররাশী দূরীভূত হয়।

তথা হইতে তদুপরে বলি রসাতলে গমন করিলেন; এখানে দৈত্য, দানব ও নিবাতকবচ প্রভৃতি কালকেয় অসুরগন সর্পাদির ন্যায় বসবাস করিতেছে। এই সকল অসুর জন্মাবধি মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও, ভগবানের মহিমা তাহাদের হৃদয়ে আছে বলিয়া তাঁহারই তেজে তাহাদের বীর্য্যমদ বিনষ্ট হইয়াগিয়াছে; বলি ইহাদের অনেককেও সঙ্গে লইয়া মহাতলে উঠিলেন।

মহাতলে বহুতর ক্রোধপরবশ ফণাধারী কদ্রুনন্দনগণ বাস করিতেছে; সেই সকল সর্পের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালীয় ও সুষেণ প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের দেহ অত্যন্ত লম্বা; গরুড়ের ভয়ে ইহারা সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন! বলি ইহাদের বলিয়া তাড়াতাড়ি তলাতলে উঠিলেন।

এখানে মায়াবীদিগের গুরু ময়নামা দানবরাজ ত্রিপুরারি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সুখে বাস করিতেছে। ভগবান শঙ্কর ত্রিলোকীর মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া প্রথমে তাহার তিনটী পুরী দগ্ধ করেন; পরে আশুতোষ আবার তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ময়দানবকে এই তলাতলে রক্ষা করেন। এই দানব শেষে শঙ্করপাদপদ্ম লাভ করিয়া ভগবানের সুদর্শন চক্র হইতেও নির্ভয় ও পূজ্য হইয়াছিল। বলিরাজ ময়দানবকে সঙ্গে লইয়া স্বীয়ভবন সুতলে উঠিলেন। যাঁহাদিগকে সঙ্গে আনিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট বাসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, এবং সভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদুপরিস্থ বিতলে উঠিলেন।

এখানে ভগবান শিব স্বীয় পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রজাপতির সৃষ্টিবৃদ্ধি নিমিত্ত শিবানীর সহিত একত্রে বাস করিতেছেন। এই বিতল হইতেই ভব এবং ভবানীর শুক্রে হাটকী নামে নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে আর বলি কাহাকে বলিবেন? এখানে যাঁহাকে বলিবার আবশ্যক, তিনিত স্বয়ংই শিবানীসহ আগমন করিতেছেন। অন্যান্য যাহাকে দেখা পাইলেন, তাহাকেই বলিয়া তিনি অতলে আসিলেন।

এখানে সেই ময়দানবের পুত্র বল নামক অসুর বাস করে। এই দানব

হইতেই ষণ্ণবতি প্রকার মায়া সৃষ্ট হয়; কোন কোন মায়াবী আজও, তন্মধ্যে কতক কতক মায়া ধারণ করিতেছে। এই অসুরের জৃম্ভাকালে অর্থাৎ 'হাঁই' তুলিবার সময় মুখ হইতে স্বৈরিণী, কামিনী এবং পুংশ্চলী—এই তিন প্রকার স্ত্রী উৎপন্ন হয়। যে সকল স্ত্রী সবর্ণ পুরুষে রতা, তাহারা স্বৈরিণী; যাহারা সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়েতেই রতা, তাহারা কামিনী; যাহারা কামিনী, অথচ অতিশয় চঞ্চলা, তাহারা পুংশ্চলী! এই সকল রমণীগণ বিবররূপ আবাসে প্রবিষ্ট পুরুষকে ধুতুরারস পান করাইয়া সম্ভোগ-সামর্থ করিয়া লয় এবং তাহা-দের অসাধারণ বিলাসবিভ্রম, বিলোল কটাক্ষ সানুরাগ হাস্য, এবং সাদর-সম্ভা-ষণ ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয়-সেবায় প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

যাহা হউক বলিরাজ বলাসুরকে এবং তত্রস্থ অন্যান্য যাহাকে পাইলেন সঙ্গে লইয়া পুনরায় সুতলে স্বভবনে করিলেন আগমন—দেখিলেন সুসজ্জিত ও সুসম্পন্ন হইয়াছে সভা-প্রাঙ্গন—অপেক্ষামাত্র এখন দেব-দরশন—শেষ হইয়াছে—

পাতাল পরিভ্রমণ!!

পঞ্চম অধ্যায়।

মুক্তির আয়োজন!

ভূগর্ভস্থ সপ্তলোক মধ্যে সুতল অতি সুন্দর স্থল! দেবরাজ ইন্দ্রের অমরা-বতী অপেক্ষাও অতুলনীয় অত্যুৎকৃষ্ট পুরী—এই সুতল! চতুর্দ্দশ ভুবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থল—এই সুতল! ধর্ম্ম-প্রাণ বলির পুণ্য-প্রভার পুরস্কার স্বরূপ পরম-পুরুষ নির্ব্বাচিত স্থল—এই সুতল! সুতলের সর্ব্বস্থলই সৌন্দর্য্য সুধাময় সমাবৃত! অত্রস্থ প্রকৃতির প্রত্যেক পরমাণুটী পর্য্যন্ত অনন্ত বসন্তের আকর স্বরূপ! দ্বাদশ স্বর্গ সম্মিলিত হইলেও এমন সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য ছবিখানি বুঝি আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। বলির কঠোর ধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা দেখিয়াই ভগবান বাছিয়া বাছিয়া ইন্দ্র অপেক্ষাও এমন মনোহর পুরী তাহাকে দিয়াছেন এবং সেই বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে নিজেই তাহার দ্বারে দ্বারী হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রহ্লাদ-পৌত্র বিরোচন-পুত্র বলি পাতাল পরিভ্রমণের পর স্বভবনে

আসিয়া সভা-প্রাঙ্গন সুসজ্জিত ও সুসম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। প্রাঙ্গন-পার্শ্বে পাতাল প্রদেশস্থ সপ্তলোকবাসীগণের যে সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, তিনি আবার তাহার মধ্যে নাগকন্যাদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান বিভাগ করিয়া দিয়া সেই স্থানসমূহ সুন্দর শোভায় শোভিত করিতে বলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহা সুসম্পাদিত হইল; তখন সেই নিখুঁত গঠনা, হরিণনয়না চিরনবীনা নাগকন্যাগণ অপরূপ রূপের পসরা লইয়া সেই সকল শোভাময়স্থল পূর্ণ করিয়া বসিল! স্বর্গের সুচারু শোভাস্থল সেই সভাস্থল, পাতালের এই সভা-প্রাঙ্গনের শতাংশের একাংশ মধ্যেও স্থান পায় না। বলিহারি—বলির পুণ্য কাহিনী; ধন্য বলি, বলির ধর্ম্মমাহাত্ম্য।

সেই ধর্ম্মবলে ও পুণ্য-ফলেই কলিতে বলির এই আজিকার সৌভাগ্য! তাই দলে দলে দেবগণ দেব-সভায় আসিয়া আজ বলিকে কৃতার্থ করিলেন। যমালয় হইতে সেই পাতাল পথে আসিয়া আজ বলি-ভবনে সুতলে সভাস্থলে সকলেই পদার্পণ পূর্ব্বক স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। স্বর্গের সেই বিরাট সভা অপেক্ষাও পাতালের এই দেব-সভা মহাবিরাট সভারূপে পরিণত হইল। পৃথিবীর নীচে পাতালে আজ প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত! উপরভাগ যেন আজ নির্ব্বাত ও নিস্তব্ধ! কিন্তু নিম্নের গুপ্তভল যেন আজ মহাঝটিকা-সঙ্কুল! সুরাসুর, দৈত্যদানব এবং নাগাধিপতি ও নাগকন্যাগণ সমবেত হওয়ায় সভার জনতা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে! কিন্তু সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ! বসুমতী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ভগবানের আদেশাপেক্ষায় তাঁহার চরণ-প্রান্তে চাহিয়া আছেন। আজ কখন তাঁহার উদ্ধারের উপায় হইবে—আজ তিনি কখন পাপ-পুরুষের প্রবল পীড়ন হইতে মুক্ত হইবেন—আজ তিনি ভগবানের সেই আশ্বাস-বাক্যস্বরূপ অভয়বাণী কখন কার্য্যে পরিণত দেখিতে পাইবেন; এই চিন্তায় তাঁহার অন্তর নিরন্তর আকুল হইতেছে!

এইরূপ আকুল প্রাণে ব্যাকুল হৃদয়ে বসুমতী জ্ঞানদাকে দেখাইয়া ভগবানকে কহিলেন "আমার এই বড় সাধের মেয়েটী সংসারে অনেক জ্বালা যাতনা পাইয়াছে, অনেক দুঃখ সহ্য করিয়াছে; শেষে কেবল অভাগিনী বৃদ্ধ পিতা, পাগল পতি ও আমাকেই পূজা করিয়া দিন কাটাইয়াছে। আমার আরাধনা না করিয়া জলগ্রহণ করে নাই; ইহার প্রতি আপনি যেরূপ দয়া-প্রকাশ করিয়াছেন, চিরদিন যেন এইরূপই থাকে। আর আমার সহিত ইহারও চিরদুঃখ দূর করিয়া দিয়া আর যেন ভব-যন্ত্রণা দিবেন না—এই আমার

দ্বিতীয় বা শেষ প্রার্থনা!" এই কথায় জ্ঞানদার চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা পড়িতে লাগিল; সে কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিল—

(দুঃখে তাপে) (সারা হ'য়ে) সার ক'রেছি ও চরণ।
আপন হ'তে তুমি হে আপন॥
নাহি কোন ঠাঁই কোথা বা জুড়াই
কোথা যাই, কারে বা সুধাই,
কাঙ্গাল ব'লে কোলে তুলে জুড়াও তাপিত জীবন॥
দীনের দায় এসেছ হেথায় পাপীতাপী মুখ পানে চায়
রাখ পায় আপন কৃপায়—
সঁপেছি প্রাণ রাঙ্গা পায় না জানি সাধন ভজন॥
বলি হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণধন॥

ভগবান ভক্তপ্রধানা জ্ঞানদার এই ভক্তি ও করুণরসাত্মক সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া সুতৃপ্ত হইলেন; এই কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া আঘাত করিল। তিনি করুণা-কটাক্ষে জ্ঞানদার দিকে চাহিলেন; জ্ঞানদা আশ্বস্তা হইল!

দেবগণমধ্যে অধিকাংশেরই কিন্তু নির্নিমেষ দৃষ্টি নাগকন্যাগণের নির্ম্মল নয়নকমলে! তাঁহারা অবিরত অপ্সরীগণ পরিবৃত হইয়াও ইহাদের শ্রী ও সৌন্দর্য্যের চমৎকারিত্ব অপ্সরী অপেক্ষাও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ দেখিতে লাগিলেন ও ভাবিলেন শ্যামসুন্দর এমন সুন্দর সামগ্রী সমূহেরও সৃষ্টি করিয়া ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন? ধিক্ তাঁহাকে বলি কিন্তু অনেকেরই মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন "অপ্সরী অপেক্ষাও ইহাদের রূপের জ্যোতি যেমন প্রতিভাত ও পরিস্ফুট দেখিতেছেন" সেইরূপ সুরলয় সংযোগে সঙ্গীতালাপেও সতত ইহারা অপ্সরীগণকে পরাজিত করিতে পারে। অনুমতি হয় ত—"। বলির কথা সম্পূর্ণ না হইতেই দেবেন্দ্র ইন্দ্র অমনি বাধা দিয়া কহিলেন "ইহাতে আর অনুমতি অপেক্ষা কি? ইহাতে কাহার আপত্তি? সকলেরই সম্মতি!" মহাত্মা বলি দেবাদেশ পাইয়া নাগকন্যাগণকে ইঙ্গিতে আদেশ করিলেন; তাহারা নাচিতে নাচিতে গাহিল।

"কে বলে পায় না চরণ, চায় না ব'লে।
রাখ পায়—চায় বা না চায়—আপন কৃপায় অবহেলে॥

রাখ্‌তে রাঙ্গা পায়, তোমারইত দায়,
জীব তরাতে আপনি হেথায়,
বোঝ প্রাণের জ্বালা প্রাণে প্রাণে—দীনের দুখে প্রাণ গলে ॥
জানিতে জনম, না জানি মরণ,
কোরতে রোদন শিখিনি কখন,
আপন সুখে আপনি মোরা—বেড়াই শুধু হেসে খেলে ॥

নাগকন্যাগণের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যের সার সম্পত্তিস্বরূপ অপ্সরীগণ যাঁহাদের নিত্য-সহচরী, তাঁহারাই যখন নাগকন্যাগণের নবীননধর গঠন, অস্বাভাবিক অঙ্গ-সৌষ্ঠব, ললিতলাবণ্য-প্রভা এবং সুমধুর সঙ্গীতসুধায় বিভোর হইলেন, তখন আর তাহাদের তুলনা কোথায়? নাগকন্যাকুলের কমনীয় কেশকলাপ ও মন-মোহন মাধুর্য্য দর্শনে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। দেবর্ষি কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন; সেদিক হইতে বসুমতীর সজলনয়নের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল! সঙ্গে সঙ্গে ভগবানেরও অমনি সেইদিকে টান পড়িল; তিনি সকলকেই সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "আর সঙ্গীতালাপে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না; বসুমতীকে পাপ-ভার হইতে মুক্ত করিবার উপায় সত্বরই স্থির করিতে হইবে"। তখন সকলেই চকিত-চিত্তে ভগবানের কথায় মনোনিবেশ করিলেন।

ভগবান কহিলেন "কলিযুগে মর্ত্তের যে সকল গুপ্ত পাপ-কাহিনী চিত্রগুপ্তের মুখে ব্যক্ত হইল; যাহা যাহা গ্রাম্য দেবদেবীগণ উল্লেখ করিলেন এবং যে পাপে যম যে নরকের বিধান করিতেছেন, সেই সকল পাপ কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? আর সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান যে সমুদায় আছে, তাহাতেই বা কোন ফল না দর্শিবার কারণ কি?" এই কথার উত্তরে সুবিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মুক্তাত্মা দাঁড়াইয়া কহিলেন "প্রভো! আপনার প্রদত্ত জ্ঞান-বলে বহু চেষ্টায় এই অধমাধম মানব মানবের হিতের নিমিত্ত যে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত আর্থিক অবস্থানুসারে বিধান করিয়াছিল, তাহা আর কেহই এখন গ্রাহ্য করে না; চৈতন্য-ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পর হইতেই আমার বিধানে অনেকের অনাস্থা জন্মিয়াছিল; সেই অবধি একাদশীর উপবাস ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সকল বিষয়েই সময়ে সময়ে পঞ্জিকানুসারে

মতদ্বৈধ ঘটিতেছে; স্মার্ত্তের মত ও গোস্বামীর মত পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার পর সভ্যতাস্রোতে এখন ত সকল মতই ভাসিয়া যাইতেছে। আপনারই প্রদত্ত জ্ঞানরূপ আদেশানুসারে এবং মহাত্মা মনুর সংহিতাও বিষ্ণু, যাবাল, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণের ব্যবস্থানুযায়ী পাপ বা পাতকরাশীকে অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতক এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিষ্ণু ঋষির মতানুসারে মাতৃহরণ, কন্যাগমন ও পুত্রবধূগমনকেই অতিপাতক বলে; সাধারণ চুরি, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীগমন, এবং এই সকল মহাপাতকীর সংসর্গ এই কয়েকটীকেই মহাপাতক বলে; স্বসম্পর্কীয়া বা স্বগোত্রা স্ত্রীগমন; রাজা, পুরোহিত, শিষ্য ও মিত্রপত্নীগমন, চণ্ডালিনী, সন্ন্যাসিনী বা বিধবা, ধাত্রী, রজস্বলা-পরস্ত্রী, শরণাগতা স্ত্রী, অদৃষ্টরজস্কা অবিবাহিতা কন্যা ও আপন হইতে শ্রেষ্ঠতর জাতি বা বর্ণবিশেষের স্ত্রীগমন, গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ, কূটসাক্ষীদান, পিতৃমাতৃনিন্দা ও শরণাগত হত্যা প্রভৃতি পাপকে অনুপাতক বলে; অনু অর্থে সদৃশ বুঝায় বলিয়া এই সকল পাপকে মহাপাতকের সদৃশ পাপ বলে। মহাপাতক ও অনুপাতক প্রায়ই সমান পাপ! এই সকল পাপ আবার বারম্বার হইলে অতিপাতকরূপে পরিগত হয়। কোন পাতিত্য দোষ ব্যতীত পিতা মাতা গুরু পুরোহিত ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে পরিত্যাগকরণ, গোহত্যা, সাধারণ পরস্ত্রীগমন, অযাজ্য যাজন, সুদের সুদ গ্রহণ, ব্রতভঙ্গকরণ, আত্মবিক্রয় অর্থাৎ স্বয়ং পোষ্যপুত্র বা ক্রীতদাসাদি হওয়া, বিচারালয়ে বা লোকসমক্ষে অকারণে পরনিন্দা পরদোষ কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণের ঔষধ বিক্রয় ও লৌহ লাক্ষা, লবণ, তৈল, ঘৃত ও গুড়াদির ব্যবসাকরণ, সাধ্বের নিমিত্ত বহুতর জীবিত বৃক্ষলতাদি ছেদন, নাস্তিকতা অবলম্বন অর্থাৎ পরলোকাদি অস্বীকারকরণ, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মাদির আশ্রয় গ্রহণ, ধান্য বাড়ি দেওয়া, স্ত্রীহত্যা, পরহিংসা পরদ্বেষ, প্রথম রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে স্ত্রীসহবাস, নরহত্যাভিলাষে অভিচারাদি মন্ত্র প্রবর্ত্তন। বিবাহযোগ্য জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহকরণ, জন্মাবধি সংস্কারহীন বা অদীক্ষিত থাকা, ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ, অতিথি কিম্বা পোষ্যবর্গের আহার্য্য প্রস্তুত না করিয়া কেবল নিজের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন, তাম্র,ও পশ্বাদি নানাপ্রকার দ্রব্য চুরীকরণ, নিন্দিতান্ন অর্থাৎ তস্কর বা গনকদিগের অন্ন ভোজন, নৃত্যগীত বা বাদ্যাদির অষ্টপ্রহর অনুষ্ঠান, সাধারণের উপকারজনক উদ্যান বা পুষ্করিণী বিক্রয়করণ, এবং মদ্যপানশীলা স্ত্রীগমন ইত্যাদি উনপঞ্চাশ পাপকে

উপপাতক বলে। তাহার পর আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ আছে, তাহাদিগকে জাতিভ্রংশ, শঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ ও প্রকীর্ণিক এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যায়। পেঁয়াজ, রশুন বা মদ্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ, বন্ধুর সহিত কুটীলতাচরণ ও পুরুষ-মৈথুন প্রভৃতিকে জাতিভ্রংশ পাপ কহে। মেষ মহিষ, গর্দ্দভ ঘোটক, ছাগ মৃগ, হস্তী উষ্ট্র ও সর্প মৎস্য এই দশ প্রকার জীব-হিংসাকে শঙ্করীকরণ পাপ কহে। ম্লেচ্ছাদির সেবা করিয়া অর্থোপার্জ্জন, অনর্থক মিথ্যা বাক্য কথন, নিন্দিত বাণিজ্য ও নিন্দিত ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণকে অপাত্রীকরণ পাপ বলে। অল্পানিষ্টে মহদ্দণ্ডকরণ, ফল ফুল ও কাষ্ঠাদি চুরীকরণ এবং কৃমি-কীটাদি হত্যাকরণ প্রভৃতিকে মলাবহ পাপ কহে। মিথ্যাপবাদ দেওয়া বা গ্রহণ করা, বিহিত নিত্যকর্ম্ম না করা, শৃগাল কুক্কুর বা ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক দংশিত হওয়া এবং এই সকল ব্যতীত অনুক্ত যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ আছে, সেই সকলকেই প্রকীর্ণিক পাপ কহে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিরই এই সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পাতকগ্রস্ত হইতে হয়; যে স্থলে স্ত্রীগমনের উল্লেখ আছে, তথায় স্ত্রীলোকের পক্ষে সেই সকল পুরুষ গমন বুঝাইবে।

শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে তুষানল ও প্রাণত্যাগই অতি পাতকের প্রায়শ্চিত্ত! তদ্ব্যতীত ধেনুমূল্য ও দক্ষিণাদির ব্যবস্থাও আছে। তাহার পর গুরুতর মহাপাতক হইতে লঘু প্রকীর্ণিক পাপ পর্য্যন্ত সকল পাপেরই গুরু লঘু প্রায়শ্চিত্ত প্রথা দায়ভাগে বিশদরূপে বিধিবদ্ধ আছে। পাপের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে অজ্ঞানকৃত বা জ্ঞানকৃত পাপের পার্থক্য অনুযায়ী গুরু বা লঘু প্রায়শ্চিত্ত প্রজাপত্য, দ্বাদশ বা চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিকী ব্রত, চান্দ্রায়ণ অথবা কলিতে কেবল ধেনু ভূমি রজতকাঞ্চন বা তদভাবে তাহাদের মূল্য—পরিমিত সংখ্যক কাহন কড়ি, ধান্য ও দক্ষিণা দ্বারাই সম্পন্ন হয়। নিষিদ্ধ তিথি ও বার ব্যতীত দিবসে উপবাস ও মস্তক মুণ্ডনাদি করিয়া এই সকল প্রায়শ্চিত করিতে হয়। ছোট বড় সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত প্রথা প্রচারার্থ মর্ত্ত্যে কত শাস্ত্রই লিখিত আছে; এক গো-বধ-জনিত বহুবিধ পাপের বহুবিধ প্রকার প্রায়-শ্চিত্তেরই বিধান আছে; তাহা ছাড়া সূর্য্যের উদয় কিম্বা অস্ত সময়ে নিদ্রা, একাদশীতে বিধবার অন্ন ভোজন, জলে কিম্বা আগুনে বিষ্ঠা মূত্র ও শুক্রাদি অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ, পর্ব্বদিনে (অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও রবিবারে) এবং শ্রাদ্ধকরণান্তর সেই

দিনেই এবং ঋতুর প্রথম তিন দিনে স্ত্রীস্পর্শ বা সহবাস করিলে, দিবসে মৈথুন করিলে; উলঙ্গ হইয়া স্নান করিলে, নগ্না পরস্ত্রী বা নগ্ন পরপুরুষ দর্শন করিলে, ক্রোধ বা মোহবশতঃ আপন স্ত্রীকে মাতা বা ভগিনী বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিলে, ব্রাহ্মণাদির উপবীত ছিন্ন হইলে, অস্পৃশ্য স্পর্শ ও অভক্ষ্য আহার করিলে, আত্মহত্যার উদ্যত হইলে, অশুচি অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগের পর জলশৌচ না করিলে, অশুচি অবস্থায় বা উচ্ছিষ্ট অঙ্গে অন্ত্যজাদি স্পর্শ করিলে, প্রত্যেক তিথির নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, যে সকল সামান্য সামান্য পাপ হয়, তাহারও অল্লাধিক প্রমাণে প্রায়শ্চিত্ত আছে। মর্ত্ত্যের প্রত্যেক টোল চতুষ্পাঠিতে আমার স্মৃতিগ্রন্থের সহিত এখনও এ সকল ব্যবস্থা বিরাজ করিতেছে, কিন্তু গ্রহণ করে কে? পূর্ব্বে সামান্য পাপেও অর্থ দিয়া এই সকল ব্যবস্থা লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত; এখন অধ্যাপকদিগকে অর্থ না দিয়া সেই অর্থে আপাতমধুর অন্য একটী পাপকার্য্য করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। প্রায়শ্চিত্ত প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই ত যমালয়ে এই সকল রাশী রাশী নানাপ্রকার পাতকী ও পাষণ্ড-মণ্ডলীতে নরককুণ্ড পূর্ণ রহিয়াছে দেখিলাম, এবং এই জন্যই ত মর্ত্ত্যে এত কাসকুষ্ঠ ও শূলাদিরোগগ্রস্ত মানব দেখিতে পাওয়া যায়। পাতকীগণ বহুকাল নরকভোগ করিয়া নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় মানব জন্মগ্রহণ করিলেও সেই সকল পাতকের চিহ্ন স্বরূপ এক এক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। অতি পাতকীগণ মহাকুষ্ঠ বা গলিতকুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়; মহাপাতকী ও অনু-পাতকীগণ রাজযক্ষ্মা, গৃহিণী, প্রমেহ, অর্শ, উদরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, উন্মাদ, অশ্মরী বা পাথরী, বৃহৎ শ্বাস বা ক্ষয়কাস, পক্ষাঘাত, গণ্ডমালা, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ ও চক্ষু-নাশনশ্বী অন্ধ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়। উপপাতকীগণ জলোদরী, শূলরোগ, গলগণ্ড, ভ্রম বা ঘুর্ণি, মূর্চ্ছা, রক্তবর্ণ আব ও বিসর্পাদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়। প্রকী-র্ণিক প্রভৃতি পাতকীগণ বাতব্যাধি, বিচর্চ্চিকা (পাদক্ষতবিশেষ) কম্প, চিত্র-বপু, বল্মীক ও পুণ্ডরীকাদি রোগাক্রান্ত হয়। প্রায়শ্চিত্ত না হইলে অতি-পাতকীগণ দ্বাদশজন্ম, মহাপাতকী ও অনুপাতকীগণ সপ্তজন্ম, উপপাতকীগণ পঞ্চজন্ম এবং প্রকীর্ণিকাদি পাতকীগণ তিনজন্ম 'পর্য্যন্ত এই সকল রোগ ভোগ করে। মরণান্তে প্রায়শ্চিত্ত না হইলে যাহারা ইহাদের স্পর্শ করিয়া দাহ করিতে লইয়া যাইবে, তাহারাও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে। রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করিলে সকল পাপেরই শান্তি হয়; আবার বালক, স্ত্রীলোক, অজ্ঞ ও বৃদ্ধ

ব্যক্তির অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্তেও অজ্ঞানকৃত পাপের ক্ষয় হয়। কলির মানব পাপকার্য্যের এরূপ প্রতিফল পাইয়াও পুনরায় পাপ করিতে ছাড়ে না বা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেও উদ্যত হয় না; তবে কেমন করিয়া ফল দর্শিবে বলুন দেখি?" সংহিতা-প্রণেতা ঋষিগণ ও মহাত্মা মনু একবাক্যে স্মার্ত্তের এই কথাই স্বীকার করিলেন।

ভাবে ভোলা ভোলানাথ এতক্ষণ নীরব ছিলেন; প্রবল পাপপুঞ্জের প্রভূত বর্ণনা শুনিয়া তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভগবানকে কহিলেন "চলুন, আমরা অবতাররূপে মর্ত্ত্যে গিয়া এখনই এই সকল পাপরাশী দূরীভূত করিয়া দিই"। ভগবান সহাস্যে কহিলেন "তাহা যদি হইত, তবে আর এত কাণ্ডের আবশ্যক কি? আমার ত আর এখন যাইবার কথা নাই; একেবারে কলির শেষে কল্কি অবতারে গিয়া সমুদায় ধ্বংশ করিতে হইবে। এক্ষণে অন্য উপায় কি হইতে পারে?" তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন "এই সম্বন্ধে একটী সদ্‌যুক্তি ও সদুপায় স্থির করিতে হইলে বিশেষরূপ মর্ত্ত্যবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষকেই ভারার্পণ করাই উচিত; আমার বিবেচনায় চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই এ বিষয়ের সদুত্তর পাওয়া যাইবে। কারণ মর্ত্ত্যের গুপ্ততত্ত্ব চিত্রগুপ্ত যেমন জানেন, এমন আর কেহই নহে"। সকলেই সেই প্রস্তাবে মত দিলেন; ভগবান চিত্রগুপ্তকেই ইহার যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। চিত্রগুপ্তও তাহাই বলিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, এক্ষণে দেবাদেশ পাইয়াই পাপমুক্তির সহজ উপায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মুগ্ধ হইয়াছেন পাঠক, চিত্রগুপ্তের গুপ্তকথায়—সেই মুখে আবার শুনুন পাপমুক্তির সহজ উপায়! হইবে বিপন্না বসুমতীর বিপদ-বিমোচন, হইল এখন তাহারই—**মুক্তির আয়োজন!**

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুক্তির যুক্তি।

দেবাদেশ পাইয়াই দেব-সভামধ্যে চিত্রগুপ্ত হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে কহিলেন "কলিযুগে ভবের জীব যেরূপ পাপপ্রমত্ত, তাহাতে তাহাদিগের উদ্ধারের আশা অতি অল্প! আবার এখন লোকসকল এত সুখী হইয়াছে যে, কোন আয়াসসাধ্য কার্য্য তাহারা কোনক্রমেই করিবে না। দুদিনের পথ দু দণ্ডে যাইতেছে—বহু দূরের সংবাদ মুহূর্ত্তে পাইতেছে—সুপ্রণালীতে সময় নিরূপণ হইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাভ্যন্তরেও অগ্নি যাইতেছে—সকল সামগ্রীই সুপ্রাপ্য ও অনায়াস-লভ্য হইতেছে; আর এখন কিছুতেই কষ্ট করিতে হয় না; তবে কেন তাহারা পাপমুক্তির জন্য কোন ক্লেশকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? কেন তাহারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? কেন তাহারা কঠোর ব্রতাবলম্বন করিয়া অনর্থক অর্থব্যয়ে অর্থ-লোলুপ ভিখারী ব্রাহ্মণের উদর পূর্ণ করিবে? এখন যদি কোন সহজ ও সুখসাধ্য উপায় থাকে, তবে তাহাই করিতে হইবে। সে উপায় আর কি? সেই, যে উপায়ে মহাদেব মহাবিষ্ণুপদে ঘর্ম্মোৎপাদন করিয়াছিলেন—যে উপায়ে চৈতন্যদেব ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইয়াছিলন—যে উপায়ে জগাই মাধাই দস্যুদ্বয় ও রূপসোনাতন পাষণ্ডদ্বয় উদ্ধার হইয়াছিল, প্রথমতঃ সেই মুক্তিবীজ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন! যে পতিতপাবনী অবনীমণ্ডলে অবিরত পতিতকে পবিত্র করিতেছেন, সেই ভাগিরথী গঙ্গা-সলিলে স্নানাবগাহন কিম্বা কেবল মাত্র তাঁহাকে স্পর্শন বা দর্শনই দ্বিতীয় উপায়। আর তৃতীয় উপায় সেই জগৎপালনকর্ত্রী ভগবতী গো-সেবা। এই ত্রিবিধ উপায় সকল জাতি বা সকল শ্রেণীর লোকই সহজে অবলম্বন করিতে পারিবে—ব্রাহ্মণ শূদ্র বা চামার চণ্ডাল প্রভেদ নাই।

এই ত্রিবিধ উপায় ব্যতীত স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ স্বল্পক্লেশকর আরও কয়েকটী কার্য্য করিলেও সহজে পাপমুক্ত হইতে পারিবে। সময় থাকিতে অল্প বয়সে দীক্ষিত হইয়া দিনান্তে দুই একবার আপন আপন ইষ্টমন্ত্র জপ; কলিকালে কালভয়বারিণী কলুষনাশিনী কালীপদ পূজা; গ্রাম্যদেবদেবীগণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন; নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্যপালন এবং প্রাণায়ামাদি অল্পবিস্তর যোগাভ্যাসকরণ!

মর্ত্ত্যবাসী জনৈক সাধু কহিলেন "এই সকলে কি ফল ফলিবে? হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে যদি পাপমুক্তি হইত, তবে চৈতন্যদেব যে সঙ্কীর্ত্তন-সুধা-স্রোতে সমগ্র সংসার ভাসাইয়াছিলেন, তাহাতে মর্ত্ত্যে আর এতদিন একটী পাপীও থাকিত না। গঙ্গাস্নানেই যদি পাপীর পাপমুক্ত হইত, তবে আর পৃথিবীতে পাপীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইত না, গঙ্গাদেবী ইতিপূর্ব্বে নিজেই বলিয়াছেন যে, গঙ্গাস্নানে পাপমুক্ত হইয়াই পাপী আবার প্রভূত পাপ সঞ্চয় করে; আবার গঙ্গাস্নানেই পাপ মুক্ত হইতে পারিব ভাবিয়া যাহারা পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে ত দেবী কিছুতেই উদ্ধার করিবেন না; তবে আর গঙ্গাস্নানেই বা পাপমুক্তির উপায় কি করিয়া বলি? গো-সেবার পরিবর্ত্তে গোমাংস ভক্ষণার্থে গোহত্যার প্রশ্রয়দানই যাহাদের উদ্দেশ্য—রোগমুক্তির জন্য ব্রথ্ বা বিফ্‌টী এখন যাহাদের উপাদেয় পথ্য, তাহারা আবার গোসেবা করিয়া পাপ-মুক্ত হইবে? প্রথমে স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইয়া দীক্ষাটী শেষের জন্য রাখিয়া দেওয়াই যাহাদের কল্পনা, অথবা যাহারা দীক্ষার দরকার নাই ভাবিয়া থাকে ও গুরুকরণপূর্ব্বক গুরুকে গুরু জ্ঞান করিয়া নিজেকে লঘু মনে করিতে যাহারা অপমান বোধ করে এবং ইষ্টমন্ত্র জপে কোন ইষ্টই সিদ্ধ হয় না মনে করিয়া যাহারা উহাকে প্রলাপবাক্য বলিয়া উড়াইয়া দেয় ও অনর্থক সময়ের অপব্যবহার হইবে ভাবিয়া অনভ্যাসক্রমে তাহা ভুলিয়া যায়; তাহারা আবার দীক্ষিত হইয়া দিনান্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে? প্রতিমাপূজার নাম শুনি-লেই যাহারা খড় মাটীর পূজা ভাবে এবং পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া উহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, তাহারা আবার কালীপূজা করিয়া কলুষনাশ করিবে? বিষহীন সর্পের ন্যায় গ্রাম্যদেবদেবীগণ যাহাদের অভক্তি অসম্মান ও ক্রীড়া কৌতুকের সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়, তাহারা আবার তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিবে? স্বার্থই যাহাদের সর্ব্বস্ব, আপন লইয়াই যাহারা ব্যতিব্যস্ত, তাহারা আবার কি কর্ত্তব্য পালন করিবে? অল্প পরিশ্রমেই যাহারা কাতর, সহজ হিক্কা বন্ধ করিবার জন্য সামান্যক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করিতেও যাহারা অপারক, তাহারা আবার প্রাণায়ামাদি যোগ সাধনা কিরূপে করিবে? তাই বলি এ সকল প্রণালীতে যে ফল দর্শিবে বলিয়া আমার বোধ হয় না"।

চিত্রগুপ্ত কহিলেন "দেবর্ষি যে প্রকার কহিলেন, অধুনা মর্ত্ত্যের অবস্থা এই-রূপই বটে, কিন্তু আমি পাপমুক্তির যে যে সহজ উপায় বলিতেছি, এ গুলিতে যাহাতে লোকের প্রবৃত্তি আকর্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হইলে সকলই

নিষ্ফল হইবে। যদি এই সকল বিষয়েও লোকের প্রবৃত্তি থাকিত, তবে আর জগতে পুণ্যাত্মার অভাব হইবে কেন? এখন ধরাধামে অধর্ম্মের যেরূপ প্রশ্রয়—ভূলোক যেরূপ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয়, তাহাতে কষ্টসাধ্য কোন বিষযে লোকের প্রবৃত্তি ত যাইবেই না; তবে চেষ্টা করিলে এই সহজ উপায়সমূহের মধ্যে কোন কোনটীতে অনেকের আস্থা জন্মাইতে পারে। নদীয়ার চাঁদ গোরাচাঁদ যে ফাঁদ পাতিয়া আকাশের চাঁদ ধরিয়াছিলেন—শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় লুটাইয়া অঙ্গনা-সঙ্গ ছাড়িয়া ভব-রঙ্গ-ভূমির রঙ্গভঙ্গ সাঙ্গ করিয়া যে উপায়ে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মাতাইয়াছিলন—চৈতন্য অনন্য মনে চৈতন্যময় চিদানন্দের নামগান করিয়া যে কৌশলে মূর্চ্ছিত মানবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, সে সকল উপায় এখন কোন কার্য্যেরই হইবে না। এখন এই সভ্যযুগে সভ্যলোক সে সকল ভাবকে অসভ্যতা বলিয়া হাসিয়া উড়াইবে; এখন এই সভ্যতালোকে সভ্য লোকে সভাসমিতিই সর্ব্বোন্নতির সদুপায় বলিয়া স্থির করিয়াছে; বক্তৃতাবাগীশের অবিরাম বক্তৃতা-লহরীর তালে তালে নাচিতে শিখিয়াছে; স্ত্রীপুরুষের যুগল গলায় যৌথস্বরে তান মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছে; বিধর্ম্মীর বাক্যই বেদ-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে; এখন কি আর পূর্ব্বভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়? এখন স্থানে স্থানে ধর্ম্ম-সভা সংস্থাপিত করিতে হইবে; বক্তৃতার বাহারে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিকভাবে সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে হইবে; রূপক ছলে রামায়ণ মহাভারতাদির অর্থ করিতে হইবে; স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সমস্বরে সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতে হইবে; বিধর্ম্মীর মুখে স্বধর্ম্মের সুখ্যাতি বাহির হইবে; তবে ত মানুষের মন এই সকল সহজ উপায়ে ধর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিবে! নতুবা কিছুই ফল ফলিবে না।

এই সকল নূতন কৌশলে লোক সকলকে প্রথমতঃ বুঝাইতে হইবে যে, হরিনাম স্মরণ ও হরিনাম উচ্চারণই পাপমুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহজ উপায়! এই নাম-মাহাত্ম্যটী ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া সত্যভামার দর্পচূর্ণ ঘটিত তাঁহার তুলা-দান ব্রত এবং মহাপাপীর পরিত্রাণ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতে হইবে যে, হরি অপেক্ষা হরিনামের মাহাত্ম্যই অধিক। এক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই স্ত্রী ও পুরুষের পাপবিমোচনের প্রধান উপায়! মহাপ্রভু নিমাই বলিয়াছেন যে—'নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা, পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব-নামগ্রহণে ভবিষ্যতি'। অর্থাৎ হে হরি! তোমার নাম গ্রহণ সময়ে কবে

আমার নয়ন অশ্রুধারা দ্বারা, বদন গদ্গদ ভাবে রুদ্ধপ্রায় বাক্য দ্বারা এবং কণ্টকিত দেহাবয়ব পুলক দ্বারা শোভিত হইবে দেখিতে পাইব? যে প্রকার পাপীই হউক, যে ব্যক্তি পাপ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কেবল ভগবানের উপরই আত্মনির্ভর করিয়া তাঁহার শরণাগত হয় এবং প্রেমপুলকিত প্রাণে একান্ত অন্তঃকরণে তাঁহাকে ডাকিতে পারে, দীনবন্ধু দয়া করিয়া নিশ্চয়ই সেই পতিতকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লয়েন। হরিনামে সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ব-শ্রেণীরই সম অধিকার! এমন মধুর নাম উচ্চারণ মাত্রেই সকল পাপ ক্ষয় হয়; নাম-মাহাত্ম্য এইরূপ বুঝাইলে, নামের মহিমা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইবা-মাত্রই বসুমতীর পাপাসুর কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত দেহ অনেক সুস্থ হইবে।

শৈলসুতা ভাগিরথী গঙ্গামাহাত্ম্যের বিষয়ও বিশেষ বুঝাইতে হইবে ,এবং বলিতে হইবে যে—গঙ্গাস্নানমাত্রেই কিরূপে সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় হইবে? এরূপ ভাব যাহার মনে আসে, সে আবার কোটী ব্রহ্মবধ পাপে লিপ্ত হয়! গঙ্গাস্নানে যে জন্মান্তরীন মহাপাতকেরও নাশ হয়, গঙ্গাস্নানে ও গঙ্গামৃত্তিকালেপনে যে কঠিন কুষ্ঠব্যাধিও আরোগ্য হয়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিতে হইবে; যবন দরাপ খাঁও যে, গঙ্গাস্নানে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কৃত গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে। আরও বলিতে হইবে যে, কলিকালে শ্রেষ্ঠ-তীর্থই গঙ্গা—শ্রেষ্ঠ যজ্ঞই গঙ্গা—সর্ব্ব পুণ্যকার্য্যই গঙ্গাস্নান—সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তই একমাত্র গঙ্গা! পূর্ব্বকৃত পাপরাশী স্মরণ পূর্ব্বক অনুতাপবিদ্ধ হইয়া বাষ্পাকুললোচনে ভক্তিভরে কাতরকণ্ঠে একবার 'মা গঙ্গা' বলিয়া গঙ্গায় ডুব দিলেই সকল কলুষ দূর হইয়া যায়—সকল পাপের শান্তি হয়—সকল জ্বালা জুড়ায়! অন্তিমে অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে—যদি পাপী 'হরি হরি' বলে, তবে তার সকল পাপ যায় চ'লে! স্পর্শমাত্রেই গঙ্গাজলে অশুচি শুচি হয়—অপবিত্র পবিত্র হয়! ভগীরথের কঠোর সাধনা-ফলে কলিকালে কলুষনাশের জন্যই ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে দেবী অবনীতে অবতীর্ণা! অনেকের ধারণা যে গঙ্গামাহাত্ম্য আর অধিক দিন স্থায়ী নহে; লোকের সে ভ্রম দূর করিয়া দিয়াও বুঝাইতে হইবে যে, বরাহপুরাণের মতে দেবী 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' তাবৎ কালই অব-নীতে বিরাজ করিবেন।

গোধন অপেক্ষা ধন যে আর কিছুই নাই, তাহাও বুঝাইতে এবং দেখাইতে হইবে। ব্রহ্মা এককুল দ্বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ও গো সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ পার্থিব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ হইতে মন্ত্র আর গো হইতে

হবি বা ঘৃত উৎপন্ন করাইয়াইছেন। যে গৃহে ব্রাহ্মণগণ পদপ্রক্ষালন না করেন, যেখানে বালক ও বৎসগণ রোদন না করে, যেখানে স্বাহা, স্বধা ও স্বস্তি প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারিত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সমান! গোকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল হয়; গো-অস্থি লঙ্ঘন করিতে নাই এবং মৃত গরুর গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে নাই। গো হইতে উৎপন্ন গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও গোরচনা এই ষড়বিধ দ্রব্যই পবিত্র ও মঙ্গলজনক। গোমূত্রপানে রক্ত পরিষ্কার হয়, কুষ্ঠ ও প্লীহাদি রোগের শান্তি হয়; বিদেশী বিজ্ঞানবিৎগণও বলেন যে, গো-নিশ্বাস শ্বাসরোগের উপকারী এবং গো-দেহের তাড়িত দ্বারা স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়। গোময়ও গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র এবং শুচিকর! অগ্নিদগ্ধ স্থান গোময় লেপনে শীঘ্রই শীতল হয়। শুষ্ক গোময়ের ধূমে বায়ু শোধন হয়। অধিক কি ঘুঁটের ছাই দিয়া দাঁত মাজিলে অম্লরোগেরও উপকার হয়। গব্যহীন ভোজন বৃথা ভোজন বলিয়া কথিত আছে! গো হইতে অন্ন—গো হইতে দুগ্ধ—গো হইতে জীবন। এরূপ বুঝাইলে এমন জগদ্ধাত্রী ভগবতী গোকে, কে না পূজা করিবে? আরও বলিতে হইবে যে, বনবাসী ঋষিগণও পর্ণকুটীরে বসিয়া গো-সেবা করিতেন; ভগবানও ব্রজধামে গো-পাল লইয়া রাখাল হইয়াছিলেন। নিত্য গো সেবায় অতিপাতক ও, মহপাতকেরও নাশ হয়, গোর পদধূলি গাত্রে মাখিলে ও গোকে প্রসর্শ করিলে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।

দীক্ষা না হইলে দেহ শুদ্ধ হয় না! শেষ বয়সে দীক্ষিত হইলেও বিশেষ ফললাভ হয় না; অগ্রে শিক্ষা দীক্ষা, তবে ত মুক্তি মোক্ষ! দীক্ষিত হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপই যে ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রধান সহায়, এ সকল বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইতে হইবে; পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব কঠোর সাধনা করিয়াও বিনা দীক্ষায় লোচনে পদ্মপলাশলোচন দর্শন পান নাই। গুরুকরণ ব্যতীত কোন ধর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। গুরুর কৃপা ব্যতীত কোন দেবতাই প্রসন্ন হয়েন না। 'গ' অর্থে সিদ্ধিদাতা, 'র' অর্থে পাপদাহক, 'উ' অর্থে শম্ভু; এই তিন মিলিত হইয়া গুরু নাম হইয়াছে, গুরুকে মনুষ্য বোধ করা উচিত নহে; ব্রহ্মময় সাক্ষাৎ শিবজ্ঞান করিতে হইবে। দেবতা মন্ত্র ও গুরু এই তিনকেই নিরাকাররূপে একত্ব কল্পনা করিয়া সর্ব্বদা হৃদপদ্মে ধ্যান করিতে হয়। অগ্রে গুরুপূজা করিয়া পরে ইষ্ট দেবতা পূজা করিতে হয়। এইরূপ বুঝাইয়া প্রবৃত্তি লওয়াইতে হইবে।

প্রতিমা পূজার কথা শুনিয়াই যখন সকলে হাসিয়া উঠিবে, তখন এই

বলিয়া বুঝাইতে হইবে যে—যখন বিধর্ম্মিগণও কোন বিখ্যাত মানবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সম্মান প্রদর্শন করেন, তখন কৃতজ্ঞ হিন্দু সন্তান দেবমূর্ত্তির পূজা কেন না করিবে? হিন্দুও একেশ্বরবাদী এবং সেই নিরাকার চৈতন্যময় পরমব্রহ্মই তাহার উপাস্য! তবে সে কেবল মহাজ্ঞানী মুনি ঋষিগণের পক্ষে! গৃহস্থগণের পক্ষে প্রতিমা পূজাই প্রশস্ত! দুর্গোৎসবাদি কার্য্য গৃহস্থেরই উপযুক্ত! কারণ কর্ম্মকাণ্ডের অধীন মায়ায় আচ্ছন্ন গৃহস্থ হৃদয় সেই নিরাকার চিৎশক্তিকে ধারণাতেই আনিতে পারে না; মনে মনে বুঝিলেও ধারণা করা সুকঠিন; তাই ভগবান সাধকের প্রার্থনায় বা অন্য কারণে সময়বিশেষে যে সমস্ত মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সকলের কোন কোনটীকে উপাসনা করা কর্ত্তব্য! প্রতিমা সম্মুখে থাকিলে নৈসর্গিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে যে প্রকার প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, শূন্য-মণ্ডপে কখনই সেরূপ হয় না। হিন্দু যখন যে মূর্ত্তির পূজা করে, তখন তাহাকেই সেই অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম ভাবিয়া থাকে। খড়মাটীই যদি হিন্দুর আরাধ্য হইত, তবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বা বিসর্জ্জনের পরে কেহই তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না; আর খড়মাটী মনে হইলেও ভাবাবেশে প্রেমরসে প্রাণ পুলকিত এবং দেহ কণ্টকিত হইত না। সেই নিরাকার চৈতন্যরূপ প্রাণ যাহাতেই প্রতিষ্ঠা কর, তাহাতেই ভগবানের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। কলিকালে কালী প্রতিমা পূজাই বিধি; এখন লোক সকল দুর্ব্বল চিত্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কোন ষোড়শী মূর্ত্তি পূজার উপযোগী নহে; নরমুণ্ডমালিনী বিভীষিকাময়ী কালী মূর্ত্তিই কলিতে চিত্ত-দ্রবকারিণী ও তূর্ণসিদ্ধি-প্রদায়িনী হইয়াছেন। কলিতে শাক্তের মধ্যে কালীমন্ত্রোপাসকই শ্রেষ্ঠ, কলিতে পূর্ণফলপ্রদায়িনী কালীই শীঘ্র সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

গ্রাম্য দেবদেবীগণও যে মানবজাতির একান্ত পূজ্য, তাহা এইরূপে বুঝাইতে হইবে—হিন্দু বহু ঈশ্বরবাদী বা জড়োপাসক নহে; হিন্দু সমস্ত বস্তুতেই সেই অনন্ত অদ্বিতীয় পরমেশ্বেরের সত্তা অনুভব করে; যেমন মহৎ বা সামান্য যে কোন রাজপুরুষের যথোচিত সম্মান করিলে রাজভক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ অন্য যে কোন দেবতার পূজাতেও এক ভগবানের পূজা করা হয়; শক্তির ষষ্ঠাংশরূপিণী ষষ্ঠীর পূজা করিলেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজা করা হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে যেখানে যাঁহার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে কোন বস্তুতে অন্ধ বিশ্বাসের বশ-

বর্ত্তী বা প্রকৃত ঘটনা দ্বারাই হউক ঐকান্তিক মনঃসংযোগে উপাসনা করিলেই ঐশী শক্তি স্ফুরণ হইতে পারে ; এই জন্যই রোগীর আন্তরিক প্রার্থনায় ব্যক্তি-বিশেষের উপর বা বৃক্ষ প্রস্তরাদিতে সময়ে সময়ে দেবতার আবির্ভাব হয় ও ঔষধাদি বিতরিত হয় ; লোকে বলে—'জাহির হইয়াছে'। মনসা মাকাল ষষ্ঠি ও ইতু প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতাই সেই এক ভগবান! কর্ম্মবিশেষে সময়ে সময়ে ইঁহাদের প্রত্যেককেই আরাধনা করিতে হয়। কোন দেবতাই অসম্মান বা অশ্রদ্ধার পাত্র নহে।

কর্ত্তব্য-পালন সম্বন্ধে বুঝাইতে হইলে এইরূপ বলিতে হইবে যে, মানব-জীবনের উদ্দেশ্যই কর্ত্তব্য-পালন এবং কর্ত্তব্য-পালনই পরম ধর্ম্ম! জগতে জন্ম-গ্রহণ করিলেই মনুষ্যের কেবল কতকগুলি কর্ত্তব্য-পালন করিয়াই জীবলীলা শেষ করিতে হয়। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, গুরু-শিষ্য, ভাই-বন্ধু, প্রভু ভৃত্য, আত্মীয়-প্রতিবেশী, অন্ধ-আতুর, দীন-দুঃখী ও জীব-জন্তু প্রভৃতি সকলের প্রতিই মানুষের এক এক কর্ত্তব্য আছে। কেবল তাহাই যথানিয়মে পালন করিলে আর গৃহস্থের উপাসনার আবশ্যক হয় না। যবন, ইংরাজ প্রভৃতি বিধর্ম্মিগণও যদি কেবল কর্ত্তব্য-পালন করিয়া তাহাদের স্বধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারে, তবে তাহারাও মুক্তি পাইয়া স্বর্গলাভ করে। তুমি যাহার প্রতি কর্ত্তব্য-পালন করি-তেছ, সে তোমাকে কিছু করিতেছে কি না, ইহা দেখিবার দরকার নাই; তুমি একান্তমনে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হও—সুফল পাইবে। ভগবান যেমন অসহায় শিশু পালনের জন্য তোমার হৃদয়ে মায়া দিয়াছেন, সেইরূপ অক্ষম ভিক্ষুক বা তোমাপেক্ষা দরিদ্রকে সাহায্য করিবার জন্য তোমার প্রাণে দয়া ও দানেচ্ছা দিয়াছেন, তোমার সে সকল কর্ত্তব্য নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদিত হইলেই নিশ্চিত স্বর্গবাস। দানও কলিতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম! যেমন জগতে এক আকারের লোক প্রায় দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ মনের মতন মানুষও প্রায় দুইটী মিলে না; সেই জন্যই সংসারে সকল লোকের সহিত ব্যবহার করা বড়ই কঠিন। সাবধান হইয়া না চলিলে প্রতিপদে পদস্খলিত হইতে হয়। সবিশেষ সাবধান থাকিও—যেন কখন কাহাকেও মর্ম্মবেদনা দিও না, যাহাতে অপরের মনে কষ্ট হয়, অপরের চক্ষে জল আসে এমন কার্য্য করিও না; তাহাতে ঈশ্বরের নিকট গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। যতটা পারা যায়, পাপ হইতে দূরে থাকিয়া এইরূপ কর্ত্তব্য-পালনপূর্ব্বক হরিনাম করিয়া দিন কাটাইলেই জীবনের মহাব্রত সাধন হয়।

যোগাভ্যাসের উদ্দেশ্য এইরূপ বুঝাইতে হইবে যে—যোগবলে দেহ মন ও ইন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া ধর্ম্ম সাধনের সুবিধা করিতে পারা যায়, সেই জন্যই অল্প বিস্তর যোগাভ্যাসও বিশেষ আবশ্যক!

এইরূপে লোক সকলকে বুঝাইয়া এই সকলে প্রবৃত্তি লওয়াইতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এই গুলির মধ্যে কোন কোনটীতে প্রবৃত্তি হইলেও পাপের শাস্তি হইবে অথবা কেবল ভক্তিভরে মুক্তি বীজ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলেও পাপ দূর হইবে। এই সকলেই হইবে পাপমুক্তি! দেবগণও সকলে চিত্রগুপ্তের কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আগ্রহের সহিত করিলেন এই উক্তি! কলিতে ইহাই একমাত্র—**মুক্তির যুক্তি!**

সপ্তম অধ্যায়।

পাতালপর্ব্ব পরিসমাপ্ত।

দেবর্ষি কহিলেন "এপ্রকারে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু লোক সকলকে আরও কয়েকটী বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহাদের মনে আর কোন সন্দেহই থাকিবে না। শুকদেব গোস্বামী কলি সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা ভবিষ্যৎ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই সমান কার্য্য করে না কেন? মানবগণ পঞ্জিকায় ১২০ বৎসর আয়ু দেখিতে পায়; আবার শুকদেবই বা পঞ্চাশবৎসরমাত্র বলিয়াছেন কেন? সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্য দেখা যায় না কেন?" চিত্রগুপ্ত কহিলেন "শুকদেব বর্ণিত কলির ভবিষ্যৎ বাণী পদে পদেই খাটিতেছে, তবে স্থান বিশেষে মানবের বুঝিবার দোষে কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র! আয়ু-সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ও অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণই যে কেবল পাপ, তাহা ত মর্ত্ত্যবাসী অনেক মহাত্মাই যমালয়ে দেখিয়া আসিয়াছেন! আর শাস্ত্র সমূহ সময়বিশেষে সেই সেই সময়োপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই মূলে এক থাকিলেও সামঞ্জস্য দেখা যায় না; তাহা আর এখন তাহাদের বুঝিবার তত আবশ্যক নাই; এই মুক্তির সহজ নিয়মের কিয়দংশ পালন করিলেই যথেষ্ট হইবে।"

সভাস্থ কেহ কেহ এই কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন "যদি এত সহজেই সকলের পাপমুক্তি হয়, তবে ত আর শুকদেবের ভবিষ্যৎ বাণী ঠিক

থাকিবে না; কলিযুগ ত সত্যযুগেরই ন্যায় হইয়া উঠিবে; তবে আর কল্কী অবতারেই বা প্রয়োজন কি?" দেবর্ষি নারদ কহিলেন "এই সহজ নিয়ম কি কেহ সে প্রকার পালন করিতে পারিবে? কলিতে যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই; তবে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইলে—মর্ত্ত্যে নূতন উপায়ে অমূল্য হরিনাম সুধাস্রোত প্রবাহিত হইলে বসুমতীর অন্তর্জ্বালা ত অনেক নিবারণ হইবে; ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য! নিত্য হরিধ্বনি উঠিলে, গোধন সকল যত্নে সুরক্ষিত হইলে, লোকের নিকট মা গঙ্গাদেবীর মহিমা বাড়িলে বসুমতীর পাপ-ভার অনেক লাঘব হইবে। পাপীর পাপের হ্রাসবৃদ্ধি হউক বা না হউক, বসু-মতীর দুঃখের শান্তি হইলেই আমাদেরও যাতনার লাঘব হয় এবং দেবগণও আবার আরাম-সুখে নিদ্রিত হয়েন। পাপ-পীড়িতা বসুমতীকেও এখন এই মুষ্টিযোগ ভিন্ন অন্য ঔষধ আর কিছুই দেওয়া যাইতে পারে না"।

তখন ভগবান বসুমতীর বিষণ্ণবদনে ঈষৎ হাস্যের রেখা দেখিয়া কহিলেন "কেমন? এখন তোমার বাসনা সফল হইল ত? এখন তুমি আশ্বস্তা হইলে ত?" বসুমতী ধীরে ধীরে কহিলেন "প্রভো! সকলই ত হইল, এখন এই পাপমুক্তির সহজ উপায় প্রচার করে কে? এইরূপে নূতন ভাবে নূতন নিয়মে লোকের প্রবৃত্তি লওয়াইবে কে? তাহার কিছু ঠিক করিলেন কি?" দেবর্ষি কহিলেন "তাহা ত ঠিকই আছে; ভগবানের পার্ষদ শাপভ্রষ্ট সুবাহু আর তাঁহার শিষ্যা জ্ঞানদাই এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন"। ভগবান তখনই সুবাহু-দেবকে ডাকিয়া কহিলেন—"যাও সুবাহু! নৈমিষারণ্যে, যাও তোমার মর্ত্ত্যস্থ আশ্রমে! এই নূতন নিয়মে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইলেই তুমি শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় আমার পার্শ্বে স্থান পাইবে; ইহা ত পূর্ব্বে তোমার জানাই আছে। এক্ষণে লোক সকল স্ত্রীলোকের বাক্যই বেশী বিশ্বাস করে বলিয়াই তোমার শিষ্যাকেও সঙ্গে দিলাম; উহাকে আশ্রয় করিয়া তুমি কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবে; এদিকে বিধর্ম্মীগণ যাহাতে সনাতন ধর্ম্মের সুখ্যাতি করে, তাহার উপায় আমরা এখান হইতে করিব। যাও জ্ঞানদা! জ্ঞানদান করিয়া অজ্ঞান মানবের মুক্তিপথ পরিষ্কার কর! তোমার এই ব্রত সম্পন্ন হইলেই তোমাকে জ্ঞানালোকময় গোলোকে আনিব"। জ্ঞানদা কহিল "ঠাকুর! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় দেবদরশন পাইয়া আবার কি দেব-সঙ্গ ছাড়িয়া পাপরাজ্যে বেড়াইতে হইবে? দেব! দুঃখিনী মানবীকে এত সৌভাগ্য দিয়া আবার কেন দুঃখ দিবেন? এই কলিকালে মানবীর অদৃষ্টে যাহা কখন

ঘটিবারও নহে; গুরুপাদপদ্মের বলে আমার ভাগ্যে তাহাও ঘটিল; কিন্তু আবার কি নাথ নিষ্ঠুর হইলেন?" এই বলিয়া ক্রন্দনাকুলা হইয়া কাতর কণ্ঠে জ্ঞানদা গাহিল——

"নিবারি নয়ন বারি, দিঁলে দরশন,
বল নাথ পুন কেন নিঠুর এমন?
কেঁদে কেঁদে অভয় পদে ল'য়েছি শরণ,
মুছায়ে নয়ন বারি করিলে আপন।
কেন ফিরে দুঃখনীরে কর নিমগন!
মনে যদি ছিল এত, দিলে কেন অভয়পদ?
না পেয়ে কেঁদেছি কত, পেয়ে কেন কাঁদি এত
কাঁদান তোমারি সাজে, দুঃখে সুখে সর্ব্বক্ষণ।"

ভগবান কহিলেন "তোমার কোমল কণ্ঠনিঃসৃত ভক্তিরসাত্মক সুমধুর সঙ্গীতে আমি বড়ই পরিতৃপ্ত হইতেছি; তুমি আর কাঁদিও না জ্ঞানদা! যে গুরুমন্ত্র পাইয়া তুমি আমাকে পাইয়াছ, সেই গুরুপদে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া আমার মর্ত্ত্যের কার্য্য শেষ কর; পরে বিষ্ণুদূতগণ তোমাকে সশরীরে স্বর্গে আনিয়া তথা হইতে গোলোকে লইয়া আসিবে। মর্ত্ত্যে গিয়া সধবানারীগণকে পতিভক্তি শিক্ষা দাও—পতিমূর্ত্তিকে আমারই মূর্ত্তি জ্ঞানে তোমার ন্যায় পতিপদ পূজা করিতে উপদেশ দাও! পতিব্রতার পুণ্যফলে তাহার তিনকুল পবিত্র হয়। প্রচার কর যে, পুরুষের হরিভক্তি ও স্ত্রীলোকের পতিভক্তি ভিন্ন সকলই বৃথা! লোকাচারে মর্ত্ত্যধামে তুমি এখন বিধবা নামে পরিচিতা হইবে বটে, কিন্তু তোমার স্বামী স্বর্গধামে স্বর্ণপুরীতে বিরাজ করায় তোমার চির সাধব্য কখনই ঘুচিবে না। মর্ত্ত্যের বিধবাগণ যেন তোমারই ন্যায় সন্ন্যাসিনী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে আমারই নাম-গানে দিন কাটায়; পতিহারা হইয়া জগতপতিকেই যেন উপাসনা করে; পতিপ্রেমে প্রবঞ্চিতা হইয়া ভগবত-প্রেমেই যেন বিভোরা হইয়া থাকে; তাহা হইলেই তাহাদের স্বর্গের পথ পরিষ্কৃত হইবে ও চির-সাধব্য বজায় থাকিবে।"

দেবর্ষিও কহিলেন "যাও জ্ঞানদা! গুরুর সহিত পাপপ্রমত্ত পুরুষের প্রাণে তোমার কোমলকণ্ঠনিঃসৃত হরিনাম সুধাধারা ঢালিয়া দাও; তাহা হইলেই মৃতপ্রায় মূর্চ্ছিত মানব মৃতসঞ্জীবনী হরিনাম গানে শীঘ্রই সবল ও সচেতন হইয়া

মাতিয়া উঠিবে; সেই হরিধ্বনিতে অবনীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইবে ও বসুমতীর বিষাদক্লিষ্ট বদন হর্ষোৎফুল্ল হইবে। যাও বসুমতি! আর কেন নীরবে দাঁড়াইয়া আছ, জ্ঞানদা ও মর্ত্ত্যের মহর্ষি দেবসখার সহিত যাও; তোমার দুর্গতি ত এখন দূর হইল—তবে সকলে একবার 'হরি হরি বোল' বল"।

তখন সভাশুদ্ধ সকলেই 'হরিবোল হরিবোল' রবে পাতালপ্রদেশ প্রকম্পিত করিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং সকলেই সত্বর স্ব স্ব স্থানে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তখন দেব-পদরজ দ্বারা দৈত্যরাজ বলি ভূষিত করিলেন আপন অঙ্গ! 'হরি বোল' 'হরি বোল' বলিয়া সকলেই করিলেন সভাভঙ্গ! দৈত্যরাজ বলি পুনরায় হইলেন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত, এই স্থানেই—**পাতাল পর্ব্ব পরিসমাপ্ত!!!**

পরিশিষ্ট।

(১)

স্বর্গারোহণ।

ভাগ্যবতী জ্ঞানবতী জ্ঞানদা গুরুপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে গুরুর আশ্রমে সেই নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল মথুর তথায় যোগসাধনায় প্রবৃত্ত আছে; মহর্ষি দেবসখা তাহার সাধনা সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বনমালাবিভূষিত দ্বিভুজ মুরলীধারীর মোহনমূর্ত্তি দেখাইয়া দিলেন। মূর্ত্তি দেখিয়া মথুর উন্মত্তের ন্যায় গুরুপদযুগল জড়াইয়া ধরিল। মহর্ষি মথুরকে দেব-সভার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত এবং তাঁহাদের উপর যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে, সমস্তই বর্ণনা করিলেন। মথুর শুনিবামাত্রই গুরুর কার্য্যে সাহায্য করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন।

মহর্ষি জ্ঞানদাকে কহিলেন "দেব-সভায় যাইবার পূর্ব্বে তুমি সেই বনমধ্যে আমাকে যে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে সকলের প্রকৃত উত্তর চিত্রগুপ্ত মুখে শুনিয়াছ ত?" জ্ঞানদা কহিল "প্রভো! সমস্তই শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি; আর আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ নাই"। মহর্ষি কহিলেন "যোগশিক্ষার আর কিছু বাকী আছে কি?" জ্ঞানদা উত্তর করিল "না!" মহর্ষি কহিলেন "তবে চল, তিনজনে দেশভ্রমণে বাহির হই এবং নূতন নিয়মে ধর্ম্ম প্রচার করি"। তখন "যে আজ্ঞা" বলিয়া উভয়েই গুরুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

মহর্ষি দেবসখা শিষ্য ও শিষ্যা সমভিব্যাহারে সেই চিত্রগুপ্তকথিত নারদ-নির্দ্দিষ্ট ও নারায়ণের আদিষ্ট পাপমুক্তির সহজ উপায় সর্ব্বস্থানেই প্রচার করিতে লাগিলেন; তাহাতে শীঘ্রই সুফল ফলিল। জ্ঞানদার ন্যায় জ্ঞানবতী ও রূপবতী নারীর হরিগুণগানে মানবগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভীত হইয়া স্বধর্ম্মানুরাগী হইতে লাগিল—স্থানে স্থানে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, সুনীতিসঞ্চারিণী সভা ও হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা প্রভৃতি বহুতর ধর্ম্মসভাসমূহ সংস্থাপিত হইল—"বঙ্গবাসী, হিতবাদী" প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মমূলক সংবাদপত্র সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল—পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণানন্দ ও বিবেকানন্দ স্বামীর ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন—বিধর্ম্মীর মুখে এমন সনাতনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইতে লাগিল—বিধর্ম্মিণী রমণীমণি আনি বেশান্ত আসিয়া প্রশান্তচিত্তে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন—গঙ্গাস্নান ও গোসেবা প্রভৃতিতে অনেকেরই চিত্ত আকর্ষিত হইতে লাগিল—বসুন্ধরা হরিধ্বনিতে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতে লাগিল; ইহাতে মর্ত্ত্যে পাপকার্য্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি যাহাই হউক, বসুমতীর কিন্তু অনন্ত দুঃখের শান্তি হইল। স্বভাবতঃই সন্তানগণের স্বধর্ম্মানুরাগ অধিক দেখিয়া দেবী মহানন্দে আনন্দিত হইলেন।

এদিকে কার্য্য সিদ্ধি হইলে একদিন মহর্ষির হৃদয় গোলোকের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইল। সেদিন ধর্ম্ম-প্রচার কালে যেমন তাঁহারা গাহিতেছেন।

"ভব-পারাবারে।
এক কাণ্ডারী হরি অকুল পাথারে॥
দীন জন চরণ চাহে, মুখ চাহি সকাতরে,
বিতর করুণা অনাথনাথ, দীন পরে।
মোহিত চিত অবিরত মগন আঁধারে,
মোহন মূরতি বিমল ভাতি বিকাশ অন্তরে।
গোকুলবিহারী নররূপধারী তাপিত তারিবারে।"

অমনি মহর্ষির ভাবাবেশ উপস্থিত হইল; তিনি হরিপ্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আবার যেমন গাহিলেন—

গেলরে গেলরে দিন, কে রাখে তাহারে,
হরিবোল হরিবোল বল বারে বারে।

মন্ত্রেতে মিশা'য়ে প্রাণ, গাও হরিগুণ গান,
'বিলাও বিলাও শুধু সে নাম সবারে।
মোহ-তিমির বিনাশি, কৃপা-অরুণ বিকাশি,
যাবেন লইয়ে হরি পারাবার-পারে ॥

অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; মথুরও প্রভুর ভাব দেখিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া মহর্ষির পার্শ্বে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। জ্ঞানদা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আকুল হইয়া ব্যাকুল নয়নে উপরের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই ঊর্দ্ধ হইতে বিষ্ণুদূতগণ এক বিচিত্র বিমান লইয়া তথায় নামিল এবং তাঁহাদের তিনজনকেই তাহাতে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেল। জ্ঞানদা দেখিল তাহার অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে এবং শুনিল স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতেছে!

জ্ঞানদা সশরীরে স্বর্গধামে গমন করিবামাত্রই দেবর্ষি নারদ কহিলেন—"এস মা, এই স্বর্গধামে! এখানে স্বর্ণময়পুরীতে তোমার স্বামী বিরাজ করিতেছেন; তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমার সহিত গোলোকে ভগবানের নিকট এস; সেখানে দুই জনে শান্তিসুখে অনন্তকাল অবস্থান করিবে।" এই বলিয়াই নারদ কলিতে এইরূপ অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া মনের উল্লাসে তাঁহার সেই বহু সাধনায় সিদ্ধ রাগালাপ করিয়া বীণাযন্ত্র-সংযোগে গাহিলেন—

দেখ মা, দেখ মা, এই স্বরগ-ভবন,
গায়িছে তোমার গুণ এ তিন ভুবন!
কত যুগ গত হবে, তবু তব কীর্ত্তি রবে,
নাহি লয় নাহি ক্ষয় হবে কদাচন।
তব জীবনের কথা, সুধামাখা যথা তথা,
শুনিলে সবার হবে পাপ-বিমোচন।
মর্ত্ত্যের রমণী রাশি, শতচন্দ্র পরকাশি,
তোমা সম করে যেন—স্বর্গ-আরোহণ!

গ্রন্থ সমাপন।

(২)

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে!
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান,
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান!"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

এখন দেবগণ সকলেই স্বধামে—আছেন আবার সেই আরামে—মায়া-নিদ্রায় নিদ্রিত সেই স্বর্গধামে! নিদ্রাহীন নারদের কিন্তু নিদ্রা নাই! তিনিই কেবল অবিরত বিশ্বের মঙ্গল চিন্তায় রত! দেবর্ষি দেখিলেন—স্বর্গের সুষমাময় ইন্দ্রালয়ে এবং পাতালের নিভৃতস্থলে বলি-ভবনে এই যে প্রকাণ্ড কাণ্ড সংঘটিত হইল, ইহাতে বসুমতীর অন্তর্জ্জ্বালার অনেকটা শান্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু বাহ্য-যাতনার কিছুই লাঘব হয় নাই। এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্য পাপ-পুরুষ প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আবার দ্বিগুণ প্রতাপে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বসুমতীর প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। বসুমতী "যে তিমিরে—সেই তিমিরে!" তবে ধর্ম্মের উজান গতি যথা কথঞ্চিৎ ফিরিয়াছে মাত্র; অধর্ম্মের তিলমাত্রও হ্রাস হয় নাই; বরং আরও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে।

কে জানিত যে কৌপীন কমণ্ডলুধারী কুমার কৃষ্ণানন্দের কলুষকাহিনী কর্ম্ম-বিপাকে কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে? কে জানিত যে, দেবতার নামের সহিত মানব-নামের বিভ্রম ঘটাইয়া সংবাদপত্রসম্পাদক কারাবাসে বাস করিবে? কে জানিত যে দুর্ভিক্ষ-দাবানল দাউ দাউ জ্বলিয়া দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া দরিদ্র-দেশ দগ্ধ করিতে থাকিবে? কে জানিত যে বিকার বিসূচিকাদি ব্যতীতও "বিউবনিক প্লেগ্" নামক নূতন রোগ আসিয়া আবার আধিপত্য করিবে?

অতঃপরও বসুমতীর এই সকল দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া নিদ্রাহীন নিষ্কাম নারদ দেব-ধামে পুনরাগমন করিলেন। তথায় নিদ্রিত দেবগণকে কৌশলে জাগাইয়া নারদ বসুমতীর বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে

লাগিলেন। দেবগণ যেন কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন "ভগবানের পার্ষদ সুবাহুদেব এবং সন্ন্যাসিনী জ্ঞানদা সনাতন ধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক বসুমতীকে যে অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিবার আশা এই কলিতে নিতান্ত দুরাশা মাত্র। কলির শেষভাগপর্য্যন্ত আর ও সকল বিষয় তোমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই; আমাদিগকেও আর এই বিষয় লইয়া বিরক্ত করিও না। যাও নারদ! নিশ্চিন্ত হৃদয়ে এখন কালযাপন কর।" এই বলিয়া দেবগণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইলেন।

দেবর্ষি শূন্য মনে নিরাশ হৃদয়ে তথা হইতে স্বর্গদ্বারে বৈতরণী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিপন্না বসুমতীর বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন; অবশেষে ভাবিতে ভাবিতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বৈতরণীর কুলে কুলে বিচরণ করিতে লাগিলেন!

এমন সময়ে সহসা সেই দৈববাণীর কথা দেবর্ষির মনে পড়িল; যে সময়ে তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন যে দৈববাণী দ্বারা তিনি অভীষ্ট বিষয় লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সেই কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বারেকের জন্য আবার সেই কথাটী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—

"আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্ব্বহির্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্ব্বহির্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসুবৎস
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুং।
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবাক্তাং সুপক্কাং
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তৃণীশ্চ॥"

অর্থাৎ "যিনি হরি আরাধনা করেন, তাঁহার তপস্যার প্রয়োজন কি? যিনি হরি আরাধনা না করেন, তাঁহারই বা তপস্যায় ফল কি? অন্তরে বাহিরে যিনি হরিকে অবলোকন করেন, তাঁহারই বা তপস্যায় আবশ্যক কি? অন্তরে

বাহিরে যিনি হরিকে না দেখিতে পান, তাঁহারই বা তপস্যায় ফল কি? অতএব বৎস! তপস্যায় বিরত হও; জ্ঞান-সিন্ধু শঙ্করের নিকট গমনপূর্ব্বক অকপটে হরিভক্তি শিক্ষা কর; এ ভব-রজ্জুচ্ছেদনের পক্ষে হরিভক্তিই একমাত্র উপায়! সেই জন্য সেই বৈষ্ণবাত্মা শুদ্ধমতি শিবসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সেই অমূল্য নিধি অভীষ্ট বিষয় লাভ কর।"

দেবর্ষি নারদ এবারও অভীষ্ট বিষয় লাভ করিবার জন্য বসুমতীর অশিব নাশের উদ্দেশ্যে সর্ব্বশিবদাতা শিবসকাশে গমন করিলেন। দেবর্ষিকে দেখিয়াই শঙ্কর সকল কথাই বুঝিলেন এবং কহিলেন "নারদ! তোমার পুনরাগমনের কারণ আমি বুঝিয়াছি। বসুমতীর চিন্তাতেই তোমার অন্তর অহোরাত্র আকুল; কিন্তু মর্ত্ত্যভূমে পাপের প্রভাব হ্রাস করা বড়ই কঠিন। দুষ্টের দণ্ড যমদণ্ড হইতেই হইবে; তাহার জন্য আর ভাবিবার আবশ্যক নাই! তবে পাপীর পাপ-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য এবং তাহার ভাবী দুর্নিবার নরক-যাতনা লাঘবের জন্য একমাত্র উপায় সেই ভক্তি-তত্ত্ব প্রচার এবং নাম সঙ্কীর্ত্তন যদিও সুবাহুদেব ও জ্ঞানদা কর্ত্তৃক এই জ্ঞানালোক বিতরিত হইয়া অনেক অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে; তথাপি তুমি ও চিত্রগুপ্ত মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে মর্ত্ত্য-প্রদেশে গিয়া কৌশলে পাপীর ইহকালের পাপকার্য্যের ফলাফল ইহকালেই দেখাইয়া দিবে ও ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিবে। পাপীর পারলৌকিক দণ্ড যমদণ্ড হইতেই হয়; কিন্তু তাহা ত জীবিত জীবের মধ্যে কেহই দেখিতে পায় না, সেই জন্যই পাপ-কার্য্যে তাহাদের ভয় হয় না। ষড়রিপুর দাসানুদাস হইয়া তাহারা দাপটে মেদিনী কাঁপায় ও সগর্ব্বে সকল পাপকার্য্যই করে। জন্মান্তরের কুকর্ম্মের কথাও তাহাদের স্মরণ হয় না; সুতরাং সংসারে ক[illegible] পাইলেই জন্মান্তরীন কর্ম্মফল না ভাবিয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিধাতা নিন্দাবাদ ঘোষণা করে। সেই জন্যই বলি, কৌশলে ইহকালের পাপের প্রতিফল ইহকালেই দেখাইতে হইবে। সে কৌশল আমি এখান হইতে সম্প[illegible] করিব—তোমরা দুইজন কেবল উপলক্ষমাত্র থাকিবে। এই উপায়ে পাপীর প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করাইয়া দিয়া কেবল ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিবে ও মুক্তিবীজ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে জগৎ মাতাইবে। কলির শেষ পর্য্যন্ত পাপ-পীড়িতা বসুমত[illegible] ইহাতেই শান্তি পাইবে এবং পাপীর দুর্গতিও ইহাতে অনেক নিবৃত্তি হইবে ছদ্মবেশে যোগীবেশে প্রথমে ভগবতীর একান্নটী পীটস্থানে গিয়া ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিবে; পরে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পাপীর ইহ-

কালীন প্রতিফল দিয়া হরিনাম সুধা-স্রোতে সমগ্র মর্ত্ত্যভূমি প্লাবিত করিবে। যাও বৎস, নারদ! আমার এই আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক কার্য্য সমাধা কর—সুফল ফলিবে”।

দেবর্ষি এই কথায় আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্করকে প্রণামপূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় লইলেন এবং চিত্রগুপ্তের নিকট আসিয়া তাঁহাকে শিবের সকল কথা জানাইলেন। চিত্রগুপ্তও হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। অবকাশ মতে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা উভয়ে শিবাদেশে মর্ত্ত্য-প্রদেশে ছদ্মবেশে গিয়া ভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন! প্রথমে পীঠস্থানসমূহে গিয়া ধর্ম্মালয় সংস্থাপন করিলেন এবং পরে সর্ব্বদেশে সর্ব্বত্র ভ্রমণপূর্ব্বক স্বকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পাপীগণও ইহকালের পাপকার্য্যের ফলাফল ইহকালেই দেখিতে পাইল—তাহাদের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল—প্রায় সকলেই আগ্রহের সহিত ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল—পৃথিবী আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল—বসুমতীও দগ্ধ-হৃদয়ে শান্তিলাভ করিলেন—চারিদিক হইতেই হরিনামধ্বনি উঠিতে লাগিল।

গগন ভেদিয়া হরি বোল রব,
উঠিল সঘনে জিনিয়া আহব।
অন্তরীক্ষ গায়, বাতাসে মিশায়,
সে মধুর রব, নিখিল ধরায়।

ভাবে মাতোয়ারা প্রেমে নিমগন
ভাবুকের দল সঁপি প্রাণ মন
স্বরের লহরি, গগন বিদারী,
তুলিয়াছে নাম, মরি কি মাধুরি!!!
সে মধুর নামে যাই বলিহারি।

যমের বাড়ীর নিগূঢ় তত্ত্ব।

প্রেমের হৃদয়ে প্রেমের তুফান,
প্রেমের লহরী, বহে খরসান,
প্রেমে হরি বোল, উঠিতেছে রোল,
ধরণীর গায়, প্রতিধ্বনি তায়,
মিশি বায়ু সনে আমোদে মাতায়।

কীর্ত্তনের সনে মধু হরি নাম,
জগতের শেষ সুখ মোক্ষধাম,
ভক্তগণ মুখে, সুধা ঝরে সুখে,
ভক্তগণ ভাবে হইল আবেশ,
হৃদয়ে নাহিক আনন্দের শেষ।

ধিক্ ওরে ধিক্ মানব মণ্ডলি
আয় আয় আয় হয়ে কুতুহলী,
কর যোগ দান, ধরিয়া সুতান
গারে গা পঞ্চমে হরি গুণ গান,
ভাবে মাতোয়ারা হউক পরাণ।

প্রাণের রতন একমাত্র ধন,
অন্ধের নয়ন জীবের জীবন,
তনয় যাহার, কোলেতে মাতার
চির নিদ্রা তরে করেছে শয়ন,
এ জীবনে নাহি মেলিবে নয়ন।

কাঁদিছে জননী শোকে পাগলিনী,
চির অস্তগত নয়নের মণি,
হরি নাম ধ্বনি, শুনিলে সে ধনি
নিমিষে দেখিবে মানস আকাশে
শত চন্দ্র জ্যোতি তাহাতে বিকাশে।

পরিশিষ্ট।

ভাবিবে তখন নিজ কর্ম্ম ফলে,
কুমার তাহার গেছে স্বর্গে চ'লে
কি কাজ ভাবিয়া, তাহার লাগিয়া
অসার সংসার হরি নাম সার
হরি নামে ঘুচে মানসান্ধকার।

পৃথিবীর মায়া পৃথিবীর মোহ,
পৃথিবীর প্রেম পৃথিবীর স্নেহ,
সবই অলীক, সবই ক্ষণিক,
ছায়া বাজী সম নিশার স্বপন!
কাজ নাই কিছু, কর সংকীর্ত্তন।

মুহূর্ত্তের তরে এসেছি হেথায়
আবার যাইব হায় কে কোথায়
লোক লোকান্তরে, কোথা যাব পরে,
জানিলে ত সব, সে কেমন স্থান,
গাও গাও শুধু হরি নাম গান!

ধন জন মান, সম্পদ বিভব,
কদিনের তরে কিসের গরব?
স্বার্থ অহঙ্কার, দম্ভ হুহুঙ্কার,
র'বে না কিছুই ফুরাবে সকল,
যে কদিন থাক হরি হরি বল।

এ চিত্রগুপ্তের 'গুপ্তকথা' ধন
বড় সাধে দিনু তোমা গৌড়জন
যতনের ধন
রেখো চিরসাথী করি,
[illegible] বোলো 'হরি হরি'!

দুঃখ দূরে যা'রে, পাপ ঘুচে যা'বে,
হরি-পাদপদ্ম অনায়াসে পাবে।
র'বেনা ভাবনা, এ ভব যাতনা,
হইবে সকল কামনা পূরণ,
শান্তি-সুধারসে হবে নিমগন!

অন্ধকার পথে আলোকের রেখা,
ধীরে ধীরে পরে সাধু পাবে দেখা!
অসাধু অজ্ঞান, না পেয়ে সন্ধান,
ঘুরিয়ে মরিবে আঁধারে কেবল,
সুধাভ্রমে সদা পিবে হলাহল!

* * * * * * * *

অসাধু অবজ্ঞা করিয়া হেলন
সাহসে লিখিনু শমন-শাসন
দোষ ত্যজি সাধু, গুণ দেখে শুধু,
তাই মাত্র মম ভরসা এখন
'হরি হরি' বল—গ্রন্থ সমাপন!!